১৬টি সাক্ষাৎকার

উত্তম চৌধুরী সম্পাদিত



প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৫
প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৭এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রাকর
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯
প্রচ্ছদ
ধীমান দাশগুপ্ত

প্রদীপ ঘোষ
ধীমান দাশগুপ্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রাসঙ্গিক

ইংরেজি 'ইন্টারভিউ' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'সাক্ষাৎকার'। 'ইন্টার' ও 'ভিউ' দুটো শব্দই মূলগত ভাবে ফরাসি। 'ইন্টার' যখন পদান্বয়ী অব্যয় তখন তার একটা অর্থ হলো—পারস্পরিক এবং 'ভিউ' হলো দৃষ্টিপাত, মানসিক সমীক্ষা, পর্যালোচনা ইত্যাদি। সুতরাং ইন্টারভিউ হচ্ছে মত বা বক্তব্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান। এরূপ মত-বিনিময়ের জন্য সাধারণত দুই ব্যক্তির মৌখিক মিলন হওয়া দরকার। সাক্ষাৎকার-এর বদলে তাই আমরা ব্যবহার করতে পারি মুখোমুখি শব্দটিও।

সাক্ষাৎকার হল প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক গবেষণা বা অনুশীলনের জন্য তথ্য বা ব্যাখ্যা সংগ্রহের একটা পদ্ধতি। চাকুরিপ্রার্থীকে যাচাই করা, জনসাধারণের কাছে সাংবাদিক বা সমীক্ষকের প্রশ্নাদি, পুলিশ বা উকিলের জেরা—সমস্তই কোন না কোন বিচারে সাক্ষাৎকার, কিন্তু এদের সঙ্গে সুচিন্তিত কথোপকথনের প্রকাশিত বিবরণীর গুণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। সবিশেষ সাক্ষাৎকার, যেখানে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়ই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সেটাই এখানে আমাদের বিবেচ্য। এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটের ওপর দুভাগে ভাগ করা হয়: স্বাধীন ও আনুষ্ঠানিক। স্বাধীন সাক্ষাৎকার সুদীর্ঘ খোলামেলা আলাপ আলোচনার রূপ পায়, এই ধরনের সাক্ষাৎকার অনেক সময়ই পরবর্তী আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতিপর্ব। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার তৈরি করে আনা প্রশ্নমালার ভিত্তিতে

নেওয়া হয়, কিন্তু প্রশ্নগুলির বক্তব্য ও ভঙ্গি কী হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে উত্তরদাতার উত্তর কেমন হচ্ছে ও কোন্‌দিকে যাচ্ছে তার ওপর। এক্ষেত্রে প্রশ্নের সঠিক উত্থাপন খুব জরুরি। কেউ কেউ বাজে ভাবে সাক্ষাৎকার নেয়, কেউ কেউ অপটুভাবে সাক্ষাৎকার দেন। প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়া দুটোই একটা বিশেষ কলাকৌশলগত দক্ষতার বিষয়, কারো কারো ক্ষেত্রে তা সহজাত, আর কেউ কেউ তা অর্জন করে নেন।

তথ্য ও ব্যাখ্যা সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা পার্থক্য রয়েছে। সাক্ষাৎকার অনেক বেশি ব্যক্তিগত, প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব বিশিষ্ট। নির্বিশেষ ও অনামা পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশে নিবেদিত রচনা বা বক্তব্যের তুলনায় সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ব্যাপারটি অনেক বেশি জোরদার। এখানে উত্তরদাতার উত্তর প্রায়ই নির্ভর করে প্রশ্নকর্তার বয়স, চেহারা, সে ছেলে না মেয়ে ও তার সম্পর্কে উত্তরদাতার মনোভাব কেমন ইত্যাদির ওপর। ফলে সাক্ষাৎকারের উপযোগিতা, কার্যকারিতা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্বাস্যতায় ব্যাপক তারতম্য ঘটতে পারে। এই সব কারণের জন্য সাক্ষাৎকারের আঙ্গিকটিকে অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়, মনে করা হয় এটি যতটা না একটা টেকনিক্যাল পদ্ধতি তার চাইতে বেশি একটা শিল্পাঙ্গিক। ব্যক্তিত্ব বা শিল্পব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের এই সবচেয়ে পুরনো পদ্ধতি একই সঙ্গে হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী বা সব চাইতে কম ফলপ্রদ এক পদ্ধতি।

সাক্ষাৎকারের আঙ্গিকটির টেকনিক্যাল বা কলাকৌশলগত দিক নিয়ে এখন কিছু বলা দরকার। সাক্ষাৎকারের সূচনা করেন প্রশ্নকর্তা, সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি একটির পর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, প্রতিটি প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তরদাতার আলোচনা ও বক্তব্যকেও তিনি সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করেন, ঠিক করেন কখন একটি প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তরদাতার উত্তর তাঁকে তৃপ্ত করেছে এবং ফলে পরের প্রশ্নটি উত্থাপন করার সময় হয়েছে। ফলপ্রদ ও কার্যকারী সাক্ষাৎকারের জন্য কতগুলো প্রাথমিক শর্ত আছে। তার প্রথমটি হল সাক্ষাৎকারী কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের কাছ থেকে যে তথ্য চাইছেন সেই তথ্য স্পষ্ট, সচেতন ও প্রকাশযোগ্য ভাবে ওই শিল্পী বা সাহিত্যিকের আয়ত্তাধীনে থাকা চাই। দ্বিতীয় শর্তটি হলো এই: যদিও অধিকাংশ সাক্ষাৎকারের নান্দনিক ফলাফলই যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁর পক্ষে ন্যূনতম এবং স্থান কাল ও অবস্থার বিচারে সীমাবদ্ধ, তবু সাক্ষাৎকারের

ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই অধিকতর সক্রিয় ও আত্মসচেতন বলে তিনি যেন সঠিক বুঝতে পারেন সাক্ষাৎকারীর তাঁর কাছে প্রত্যাশা কতটা, কেননা একমাত্র তাহলেই তিনি সেই প্রত্যাশা সবচেয়ে ভালো ভাবে পূরণ করতে পারবেন। এটা একটা বোঝাপড়ারও ব্যাপার এবং সেই প্রসঙ্গেই আমরা আসি তৃতীয় শর্তে —যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহে তার যথেষ্ট ইচ্ছা, উৎসাহ ও প্রেষণা (motivation) আছে কিনা।

সাক্ষাৎকারীর প্রশ্ন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ প্রশ্ন হতে পারে, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রশ্নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে। উন্মুক্ত প্রশ্ন হলে উত্তর খেলাবার সুযোগ বেশি, বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বর্ণনা, অনুমানের ফলে সেই উত্তরের শক্তি ও সম্ভাবনাও অনেক বেশি। পরোক্ষ ধরনের প্রশ্ন এমন সমস্ত তথ্য ও ব্যাখ্যাকে সহজলভ্য করে তোলে যে উত্তর প্রত্যক্ষ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর হয় সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট, স্বয়ংক্রিয়। আবদ্ধ প্রশ্নের চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন সের্গেই আইজেনস্টাইন মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। তিনি তাঁর 'চার্লি দি কিড' বইয়ে লিখেছেন "যখন আমেরিকার কথা ভাবি, একটা কথা অবশ্যই মনে পড়ে। ড্রাইভারের লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা। পরীক্ষায় আপনাকে একখানা প্রশ্নমালা হাতে দেওয়া হবে। প্রশ্নগুলো এমনভাবে সাজানো যে উত্তরে আপনাকে শুধু লিখতে হবে 'হ্যাঁ' বা 'না'। কোন প্রশ্নই এ-রকম নয়: 'স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সর্বাধিক গতি কত হতে পারে?' তার বদলে প্রশ্নটি হবে: 'স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে ২০ মাইলের অধিক গতিতে গাড়ি চালানো যায় কি?'

প্রত্যাশিত উত্তর হলো 'না'।

'ছোট রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, মোড়ে অপেক্ষা না করে, গাড়ি বড় সড়ক পেরিয়ে যেতে পারে কি?' প্রত্যাশিত উত্তর হলো 'না'।

যেসব প্রশ্নের উত্তর হবে 'হ্যাঁ' তাও এইভাবেই সাজানো হয়।

কিন্তু কখনোই আপনি এমন প্রশ্ন খুঁজে পাবেন না: 'ছোট রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বড় সড়কের সামনে পড়লে সড়ক কীভাবে পেরোতে হয়?'

পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে কখনোই নিজস্ব চিন্তা আশা করা হয় না, তাকে নিজস্ব 'উপসংহারে' আসার সুযোগ দেওয়া হয় না। সবকিছুকেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্মৃতিগত করে তোলা হয়, পর্যবসিত করা হয় 'হ্যাঁ' বা 'না-'র উত্তরে।"

সাক্ষাৎকারে আদি-মধ্য-অন্ত পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে প্রশ্নগুলোকে সাধারণত

এমনভাবে বাছাই করা ও সাজানো হয় যাতে একটা সমগ্র ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা উঠে আসে। প্রথম প্রশ্নগুলির মাধ্যমে উত্তরদাতার মনোযোগ আকৃষ্ট করা ও তাঁর উৎসাহ, আগ্রহ জাগ্রত করা হয়। পরবর্তী প্রশ্নগুলি হয় প্রধান প্রশ্ন, কেননা তখন উত্তরদাতার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু উত্তর দিতে দিতে তখনও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন ও উত্তর যত গুরুগম্ভীরই হোক না কেন সাক্ষাৎকার ঐতিহ্যের দিক থেকে মৌখিক সাহিত্যের অংশ। আবৃত্তি যেমন পূর্বে রচিত কোন কিছু থেকে পাঠ করা, সাক্ষাৎকারের কথোপকথন তা নয়, এটা অনেক তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা। কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিক সাক্ষাৎকারের সময় যা বললেন, প্রকাশের আগে যখন তার লিখিত খসড়াটি দেখেন, তখন তাতে নানান পরিবর্তন সাধন করেন, শুধু তথ্যের নয়, ভাষারীতিরও পরিবর্তন। মৌখিক আলোচনায় যে ভাষারীতি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের জন্য তা আর যথেষ্ট ও উপযুক্ত নয়। ফলে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে প্রি-কম্পোজিশন না থাকলেও, এক ধরনের পোষ্ট-কম্পোজিশন রয়েছেই। ফলে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার স্বভাবের দিক থেকে লিখিত সাহিত্যেরও অংশবিশেষ। বেতার বা টেলিভিশনের সাক্ষাৎকার অবশ্য স্বভাব ও রীতির বিচারে আলাদা। যেমন আগেকার দিনে যখন উত্তরদাতার উত্তর দ্রুতলিখন পদ্ধতিতে লিখে নেওয়া হতো তার সঙ্গে এখন যে উত্তরদাতার বক্তব্য টেপ করে নেওয়া হয় সাক্ষাৎকারশৈলীর ওপর এই পরিবর্তনেরও ছাপ পড়েছে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি নিয়ে বিতর্ক ও বিদ্রূপও হয়েছে কম না। বলা হয়েছে সাক্ষাৎকার হলো শ্রমের বিভাজনের একটা উদাহরণ, যেখানে বিষয়বস্তুটি সরবরাহ করেন যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তিনি এবং শৈলী বা রীতিটি যোগান সাক্ষাৎ-কারী। সাক্ষাৎকারী বেশিটাই সাংবাদিক বা সম্পাদক কিনা এবং তার ফলে তাঁর মধ্যে সমালোচক ও বৈজ্ঞানিক সত্তা অতি অল্প কিনা এ-প্রশ্নও উঠেছে। আধুনিক গণমাধ্যমের সব চাইতে বড় উপদ্রব হলো সাক্ষাৎকার—তা সাক্ষাৎকারীকে অপদস্থ করে, তা যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তার পক্ষে বিরক্তিকর এবং পাঠক বা শ্রোতার কাছে ক্লান্তির কারণ—এমন অভিযোগও করা হয়েছে।

যদিও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় সুদূর ১৫৫৫ সন নাগাদ সময়েই লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তবু সাক্ষাৎ-কারকে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি করে তোলার কাজে, বিশেষত চমকদার সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রবণতার পেছনে, মার্কিন সাংবাদিকতারই অবদান সব চাইতে বেশি।

ফোটোগ্রাফির উদ্ভব ও প্রসারের ফলে এই সাক্ষাৎকার ক্রমেই আরো অন্তরঙ্গ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রথম আলোকচিত্রিত সাক্ষাৎকারটির ব্যবস্থা করেছিলেন নাদার, একশো বছর বয়সী বিজ্ঞানী Michel-Eugène Chevreul-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের এই চিত্রমালা গ্রহণ করেছিলেন (কৃত্রিম আলো ব্যবহার করে) তাঁর ছেলে। এইভাবে ফোটোসাংবাদিকতার রীতির প্রচলন করে নাদার।

গত তিরিশ, চল্লিশ, দেড়শো বছরে শিল্প, সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার হয়েছে কম না। এখানে সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করছি: ক্রেতার আচরণ ও পারিবারিক আয় (ক্যাটোনা, ১৯৬০), যৌন আচরণ (কীন্‌সে, ১৯৪৮), রাজনৈতিক আচরণের সমীক্ষা (মিচিগান, ১৯৬০), জন্মহার ও পরিবার পরিকল্পনা (ফ্রীডম্যান, ১৯৫৯), তৎকালীন সময় ও সমাজ নিয়ে বসওয়েল-জনসন কথোপকথন (১৭৯১), হিচককের সঙ্গে তাঁর শিল্প ও জীবন নিয়ে ত্রুফোর কথোপকথন (১৯৬৬), সার্ত্রের সঙ্গে শিল্প, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে সিমন দ্য বোভায়ার কথোপকথন (১৯৬১), রামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমর সাক্ষাৎকার (১৯০২-৩২), সত্যজিতের সঙ্গে কলকাতা পত্রিকার সাক্ষাৎকার (১৯৭০), ইত্যাদি।

আমাদের এ-বই সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন শাখার স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সঙ্কলন। অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবিতা, কথাসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য, চিত্রকলা-ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র, নাটক, অভিনয়, সঙ্গীত, আলোকচিত্র ও জাদুবিদ্যা এই কটি মাধ্যম। প্রথম ছটি মাধ্যম থেকে দুজন করে শিল্পী ও শেষ চারটি মাধ্যম থেকে একজন করে শিল্পী নেওয়া হয়েছে। আলোচিত হয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, নন্দলাল বসু, রামকিংকর বেইজ, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, রবি ঘোষ, হীরাবাই বড়োদেকর, বেণু সেন ও পি. সি. সরকার: এঁদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁরাও নিজ নিজ শাখায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা উল্লেখযোগ্য সমালোচক। যেমন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ড. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, শোভন সোম, বীতশোক ভট্টাচার্য, ধীমান দাশগুপ্ত, প্রলয় শূর, বসন্তগোবিন্দ পোতদার, প্রশান্ত দাঁ, ড. প্রবাল দাশগুপ্ত: সকলেই প্রতিষ্ঠিত লেখক বা সমালোচক, প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক করে বই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যরাও নিজ নিজ শাখায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন: নিমাই চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কৃতী প্রযোজক হিসেবে দীর্ঘকাল বি. বি. সি.র সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন; তপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যালকাটা ফিল্‌ম সোসাইটির প্রথম দিককার সদস্য, চলচ্চিত্র

মাধ্যমটিতে তাঁর ব্যক্তিগত অবদানও রয়েছে ; অজয় বসু অভিজ্ঞ চিত্র-সমালোচক, চলচ্চিত্রের বহু পত্রিকায় তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে ; কাজল চক্রবর্তী তরুণ নাট্যপরিচালক ও নাট্যকার, তাঁর নাটক প্রকাশিত হয়েছে এমনকি বহুরূপী পত্রিকাতেও ; অদিত আগরওয়াল এ. এফ. আই. এ. পি., তরুণ এই ফোটোগ্রাফারের ছবি বহু আন্তর্জাতিক স্যালনে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়েছে ; ঈশ্বর চক্রবর্তী চিত্রসম্পাদক ও তথ্যচিত্র-পরিচালক, বর্তমানে পি. সি সরকারকে নিয়ে একটি বড় ছবি করছেন, এই সাক্ষাৎকারে সেই ছবির চিত্রনাট্য থেকে অংশ বিশেষ গৃহীত হয়েছে। সব মিলিয়ে শিল্পী ও সাক্ষাৎকারী নির্বাচনে জোর দেওয়া হয়েছে বৈচিত্র্য সৃষ্টির ওপর, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয় সাধনের ওপর এবং নির্বাচিত সাক্ষাৎকারের পাঠযোগ্যতার ওপর।

প্রকাশিত লেখাগুলি পড়ে উঠলে সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন ধরন ও বৈচিত্র্য অনুধাবন করা যায়। যেমন অমিয় চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারটি তার ভূমি হিসেবে নিয়েছে আন্তর্জাতিক শিল্প ও শিল্পরীতির পটভূমিকে, তুলনায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের বাঙালিয়ানার জন্য অনেক বেশি ঘরের কাছে ধরা। যেমন বুদ্ধদেব বসু ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাক্ষাৎকার দৃঢ়বদ্ধ, এবং প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে প্রথামাফিক, সাক্ষাৎকার। উভয় লেখকেরই উত্তর তীক্ষ্ণ, সুচিন্তিত ও আধুনিক। আবার মোহিতলাল মজুমদারের সাক্ষাৎকারটিতে রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পর্যায়ের রচনা এবং আধুনিক কবিতা ও সাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্ত মতামত আধুনিক পাঠক ও সমালোচক মহলে হয়তো আজ আর গ্রাহ্য হবে না। তবু এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক/সমালোচকের মতামত আমাদের কাছে মূল্যবান কারণ এর দ্বারা পাঠক বুঝতে পারবেন সাহিত্যকে কীভাবে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখি সমাধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিরোধিতার ব্যাপারটি অতি প্রাচীন। মোহিতলালের মত গোপাল হালদারের সাক্ষাৎকারেও লেখকের নিজের রচনার কথার চেয়ে বেশি এসেছে সাধারণ ভাবে সাহিত্যের সমালোচনা ও তত্ত্বের কথা, বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রশ্নগুলি স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ। রামকিংকর ও নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার দুটি ঠিক প্রথাগত সাক্ষাৎকার নয়, উত্থাপিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিষয়ে নন্দলাল তাঁর 'আন্তরিক ও ভণিতাবিহীন মতামত দিয়েছেন আর বহু বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে রামকিংকরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শোভন সোম যে সব উত্তর পেয়েছেন তার ভিত্তিতে তাঁর সাক্ষাৎকারটি তৈরি।

চলচ্চিত্র বিষয়ক দুটি সাক্ষাৎকারই কিন্তু প্রথামান্য সাক্ষাৎকার, সত্যজিৎ রায়েরটি চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ দিক—চলচ্চিত্রসঙ্গীত—নিয়ে। সত্যজিতের টেকনিক্যাল ও অত্যন্ত পরিশীলিত সাক্ষাৎকারটির পাশে ঋত্বিকের সাক্ষাৎকারটিকে অস্বাভাবিক ভাবে অনুপ্রাণিত মনে হতেই পারে, মনে হতে পারে এটি যতটা না সামগ্রিক তার চাইতে বেশি সাময়িক, কিন্তু এই অন্তরঙ্গ, ব্যক্তিগত ও স্পর্ধিত সুরের জন্যই এটি এত মূল্যবান। তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে হয়তো কম, আবেগময়তাই বেশি, কিন্তু লেখাটি শেষ করলে বেশ বোঝা যায় ঐ সৎ ও বিশুদ্ধ আবেগময়তা সমস্যার গভীরে বহুদূর অবধি প্রবেশ করেছে। উপরন্তু, বাংলা সিনেমার তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি যে দৃঢ়তা ও আশা প্রকাশ করেছেন তা এক মহৎ শিল্পসত্তার পরিচয় দেয়। শক্তিশালী এই সাক্ষাৎকারটি তাই নানা কারণে বাঙালি পাঠকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। নাটক বিষয়ক দুটি সাক্ষাৎকারও মেজাজে ও রীতিতে অনেকটাই আলাদা, বক্তব্যেও। উৎপল দত্তের উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ, তুলনায় বাদল সরকারের উত্তরগুলি ছড়ানো, আলোচনা ও প্রতিআলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক নমনীয়। রবি ঘোষ তাঁর অভিনয়-বিষয়ক সাক্ষাৎকারে আলোচনা করেছেন নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্রাভিনয় উভয়কে নিয়েই, ঈষৎ টেকনিক্যাল হোলেও তাঁর আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। বরং কলাকৌশলগত আলোচনা ও পরিভাষার দরুণ বেণু সেনের আলোকচিত্র-বিষয়ক সাক্ষাৎকারটি বোধগম্যতার জন্য পাঠককে হয়তো একাধিক বার পাঠ করতে হতে পারে। হীরাবাই বড়োদেকরেরটি সাক্ষাৎকারের এক অনবদ্য উদাহরণ, শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল এই সাক্ষাৎকারটি পাঠকের বারবার পড়তে সাধ জাগে, এই লেখায় বসন্ত পোতদার-অনুসৃত রীতিটিও আঙ্গিকগত ভাবে নতুন। শেষ সাক্ষাৎকারটি পি. সি. সরকারের, তাঁর সাক্ষাৎকার তাঁর মতই, সপ্রতিভ ও বাকবিভূতিময়, ম্যাজিকের মত একটি ব্যবহারিক মাধ্যম নিয়ে তিনি যে তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

তাহলে এই হলো আমাদের এই বই : ১৬টি সাক্ষাৎকার : নানান ভাবে প্রশ্ন, নানান রকম উত্তর, নানান ধরনের কথোপকথন ; নানা মেজাজের প্রতিফলন ও নানা বক্তব্যের উদ্‌ঘাটন। এই বইয়ের পরিকল্পনা শ্রদ্ধেয় ধীমান দাশগুপ্তের। বস্তুত বইটির পরিকল্পনা, সম্পাদনা, 'সম্পাদকীয়' রচনা ও প্রকাশনা—প্রতিটি পর্বে তাঁর যে উপদেশ, পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি তা সমস্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উর্দ্ধে।

মোহিতলাল-দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কথোপকথনের জন্য 'আলেখ্য' পত্রিকাগোষ্ঠীকে,

সত্যজিৎ-তপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারের জন্য 'আন্তর্জাতিক আঙ্গিক' পত্রিকা-গোষ্ঠীকে এবং বেণু সেন-অদিত আগরওয়াল সাক্ষাৎকারের জন্য 'ফোটোগ্রাফি' পত্রিকা ও তার সম্পাদক অতনু পালকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁদের কাছে ও সেই সব সাক্ষাৎকার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের সহায়তা ও সমবেত প্রচেষ্টায় বইটি প্রকাশিত হলো। শিল্প ও শিল্পীর সঠিক অনুধাবনের কাজে বইটি যদি সামান্যও সাহায্য করে তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২ — উত্তম চৌধুরী

অমিয় চক্রবর্তী-র সঙ্গে ড. প্রবাল দাশগুপ্ত-র সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ সাহিত্যিক সার্থকতার কোনো একটা প্রধান আশ্রয় আছে একথা কি আপনার মনে হয় ? অর্থাৎ, আপনি কি বলবেন, যে, কোনো কবি হয়ত আঙ্গিক-গৌরবে বড়, কারুর বা বিষয়মাহাত্ম্য কিংবা অন্য কিছু বেশি ভাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির কবিত্ব একটাই সাধারণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ? সে ভূমি কী ?

উত্তর ॥ কবিতা সার্থক হয়ে থাকলে কিসে সার্থক হয়েছে সেটা ও-রকম নানা অংশে ভাগ ক'রে দেখলে সার্থকতা নিয়ে কোনো সত্যি কথা বলা শক্ত। আলাদা করার, বিশ্লেষণের, কোনো দরকার নেই এমন আমি বলি না ; বিশ্লেষণের গুরুত্ব আছে বইকি। যদি কেউ জানতে চান ছন্দের কথা বা কবিতার শরীরতত্ত্বের অন্য কোনো দিক, তাহলে তাঁকে নিবেশ ক'রে সে বিষয়টি বুঝে দেখতে হবে। এ ধরনের নির্দিষ্ট অধ্যয়ন করলে নিশ্চয়ই কবির বাইরের দিকের কৃতিত্বটা বিশদভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে কবির সত্যিকারের সফলতার কোনো নিরিখ মেলে না, যদিও এটা ঠিক যে যে-কবি সত্যিই সফল তাঁর সেই ভিতরের সার্থকতা থেকেই উৎসারিত হয় বহিরঙ্গ সাফল্য, ছন্দের ঔচিত্য, কথার সুবিন্যাস। অন্তরের এই সার্থকতার স্বরূপ কী জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব—ব্যক্তি হিসেবে, স্রষ্টা হিসেবে কবির যে ইন্টেগ্রিটি, তাঁর স্বভাবের সেই পূর্ণাঙ্গতাই তাঁর আর সবকিছুর আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠাভূমি।

প্রশ্ন ॥ আপনি যে বলছিলেন কবির মানবিক ইন্টেগ্রিটি তাঁর লেখার স্বরে আর

ছন্দে প্রকাশ পায়, সে দিক থেকে বরিস পাস্টেরনাক-এর কবিতা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়? ওঁর ইন্টেগ্রিটি ছিল কি?

উত্তর ॥ মুশকিল এই যে, আমি তো তাঁর নিজের ভাষা জানি না। তর্জমার উপর, অল্পসংখ্যক তর্জমার উপর নির্ভর ক'রে কোনো সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না তাঁর লেখার ব্যাপারে। কিন্তু তাঁর ইন্টেগ্রিটি (অর্থাৎ চারিত্রশক্তি) ছিল কিনা সে প্রশ্ন যদি ওঠে—ছিল বইকি, যে সংলগ্নতা তাঁর সারা জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সে কি সহজ কথা। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্ট্যালিনিস্ট পার্জ, নাৎসিদের উৎপীড়ন—এই সবের ভিতর দিয়ে যার জোরে উত্তীর্ণ হলেন সে শক্তির সন্ধান যদি পাই তাহলেই বুঝতে পারব, পাস্টেরনাক-এর নিজের জীবনের অনেক বাধা, ভ্রান্তি, সব উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার সমগ্রতা জয়ী হলো কীভাবে।

পাস্টেরনাক-এর সমস্ত জীবনের সাধনা ছিল এইটে দেখা এবং দেখানো যে ধনীদরিদ্র, গায়ের রঙ, ভাষা, এগুলো গৌণ; সকল মানুষের গভীর হৃদয়ের যে যোগ সেটাই আসল। ওঁর একটা কবিতা শুরু হচ্ছে নানা-রকম বর্ণনা দিয়ে—লোকেরা আধ কাপ কফি খেয়ে ছুটছে অফিসে, ছেলেরা ইস্কুলে যাচ্ছে স্যাচেল কাঁধে, গাছের পাতা বরফের ভারে নুয়ে পড়ছে—তারপর কবির হঠাৎ খেয়াল হলো, বলছেন: এই যে প্রতিদিনের সাধারণ মানুষ, এদের কি আমি পরাস্ত করতে পারি? এরা আমাকে জয় করছে এটাই আমার একমাত্র জয়। ওঁর এ কবিতাটাই তো জয়ের বিষয়ে সত্যিকথা। গায়ের জোরে জেতা যায় যদি ভাবি, সেটা ভ্রান্তি। অনেক লোকের, বহু ঘটনার, নানা ইতিহাসের হাতে বিজিত হওয়াতেই যে জয়, এই কথাটা যাঁর মনে দৃঢ় হয়েছে তিনি একটা সম্বন্ধের সত্য রক্ষা করছেন: করুণার জয়, কল্যাণের জয়। তিনি আর ভাববেন না টাকা বা গায়ের জোরের হারজিতের কথা।

আমার সঙ্গে একবার ওঁর কথা হচ্ছিল; খেয়াল করিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর কবিতার কত অল্প পেতে পারি, কারণ অনুবাদ যা হয়েছে অধিকাংশই খুব অতৃপ্তিকর। বলা চলে কোনো খাঁটি কবিতার অনুবাদ হয় না। এক সময়ে প্রশ্ন করলাম, নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা উনি কীভাবে নিয়েছেন। বললেন, 'আমি এত মূর্খ নই যে, ধনতন্ত্রী দেশে গিয়ে ওদের টাকা নেব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওদের গুণকীর্তন করব, তারপর ফিরে আসব দেশে। শিল্পীকে ওরা জানে না। এদেশেও সেই ব্যাপার। কাব্যের চারিত্র ব্যাপারটা তো শুধু

মতামত বা মুখের কথা নয়। তাকিয়ে দেখুন না'—তখন বাইরে ডিসেম্বরের মস্কোর বরফের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা যাচ্ছে হাট করতে, ছেলেরা স্নো নিয়ে খেলা করছে— 'এরা কি আমার শত্রু? এই মানুষেরাই তো আমার স্বদেশ, স্বজন; এদের প্রতি আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি?' কথাটা কিন্তু কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট দ্বন্দ্বের ধরনে বলছিলেন না। ওঁর মনে ছিল সত্যিকারের মাদার রাশিয়া—যাদের সঙ্গে এতদিন বেঁচে আছেন তাদের আর ওঁর যে সত্য সম্বন্ধ সেই সত্যরক্ষাই পাস্টেরনাক-এর ইন্টেগ্রিটি।

মতামতের দ্বন্দ্বটাকে প্রধান ক'রে তুললে অনেক স্থূল, অযথার্থ বিচার এসে যায়, অনেকেই ভুল ক'রে ভেবে বসে রচয়িতা আর তার রচিত চরিত্র বুঝি একই লোক। পাস্টেরনাক বলেছিলেন, 'আমার মতামত তো সব ক্ষেত্রে ঝিভাগোর মতো নয়। তাকে আমি এঁকেছি। আমার রক্ত দিয়ে চিত্রাঙ্কিত এই বিশ্ব আমি দিয়েছি পাঠককে।' ঠাণ্ডা লড়াইয়েব সময়ে মার্কিনরা ওঁকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেছিল, ওঁর বই কাজে লাগাতে চেষ্টা করছিল—সেটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ, দেখা গেল, বইটা যেভাবে কাজে লাগবে আশা করা গিয়েছিল তা হলো না। লোকেরা লারিসার রূপ, প্রীতি, ভালবাসা, স্নিগ্ধতাটাই পাচ্ছে; কমিউনিস্ট পক্ষের বা তার বিরোধী পক্ষের প্রভাব পাচ্ছে না। শিল্পের ব্যাপকতর, অন্তরতম সত্য সে-রকম বিচারে ধরা পড়ে না।

বিশ্বপ্রকৃতি আর মানুষকে বড় কবিরা যে সত্য সম্বন্ধে দেখেন সেই সমগ্রতার প্রভা আমি ভাষায় বলতেই পারব না। সেই প্রভা সেই দ্যুতিটাই সাহিত্যকে মতের দলাদলি থেকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যায়, ছন্দোলোকে। শেক্সপীয়রে এটা আমি ক্রমাগত পাই। উনি কী ভাবছেন বলা শক্ত। অনেক বার মনে হয় কাউকে সমর্থন করছেন—যেমন, হ্যামলেটকে। কিন্তু ওঁর ওই নাটকে হরেশিওর চারিত্র, মাত্রাজ্ঞান, সমাজবুদ্ধি অনেক বেশি সচেতন। হ্যামলেট একটা আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, to be or not to be। কী অস্ত্র প্রয়োগ করলে কী ফল হয় কিছুই জানে না, এদিক ওদিক হত্যা করছে। তার প্রিয়তমা অফেলিয়াকে নির্মমভাবে অবজ্ঞা করছে, তার মৃত্যুও যেন হ্যামলেটের মানসিক উত্তেজনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। হ্যামলেট আদর্শবাদী, কিন্তু বিচারহীন; সার্বিক বোধশক্তি তার ক্ষীণপ্রায়।

জগৎসংসারে ভাল কাজের চেয়ে অনর্থ করল অনেক বেশি; হলো না কিছুই, কিন্তু একটা আস্ফালন তো হলো। এখন, শেক্সপীয়র কি এর তারিফ করছেন? করছেন না। রোমান্টিক অ্যাগনিকে অবজ্ঞা করেননি কিন্তু তাকে চরম মূল্য দেন

নি। উনি খুব প্রাজ্ঞ ছিলেন। সম দৃষ্টি দিয়ে সন্ত, রাজা, প্রেমিক, যোদ্ধা এদের সবার সম্বন্ধটা দেখতে পেতেন। জানতেন যে এরা সবাই আছে। বলছি না যে ওঁর কোনো পক্ষ প্রতিপক্ষ-জ্ঞান ছিল না; কিন্তু পুরো মাত্রায় সমঝদার; তাই চট্ ক'রে কাউকে গালমন্দ বা স্তুতি করার লোক ছিলেন না শেক্সপীয়র। উনি হ্যামলেটের পুরো সমর্থক নন, হ্যামলেটকে শুধুমাত্র নিন্দাও করছেন না, তবে ও-নাটকে এ সুরটা আছে যে, 'নিজেই যদি পাগল হয়ে গেলে তাহলে কাকে আর উদ্ধার করবে?' হরেশিওর উপস্থিতি কতকটা এজন্যেই। (যেমন গোরার অবিনাশ, শচীশের শ্রীবিলাস—যদিও ঠিক একই পর্যায়ের নয়।)

শেক্সপীয়র বা পাস্টেরনাক-এর এই সমদর্শনগুণ, এই ইন্টেগ্রিটির খুব অভাব আছে আমাদের সময়ে; হয় অতিশয়োক্তি নয় নিঃশব্দতা, এটাই পাচ্ছে প্রাধান্য। কিন্তু চিরকালের মহাশিল্পীদের বৈশিষ্ট্যই হলো সেই সংযমের জ্ঞান যা হৃদয়াবেগের অভাব নয়,—বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সংযোগ-পরিস্ফুটনশীল দৃষ্টির পূর্ণতা।

প্রশ্ন ॥ আপনি বলবেন যে এটাই শিল্প, এ ছাড়া শিল্প হয় না?

উত্তর ॥ শিল্পকৃতি অনেক-রকম আছে; তবে এ-রকম ব্যাপক দৃষ্টিপূর্ণ শিল্পই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। আঙ্গিকের পূর্ণাঙ্গতাও প্রকাশের বিশিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয়; সেখানেও সমস্ত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংলগ্নতা, অন্তর্লীন অথচ সুস্পষ্ট ধ্বনির পরিচয় পাই। এভাবে বললে অবশ্য কথাটা ঔদ্ধত্যের মতন শোনায়; কিন্তু যাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে জানি, যেমন কালিদাস, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটে, তাঁদের চরম সৃষ্টির কাজে এই পূর্ণ দৃষ্টি উদ্‌ভাসিত; খণ্ডিত জীবন এবং ক্ষুদ্র দলাদলির উর্ধ্বে না উঠলে বিশ্বজনীন সৃষ্টি হবে কী ক'রে?

এই সমগ্রতাগুণের বড় অভাব বোধ করি আজকের দিনে, নিজের মধ্যেও, অন্যের মধ্যেও। সত্তার একটি সুর আছে, তা যে শুনতে পায় সে অধীর হয়ে জগঝম্প বাজায় না, বরং আলাপ করতে পারে, ইমদাদ খাঁর জৌনপুরী টোড়ীর মতো আলাপ। কীট্‌স্‌এ এই স্বর খুব প্রবল, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চেয়ে বড় এই ভালবাসার অনুভূতি যার মধ্য দিয়েই তাঁর ছন্দ আসে। এ অনুভবকে দান্তে যখন 'তোমার ইচ্ছা' বলেছিলেন, 'তোমার ইচ্ছার ভিতরেই আমাদের শান্তি', সেটা কোনো সংকীর্ণ থিয়লজিকাল মত হিসেবে নয়, উনি বিশ্বের ধ্বনির কথাই ভেবেছেন এখানে। বর্তমান কালের স্বরটাকে আমি গর্হিত ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছি না। স্বাতন্ত্রিক, কখনো বা ঐকান্তিক পার্থক্য এবং তথ্যের জ্ঞান এই বৈজ্ঞানিক

যুগে দৃঢ়তর। এখন যে তালকে দ্রুত ক'রে উত্তেজনা বানানো চলছে তারও খানিকটা দরকার আছে। কিন্তু এর চেয়ে নিবিড় যে সুর—সঙ্গীতশাস্ত্রে যাকে বলেছে 'শ্রুতি', 'মিউজিক অভ দ্য স্ফিয়র্স'—সে সুরের কান না থাকাটা যে শোচনীয় এ কথা না ভেবে পারি না। কেউ যদি সাব্যস্ত করে, নারীর শবের প্রতি তার যে লালসা হচ্ছে তাই নিয়ে একটা কবিতা লিখবে সেটাই সত্যবাদিতা, তখন কবি এবং মানুষ হিসেবে তো বলতেই হবে 'তোমার এ কবিতায় কাব্যের সত্য প্রকাশ পায় নি'। লজ্জার বিষয় নিয়ে লজ্জিত হ'লে, তা নিয়ে হিপোক্রিটিকাল হ'লেও সেই হিপোক্রিসির একটা মানে আছে; নির্লজ্জের মতো সবটা মেলে ধরা তার চেয়ে অনেক বেশি অযথার্থ আচরণ। বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এ-রকম প্রসঙ্গ তুললে অন্য কথা, তাহলে মর্গএ মৃতদেহের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের অভিপ্রায় তো তা নয়। কাজেই স্বরটা সত্য কিনা সে প্রশ্নটাই তুলতে হয়, অবজেক্‌টিভ ভাবে। লেওনার্দো তাঁর লাস্ট সাপার ছবিতে খানিকটা ডগডগে লাল কালি ঢেলে দেন নি কেন? তাতে কি অনিবার্য মৃত্যুর ছায়া স্পষ্ট হত? কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে যেটা বড় তাই প্রকাশিত হয়েছে ওই ছবিতে, অন্য প্রসঙ্গও আছে। হিমালয় পর্বতে উঠে উচ্চৈঃস্বরে ব্যভিচারিত্বের গান করতে ইচ্ছে হবে না কেন? শিব ব'সে আছেন না-ই বিশ্বাস করলাম, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের যে শৈব ভাব আছে তাতে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ধ্যানী লোকেই এটা টের পায় এমন নয়। এক বার বাস্‌এ ক'রে যাচ্ছিলাম—হিমালয়ের একটার পর একটা তুঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হলো। বাস্‌এ যারা ছিল সবাই সাধারণ লোক—বাস্ থামিয়ে সবাই বেরলো, ব'সে পড়লো হাঁটু গেড়ে। বিদেশীরা এ বুঝতে পারে না, বলে আইডল ওয়ার্শিপ। কিন্তু, এত বড় একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখতে পাওয়া, যাকে বলি দর্শন পাওয়া, এ অভিজ্ঞতা তো পুত্তলিকাপূজা নয়, এখানে সত্যের একটি পার-দৃষ্টি আছে; নির্বাণ ধারণাটার অভিপ্রায় এইই। নির্বাণ বলতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়, কিম্বা যথাযথের বোধ হারানো নয়, সংযত হয়ে আরো উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনো, টের পাওয়া যে আকাশ নীহারিকার সঙ্গে আমার স্থান, যদিও পার্থিব সংসার থেকে আমি পৃথক নই। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা বৌদ্ধ সম্ভবপরতা আছে যা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চেয়ে বেশি; এটা যার জীবনের ভিতরে আবির্ভূত হয়েছে তার অবচেতনা, ছন্দিত বেদনা, শৈল্পিক দায়িত্ব আপনিই সঞ্চারিত হয়। আধুনিক অনেকের বিষয়ে দুঃখ হয় এই নিয়ে যে, সব ক্ষমতাই রয়েছে, স্বাভাবিকের কান নেই তাও নয়, কিন্তু গায়ের জোরে স্বাভাবিক

বৃত্তি অস্বীকার করার একটা ঝোঁক প্রাধান্য পেল, যা প্রবৃত্তির অপ্রেয় মুহূর্তে মনে এসেছিল তার উপর কলম চালিয়ে সেটাকে আরো কুশ্রী ক'রে দেওয়া হলো। সেই যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একজন লিখে ফেলেছে, 'বাগানে চম্পক', কিন্তু লিখে চম্‌কে উঠে কেটে দিল, লিখল 'বাগানে লম্পট', কতকটা সেই ঝোঁক অনেককে সত্যিই পেয়ে বসে। যা রুচির বিষয় তাকে তর্ক দিয়ে উপহাস করলেও রুচির প্রসঙ্গ লুপ্ত হয় না। সবাইকে মহাকবি হতে হবে এমন ভাবা বাতুলতা; কিন্তু, সৌষম্যের স্থাপত্যকে চেষ্টা ক'রে নির্বাসন দিচ্ছেন অনেকে, এটা বেদনার বিষয়। এখানে নীতির প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে শিল্পবুদ্ধির কথা উঠছে।

আমি বলছি না এখনকার সব লেখাতেই এ অভাবটা আছে। বাঙলা কাব্যসাহিত্যে অনেকেই আছেন যাঁরা শিল্পী। কিন্তু বহু জায়গায় চোখে পড়ে অস্পষ্ট অনুচ্চারিত ভাষা, নয়তো অতিপ্রকটতা। ছন্দ-মিলের নতুন আঙ্গিক নয়, অসংযম এবং শৈথিল্যের একটি পর্ব চলেছে।

প্রশ্ন॥ আপনি বলছেন, কোনো কোনো সার্থক ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে এ যুগে কবির ব্রতচ্যুতি ঘটছে?

উত্তর॥ রবার্ট ফ্রস্ট্‌এর কবিতা আছে, এই পরিবর্তনটার বিষয়ে একটা গল্পের মতন। শীতের বরফ গ'লে অগভীর ছোট্ট একটা পুকুর হয়েছিল, তাতে ছায়া পড়ত গাছপালার, আকাশের মেঘের, সূর্যের, চাঁদের। ঝড় হ'লে তার জল সাড়া দিত সেই উত্তেজনায়। তার পর খুব খরা এল, অপ্রতিহত রোদে পুকুর গেল শুকিয়ে, চারপাশের মস্ত মস্ত গাছগুলো শুষে নিল জল যতটা পারে। ফ্রস্ট্‌ প্রশ্ন করছেন: কী অন্যায় করেছিল ওই পুকুরটা? Did nothing but reflect the sky, ইত্যাদি। পুকুর বলতে উনি যার কথা বলছেন সে হলো তুমি আমি। বলছেন, স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলন করতে দাও, প্রতিদানের শিল্প থামিও না, ক দিনেরই বা ব্যাপার। মনের তো ওটাই কৃত্য। ফ্যাশন বদ্‌লে গিয়েছে? চৈতন্যময় প্রতিফলন করা চলবে না আর? (প্রতিফলন অবশ্য প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।)

ওই সঞ্চার কেন আসে না বহুতর আধুনিক কবিতায়? মাসিকে ত্রৈমাসিকে কেন এত অবান্তর শব্দের স্তূপ, রূপহীন তার যদৃচ্ছা বিচরণ? কোথাও কোথাও দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু সচরাচর খটকা লাগে; সূক্ষ্ম সচেতনতার কোথায় যেন

অভাব, 'হচ্ছে না'। কবি নিজেও বোঝেন যে 'হচ্ছে না', কিন্তু সংবরণ বা সাধনা না ক'রে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ফলে প্রত্যেক বড় শিল্পীর লেখার যেটা প্রাণ সেই স্থানকালপাত্রসম্বন্ধ থেকে একেবারে ছিটকে স'রে যান তিনি। প'ড়ে থাকে পদ্যে গদ্যে সেই 'অতিবাদিত্ব'।

প্রশ্ন ॥ মার্কিন ভাষাবিদ্যাবিদ নোআম চমস্কি তাঁর 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড মাইণ্ড' বইয়ে লিখেছেন, মানুষ যখন কথা বলে সেটা অন্তত তিন অর্থে সৃষ্টিশীল ঘটনা। এক তো ভাষার অন্তর্নিহিত অপরিমেয় প্রাচুর্য—কত-রকম কথা বলা যায় তার কোনো শেষ নেই, এই অশেষত্বই সৃষ্টিশীলতার আশ্রয় : তার পর, মানুষ যা বলে তা তার স্থানকালের পরিস্থিতির হুকুম মাফিক হয় না, যে কথা বলছে তার স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপনের সৃষ্টরুচি প্রকাশ পায় ; আর তৃতীয়ত, লোকে যা কথা বলে সেই কথার একটা সংহত গ্রন্থন থাকে, আর থাকে প্রাসঙ্গিকতা।—আমার তো মনে হয় এই তৃতীয় অর্থের সৃষ্টিশীলতা অর্থাৎ গাঁথুনি আর প্রাসঙ্গিকতাই কবির পক্ষে সবচেয়ে জরুরী। এই প্রাসঙ্গিকতার স্বরূপ কী ? আপনার কী মনে হয় ?

উত্তর ॥ ছন্দ আর ধ্বনিভঙ্গী নিয়ে যা বলছিলাম সেই একই ব্যাপার এখানে। কেউ যখন গভীর ভাব থেকে কথা বলে তাতেই গ্রন্থনা আর প্রাসঙ্গিকতা আপনিই আসে। বাইরের চেষ্টায় আসে না। যার এ বোধটা নেই তাকে তা দেওয়া শক্ত। সেন্স অভ প্রোপোর্শন নেই এমন লোক তো আছে ; কিন্তু একটা সুস্থ লোক—তার গভীর যোগ আছে জগতের সঙ্গে, কাজেই সে নিজে থেকেই জানে কোনখান থেকে কী কথা আসে বা আসতে পারে।

এটা বাড়াবাড়ি ক'রে বললে নীতিবাগীশের বক্তৃতা হয়ে যায়। অথচ আদৌ না বললে ভাববার ঝোঁক হয়, সবই বুঝি নিজের ইচ্ছেমতো চলছে—আপনি যে দ্বিতীয় অর্থে সৃষ্টিশীলতার কথা বলছিলেন সেই 'স্বাধীনতা'র ব্যাপারটা তখন যথেচ্ছাচারে গিয়ে দাঁড়ায়। সব তো নিজের ইচ্ছে নয়। সমাজ আছে, ঔচিত্য অনৌচিত্য আছে, শিল্পের প্রতিমার হিসেবেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগ এটা তারই ব্যাপার। এই যোগটার অভাবে লোকে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত বিকল্প আঁকড়ে ধরে।

যেমন, পশ্চিমের আধুনিক মানুষ শিল্পে অভিজ্ঞতায় অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত ডিটেলের শরণ নিচ্ছে। বিজ্ঞানের জগতে এবং চেতনার জগতে যে নূতনতর সংযোগসম্ভাবনা

দেখা দিচ্ছে তার বোধ এই শিল্পে অনুপস্থিত। ঠিক অমুক জায়গায় অমুক লোক এটা না ক'রে ওটা করল, সে কথা না জানলেই যেন পরম লোকসান। ও তো ঘটনামাত্র ; ওকে বিরাট গুরুত্ব দিলে সেটা গনৎকারের শরণ নেবার মতন হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাস্ট্রনমির জায়গায় অ্যাস্ট্রলজি। আইনস্টাইন জানতেন এটা বিভীষিকা, বিজ্ঞান নয়। আসলে তো তোমার আমার চৈতন্যযোগে আমরা জানি কী করছি, কী করব—সেজন্যই অনুভব দিয়ে একজন বুঝতে পারি আরেক জনের আচরণ ; এই অনুভবের উপলব্ধির যা দাম তার কোনো বিকল্প নেই। কিঙ লিয়র নাটকের এডমণ্ড্ এ কথা জানত। যত-রকম অন্যায় করা হচ্ছে তা নিয়ে সবাই যখন বলছে It is the stars তখন এডমণ্ড্ বলছে It is we। এই মানবিক দায়িত্ব এড়িয়ে বলতে ইচ্ছে করে, সবই নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা, একটা বহিরঙ্গ ঘটনার দরুণ আরেকটা বহিরঙ্গ ঘটনা ঘটছে। সহজ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা পেলে মানুষ বেঁচে যায়। কাল্পনিক কার্যকারণের ফ্রেম এঁটে জগৎকে এভাবে দেখবার ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ও দৃষ্টিটা তো শেষ সত্য নয়।

ছোট বড় নানা-রকম কার্যকারণ সম্বন্ধই আছে জগতে, আর কিছু নেই, একথা বিশ্বাস করেন ব'লেই অনেক শিল্পী খুব সযত্নে নিবেদন করেন 'আজ সকালে আধসেদ্ধ ডিমের সঙ্গে মাস্টার্ড খেয়েছি', সেটাই শিল্পকর্ম ব'লে জাহির হয়। কিন্তু সমগ্র ঘটনা বা পরিবেশ সৃষ্টি করে না, আরো কিছু যোগ করতে হয়। তুমি কে না জানলে তুমি কেন কী করছ বুঝব কী ক'রে ? কেন উৎসাহিত হব তোমার বিষয়ে, যদি পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ কোথাও না থাকে ? সম্বন্ধশূন্য এক পেয়ালা চা কি শিল্পের চা, স্বাদ বর্ণ রুচির যোগেই চায়ের স্বাদ শিল্পে দেওয়া যায়। চায়ের পেয়ালার ডিজাইন বা নির্মিতির অন্য প্রসঙ্গ এখানে আমার আলোচ্য নয়। তুমি কে তা টের পাব যদি জানতে দাও তোমার কী রুচি এবং স্বভাব। কিন্তু আজকাল অনেক লেখায় যে যৌন বিবরণ থাকে তার বক্তব্যটাই এই যে '**আমি** কিছু করছি না, যৌনতার নৈর্ব্যক্তিক খেলাটা চলছে ব'লেই ঘটছে এসব'। ওটা তো মেকানিস্টিক, পজিটিভিস্টিক, যন্ত্রনির্ণীত কথা, কেবলমাত্র তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের দিক বা তথ্যের অসংযুক্ত বিবরণ। ওকে বিরাট ক'রে দেখাটা ভুল। হৃদয়ের আবেশের মতন মস্তিষ্কেরও আবেশ হয়, দুটোই সমান বিভ্রম। এই মস্তিষ্ক সর্বস্ব প্রাণটাকে 'মন' বা 'ইন্টেলেক্ট' ব'লে তারিফ করাও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ বাড়াবাড়ি হয়েছে বড্ড বেশি। বলতে ইচ্ছে করে, শুধু যৌনতার কথা নয়, মানুষের কথা বলো, সম্বন্ধের সূত্র হারালে শূন্যতাই বড় হয়ে ওঠে।

পিকাসোর কথা ধরুন। ভাল ছবি এঁকেছেন অনেক। কিন্তু মাঝে মধ্যে এই আতিশয্যটা এসে যেত। ছবি আঁকছেন—একটা লোকের চুল রয়েছে এক জায়গায়, হাড় আরেক জায়গায়, মাংস আরেক জায়গায়। লোকটা কোথায়? 'ওই তো, ওর যা যা আছে সবই রয়েছে ক্যানভাস্‌এ'। কিন্তু ওটা তো সে নয়। তুমি বলতে পারো 'এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি ওর হাড়ই দীর্ঘজীবী হবে'। তা নাহয় পাচ্ছ, নির্মোহ বিজ্ঞানের দাম নেই বলব না, কিন্তু মাঝখান থেকে লোকটাকে ভুলে যাওনি তো?

জীবনে কোনটা কেন্দ্রীয়, কোনটা পার্শ্ববর্তী খুঁটিনাটি সে তফাতটা তো বাস্তবিক তফাত। তাকে উপেক্ষা করলে সে ভারসাম্যহারানো দৃষ্টির কুফল তো বিজ্ঞানের পক্ষে, চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষেও মারাত্মক। লোকে আজকাল ভাবতে অভ্যস্ত যে সবই বহিরঙ্গ কার্যকারণের ব্যাপার। ফলে যার সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে তার বেলাতেও সাব্যস্ত করে, কোনো বাইরের প্রকরণ দিয়ে সব কিছু শুধরে দেবে। এ বিশ্বাসের অনিবার্য ফল যুদ্ধ এবং মারমুখো রাজনীতি অর্থাৎ বাইরের জোরজুলুম। কিন্তু বোমা তো ব্যক্তিকে চেনে না; তুমিই চেনো। ওসব নীতি থেকেই বোঝা যায়, এ নীতি যারা ঠিক করেছে তারা পরিস্থিতির সঠিক নিদান নির্ণয় করে নি। ব্যাধির স্বরূপ ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারলে তাতেই চিকিৎসার কাজ অর্ধেক এগিয়ে গেল। কোনো নিত্যপ্রযোজ্য ফর্মুলা নেই, পরিস্থিতি দেখে নির্ধারণ ক'রে চলতে হয়---তবে এটা খেয়াল থাকা ভাল যে, ঘোর বিপদের সময়েও প্রায়ই এমন বিকল্প খুঁজলে পাওয়া যাবে যাতে সঙ্কটের ভাবটা কেটে যায়, নতুন শক্তি নতুন সৃষ্টি দেখা দেয়। তখন সেই বিকল্প মতন চলা কাপুরুষতা নয়। সঙ্কট এড়ানো আর সঙ্কট সরিয়ে দিতে পারার মধ্যে তফাত আছে। 'চরম' সময়ে বিহ্বল না হয়ে যে লোক চলতে পারে সে উন্নত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। 'মেরে ফেলব' এ কথাটা যে বয়স্ক মানুষের পক্ষে অশ্রদ্ধেয় তা স্বীকার ক'রেও অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া কী ক'রে সম্ভব সেইটে বার করাই তো চেতনার কাজ, তার চ্যালেঞ্জ। সেই দুরূহ দাবিকে অস্বীকার করায় মনুষ্যত্ব বা শিল্পের পরিচয় নেই।

এই চেতনার কথা বলেছিলেন হার্ডি: Consciousness the will informing till it fashions all things fair। যতটা পারা যায় জগৎকারণকে নিজের কারণ ক'রে নেওয়া—দায়িত্ব তো এটাই। জগৎটা এমন নয় যে তালা বন্ধ, চাবি নেই। চাবি আছে সবার। চাবি ব্যবহার করতে শেখা চাই,

প্রস্তুতি দরকার, Waste Land-এ প্রার্থিত সেই বৃষ্টির মতন যা জমিকে প্রস্তুত করবে। একদিকে দ্বেষ, অসংবদ্ধতা, তুচ্ছসর্বস্ব মন, অন্য দিকে অলৌকিকের আশায় পথ চাওয়া, কবে প্রেরণা আসবে—এটা তো আসল নয়। আসল হলো, মিরাক্‌ল্‌ আছে প্রাত্যহিক সব নির্বাহ আর সম্ভাবনার ছন্দেই, তোমার আমার মন তা দেখতে পেলেই আমরা চিনতে পারি নিজেকে আর অপরকে।

প্রাসঙ্গিকতা আপনিই আসে, তাকে আনতে হয় না, আনবার কোনো ধরা বাঁধা পদ্ধতিও নেই ; কিন্তু আসতে দিতে জানা চাই।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে নান্দীমুখ-পত্রিকাগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ আমাদের সাথে এই সাক্ষাৎকারকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন ? এই ধরনের সাক্ষাৎকারের মূল্য সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ॥ বন্ধু সমাগমকে যেভাবে নিতে হয়। এখন বয়সের ক্লান্তি অনুভব করছি, লাভক্ষতির হিসেব মেলাতে আর মন চায় না।

প্রশ্ন ॥ আপনার জীবনের কোন কোন ঘটনা কিভাবে আপনার কবিতাকে প্রভাবিত করেছে ?

উত্তর ॥ প্রেম, অপ্রেম ইত্যাদি অনুভব যেসব ঘটনার দ্বারা আবর্তিত হয়। নতুন আর কি বলার আছে ?

প্রশ্ন ॥ আপনি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে আপনার কবিতায় জীবনানন্দ দাশ খানিকটা প্রভাব ফেলেছেন। এই প্রভাব ঠিক কি ধরনের ?

উত্তর ॥ শুধু জীবনানন্দ কেন, অনেকের কাছেই আমার কবিতা নানাদিক থেকে ঋণী। সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বাভাবিক কাব্যকুশলতা আমার ছিল না। কবিতা রচনার আদিপর্বে তাই অনেক প্রবীণ কবিকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে আমাকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে হয়েছে। জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে, বিশেষ করে এই দুই অগ্রজ কবির কাছে আমি কবিতার ভাষা শিখেছি, যে কবিতা এখন আমি লিখে থাকি।

প্রশ্ন ॥ সমাজসচেতন বাংলা কবিতার বিকাশ ও আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন, বিশেষ করে চল্লিশ দশকের 'প্রগতি সাহিত্য'-আন্দোলন সম্পর্কে। আমরা মনে করি আপনার কবিতা সেই ধারায় চলেছে, এ বিষয়েই বা আপনার মতামত কি ?

উত্তর ॥ বাংলা কবিতার সমাজচেতনা মঙ্গলকাব্যের সময় থেকেই আমরা অনুভব করে আসছি। আধুনিক বাংলা কবিতার যারা ভগীরথ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন -তাঁদের প্রত্যেকের কবিতায় তাঁদের নিজস্ব সমাজভাবনাগুলি বারবার উঁকি দিয়েছে। কিছুটা পিছুটানের ব্যাপার ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালে, তাঁর আত্মকথনে এবং প্রেমের কবিতায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আধখানা রেনেসাঁসের জোয়ার তাঁকেও স্থির থাকতে দেয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মাঝে মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব সমাজভাবনাগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এঁদের পরেও এলেন নজরুল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষোক্ত কবিরা তাঁদের কবিকর্মের কৈশোরকালেই সাম্যবাদের প্রেমে পড়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এবং বিজয়লাল প্রৌঢ় বয়সে সাম্যের সঙ্গে গান্ধীবাদকেও মেলাতে চেষ্টা করেছেন। তখন পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে।

চল্লিশের 'প্রগতি সাহিত্য' প্রথম থেকেই আমার কাছে খণ্ডিত এবং যান্ত্রিক বলে মনে হয়েছে। বাংলা কবিতায় শ্রেণীসচেতনতা অথবা সাম্যবাদের ভাবনাটা চল্লিশের কবিরাই প্রথম আনেন নি। গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, বিজয়লাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকদিন আগেই আমাদের কাছে ঐ বার্তা বয়ে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের দুটি অবিস্মরণীয় কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে ঘুরেফিরেই আমার মনে আসে—'সুখদুঃখ' ('বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা') এবং 'দুই বিঘা জমি'। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই এঁদের নিজস্ব কবিতার ভাবনাগুলি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন একক প্রচেষ্টায়। চল্লিশের যুগে ব্যাপারটা ঘটেছে একটি সংহত ঐকতানের মধ্য দিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, মিছিল ক'রে। এটা খুবই সুসংবাদ হতে পারতো যদি না আমরা তখন পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হতাম এবং যদি চল্লিশের সমাজসচেতন কবিরা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে তাঁদের জাপতাড়ানো কবিতাগুলির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দিয়েও দুচারটি অপ্রেমের কবিতা লিখতেন। এটা তাঁরা করেন নি। ফলে তাঁদের বেশকিছু

ফ্যাসীবিরোধী কবিতাই ঐসময় আমার কাছে যান্ত্রিক এবং নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়েছে। আজও তাই মনে হয়। 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' অথবা 'জাপ পুষ্পকে জ্বলে ফুলঝুরি, পোড়ে সাংহাই'—ফ্যাসিবিরোধী কবিতার রচনায় শব্দের এইসব চোখঝলসানো প্রসাধন সে যুগে প্রগতিশীল কবিদের অনেক হাততালি কুড়িয়েছে, কিন্তু এইসব কবিতা কি সত্যিকারের ফ্যাসিবিরোধী কবিতা, নাকি অল্প কথাটি যে-দিনের মুখের উজ্জ্বলতা? চল্লিশের কবিতার আজও যাঁরা অনুরাগী পাঠক, এইসব কবিতার মধ্যে তাঁরা কোন্ Cultural Revolution-এর সন্ধান পান, তা বুঝতে পারলে কবি হিসেবে আমারও হয়তো কিছুটা লাভ হতো। চল্লিশের সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সমর সেনকে সামনে রেখে সেযুগে কম হৈ-হল্লা হয় নি। পরে একটা সময় এসেছিল যখন বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সুকান্তকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি বলে প্রগতিশীলরা বেশ কিছুটা হৈচৈ বাঁধান। গোবিন্দচন্দ্র দাস অথবা নজরুল, জীবনানন্দ দাশ অথবা বিষ্ণু দে-কে তাঁদের চোখেই পড়ে নি। বেচারা রবীন্দ্রনাথ!

চল্লিশের দশক বুড়ো হতে না হতেই আমাদের দেশে এলো খণ্ডিত স্বাধীনতা। চল্লিশের একজন পুরোধা-কবিও দেশভাগের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন না, যখন জীবনানন্দ ছটফট করছেন তাঁর 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি নিয়ে। অথবা, জীবনানন্দও তখন তাঁর আশ্চর্য কবিতাগুলি লেখেননি—কিন্তু তাঁর ভিতরে ঐ সময়েই কিছু প্রস্তুতি চলছিল। সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রগতিশীলদের মতো অত সহজভাবে তিনি মেনে নেননি। কিন্তু সেকথা থাক, চল্লিশ পার হতে না হতেই আমরা আরেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম—আমাদের প্রগতিশীল কবিরা দলবেঁধে তখন কবিতার আকাশে 'বিশ্বশান্তি'র পায়রা উড়িয়ে দিলেন। কার, অথবা কাদের স্বার্থে? এসব ব্যাপার নিয়ে এতদিনেও কোনো প্রশ্ন উঠলো না; কিন্তু কেন?

আমার কবিতা কোনোদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল আহরণ করেনি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে। সেখানে আজও যাঁরা জলসিঞ্চন করছেন তাঁরা সবাই দলছুট একক কবি—যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ।

একথা ঠিক যে, চল্লিশের যুগে সুকান্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় বেশকিছু স্মরণীয়

কবিতা লিখেছিলেন। সেসব কবিতা আজও আমাদের টানে, আমাদের পিপাসায় জল দেয়। তবুও চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশ, তারপর পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটে পা দিতেই—আমার কেবলই মনে হয়েছে, ঐ দশকের প্রগতিশীল কবিদের কাছ থেকে আমাদের আর কিছুই চাওয়ার অথবা পাওয়ার নেই। বরং সত্তরে যেসব নতুন কবি এই দশকের রক্তস্নানকে সাক্ষী রেখে সামনে এগিয়ে আসছেন, সুযোগ পেলে একদিন আমার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হবো।

কেন আমি চল্লিশের প্রগতিশীল কবিদের পতাকা নিজের কাঁধে বইতে রাজী নই, সে বিষয়ে বোধহয় আরেকটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। চল্লিশ দশকেই 'ফ্যাসীবিরোধী, প্রগতিশীল' কবিদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে আমার সহাবস্থান ঘটেছে। না ঘটে উপায় ছিল না। জাপ-তাড়ানোর যুগে আমিও কমিউনিষ্ট পার্টির ভলান্টিয়ারী করেছি। পরে, যখন 'ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি'র সঙ্গে আমার কোনো নাড়ির সম্পর্কই ছিলনা, তখনও 'পরিচয়', 'অরণি' 'অগ্রণী' পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছি। আমি কমিউনিষ্ট নই, তা সত্ত্বেও অরুণ মিত্র এবং বিমলচন্দ্র ঘোষ—এই দুই অগ্রজ কবির কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো আত্মিক যোগাযোগ ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমি টেরোরিস্ট পার্টির হুকুমে ওঠবোস করেছি। যখন আরেকটু বড় হয়েছি, তখন আমি চেষ্টা করেছি একজন ক্ষুদে কমিউনিষ্ট হতে। কয়লা শত ধুলেও তার চরিত্র বদলায় না, কাজেই মাঝে মধ্যে যে আমার মনের ভেতর সমাজ-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাগুলি উঁকিঝুঁকি মারবে সে-তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু যেদিন থেকেই আমি কবিতা লেখা শুরু করেছি, আমার যখন যা মনে হয়েছে তাই আমি লিখেছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঐসব কবিতা ছাপতে দিয়েছি। যখন 'পরিচয়' বা 'অগ্রণী'তে কবিতা লিখছি, তখনই আমি 'কবিতা' 'পূর্ব্বাশা' এবং আরও নানা পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছি। আমার মন থেকে যখন যা উচ্চারিত হয়েছে, কোনোদিকে না তাকিয়ে—আমি কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কোনো পরোয়া না করে—তাদের আমি এই পত্রিকায়, ঐ পত্রিকায় পত্রস্থ করেছি। এই নিয়ম আমার কবিতার ব্যাপারে আজও আমি মেনে চলি। আমার কবিতার পৃথিবী একটি বিশেষ অনুভব অথবা একটি বিশেষ পাখির চোখকে নিয়েই নয়। বরং কবিতা লেখার সময় আমি যুধিষ্ঠিরের মতো আমার চারপাশের পৃথিবীকেই নানাভাবে দেখতে চাই। এতে করে, প্রগতিশীল কবিতা বলতে আপনারা যা বোঝেন (অর্থাৎ আপনাদের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা আমার কাছে

যে রকম মনে হয়েছে) তার সঙ্গে আমার অনেক কবিতারই লড়াই বেঁধে যায়। আমি কোনো রাজনৈতিক কর্মী বা যোদ্ধা নই ; পৃথিবীটাকে শিকড়শুদ্ধ নেড়ে দেবার ব্যাপারে বস্তুত আমার কোনো ভূমিকাই নেই। বরং, Cultural Revolution-এর ব্যাপারে যদি কোথাও আমার সামান্য পরিশ্রমও থেকে থাকে—যার মাধ্যম আমার কবিতা, তার জন্যই আমার সমস্ত যুদ্ধ। এই Cultural Revolution কীভাবে হতে পারে ? মাটির ভিতর যা হচ্ছে, চারদিকের মানুষের ভিতর যা হচ্ছে, কবির নিজের মনের ভিতর যা হচ্ছে,—তাদের অস্বীকার করে ? তাদের আংশিক চিত্র উদ্ঘাটন করে ? সুভাষের 'অগ্নিকোণ' অথবা বিমলচন্দ্র ঘোষের মতো 'উত্তরকালের তারা'-র স্বপ্ন রচনা করে ? মাও সে তুং-এর মতো লং-মার্চের কবিতা লিখে, যেখানে আমার দেশে ঐ লং-মার্চের ছিটেফোঁটাও নেই ? নাকি হো চি মিন-এর Prison's Diary-কে সামনে রেখে, জীবনানন্দের 'এইসব দিনরাত্রি', 'বাংলা ১৯৪৫-৪৬', 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতার কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে ? আমি অবশ্যই সাধ্যমতো পরবর্তী কবিদের অনুসরণ করছি ; চেষ্টা করছি আমার চারদিকের মাটির ভিতরে কি হচ্ছে তাই জানতে এবং নিজেকে জানতে। চল্লিশ দশকের প্রগতিশীল কবিদের প্রাথমিক তৎকালীন কাব্যকর্ম এবং কবিতার দিক থেকে (সম্ভব হলে সব দিক থেকেই) তাঁদের পরবর্তী উত্তরণ (?) নিয়ে আপনাদের নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বলি। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-এর ছায়ায় থেকে এবং তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীন ও দ্বিখণ্ডিত হবার পর নেহেরুকে শান্তি-আন্দোলনের পুরোধা করে, তাঁর বিরাট ছাতার নিচে, নিজেদের মাথার রোদকে আড়াল করে, চল্লিশের কবিরা এমন কি বিপ্লবী প্রত্যয় আমাদের মধ্যে এনেছিলেন সে সম্পর্কে এখনই যদি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছাতে পারেন, তাহলে আমাকে অন্তত এই বুঝে নিতে হবে, একটি দেশের Cultural Revolution সম্পর্কে আপনাদের এবং আমার মধ্যে মৌলিক মতভেদ আছে।

প্রশ্ন ॥ যে সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা মার্ক্সবাদের অঙ্গীকার নিয়ে কবিতা লিখছেন সেই সময়ে আপনার কবিতা অনেকটাই অন্য জগতের ('মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ীর শব্দ', 'মুখোশ')। এ ঘটনাকে আপনি বর্তমানে কিভাবে দেখেন ?

উত্তর ॥ যে সময় আমি কবিতাদুটি লিখেছি (যদিও মাঝখানের ব্যবধান প্রায় এক যুগের) তখন আমি পাশাপাশি অনেক রাজনৈতিক কবিতাও রচনা

করেছি। 'মুখোশ' লেখার ঢের আগে ১৯৪৬ সনে 'যতীন দাসের ফটো' এবং 'রাসুর জন্য', 'মৃত্যুত্তীর্ণ' ও 'উলুখড়ের কবিতা'য় প্রকাশিত 'হাতি', 'রুটি দাও', 'বেকার জীবনের পাঁচালী', 'দোল ও পূর্ণিমা' (এসব কবিতা তো আমারই লেখা) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। মার্ক্সবাদে আমার অঙ্গীকার কোনোদিনই সুভাষ বা সুকান্তর সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে চলেনি। ওঁদের দুজনের কবিতার মধ্যেও তো অনেক তফাৎ। বাংলার মাটিতে একজনের কবিতার দীর্ঘদিন ধরেই কোনো শিকড় ছিলনা, অন্যকবি তাঁর কবিতা রচনার শুরু থেকেই জন্মভূমির মাটিকে জানতেন, তার ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়েছেন।

আমার রাস্তা প্রথম থেকেই ছিল ভিন্ন। আজও তাই। 'মুখোশ', 'প্রভাস' অথবা আমার ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলি থেকে আমি কোনোদিনই মুখ ফিরিয়ে নেবোনা। আজও যদি তাদের কাছাকাছি কোনো প্রেম বা অপ্রেমের কবিতা আমার কলম থেকে বেরোয়, তাদের আমি অবশ্যই পত্রিকায় ছাপতে দেবো। বইয়ে ছাপবো। আমাদের দেশ অথবা পৃথিবী এখনও কোনো স্বর্গরাজ্য বা তার কাছাকাছি কোথাও পৌছাতে পারেনি। আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের তাই তো সারা জীবনের লড়াই থেকে যায় এই পৃথিবীটাকে বদলে দেবার। আমার কাজ মাটিতে কান রেখে কোথায় কি হচ্ছে, তার সংবাদ পৌছে দেওয়ার। আর, তখনই আমাকে ঘুরে ফিরে একটি করে নতুন 'মুখোশ' লিখতে হয়। লেখা উচিত।

প্রশ্ন ॥ আপনার কবিতাকে কি আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারেন—বিষয় ফর্ম মিলিয়ে ?

উত্তর ॥ না। আমি কবিতা লিখি (অথবা কবিতার শব্দগুলি আমার কাছে আসে) নিজস্ব অনুভব থেকে। বিষয় অবশ্যই আমার কবিতার অঙ্গ, কিন্তু 'ফর্ম' নিয়ে কোনোদিনই আমার কোনো চিন্তাভাবনা নেই। যদি কোথাও কোনো পরিবর্তন এসে থাকে, আমার অজান্তেই তা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ আপনি কখনো কখনো anti-poetry-র সপক্ষে কথা বলেন। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করুন। anti-poetry বলতে কি committed কবিতা বলছেন ? anti-poetry কি কাব্যগুণহীন জার্ণালিজম ? তাহলে সেইসব রচনার উদ্দেশ্য কি সাধিত হয় ?

উত্তর ॥ anti-poetry কথাটি লাতিন আমেরিকার পাবলো নেরুদা প্রমুখ কয়েকজন কবির মুখে প্রথম শোনা যায়। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা এই রকম : শুধু কবিতার খাতিরে কবিতা লেখার দিন আজ ফুরিয়েছে। আজকের দিনে কবির আনুগত্য কবিতার চেয়ে ঢের বেশী নীরস পৃথিবীর প্রতি, যে পৃথিবী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি বিশেষ শ্রেণীর (অথবা বর্ণের) মানুষদের (অথবা অমানুষদের) দ্বারা লুন্ঠিত ও ধর্ষিত হচ্ছে। তাঁদের মতে কবিতা হলো ঐসব শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ের অস্ত্র—যে কারণে, কবিতার ভাষা হবে কর্কশ এবং ধারালো। তাতে কোনোরকম পোশাকী শব্দ থাকবেনা, প্রসাধন একেবারেই না। এ থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি, তাঁরা কবিতাকে একাগ্নী বাণের মতো ব্যবহার করতে চাইছেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা যুদ্ধাভিলাষী।

বিপক্ষকে চিহ্নিত করার এবং সরাসরি বিদ্ধ করার ব্যাপারটা পৃথিবীর সব দেশের সর্বকালের কবিতাতেই কম বেশী খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে anti-poetry কথাটি শুনতে নতুন হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে তারও একটি ঐতিহাসিক স্বাচ্ছন্দ্য রয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও একই ধরনের বেশকিছু রচনা আমাদের চোখে পড়ে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ॥'

২ 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা,
শকুন বা শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয় !'

'anti-poetry'—কথাটির যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা সবাই 'কমিটেড কবি' এবং যতদূর মনে হয় মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু কমিটেড নন, এমন বহু কবি সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে অথবা মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই **সরাসরি আঘাত করার** ব্যাপারটা তাঁদের কবিতায় সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। যাঁরা কবিতা মানেই বিশুদ্ধ কবিতা—হরবখৎ এ ধরনের কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে anti-poetry-র হয়ে আমি নিশ্চয়ই লড়াই করে থাকি এবং তাই করবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি মনে করি কবিতাকে সবসময় anti-poetry-র নিয়ম মেনে চলতে হবে। একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ ধরনের লড়াই চালাতে গিয়ে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ কবিতামাত্রকেই anti-poetry-র শরণ নিতে হয়, এছাড়া তাঁর অন্য উপায় থাকে না। anti-poetry-র সপক্ষে এর বেশী আর আমার কিছু বলার নেই।

anti-poetry কাব্যগুণহীন জার্ণালিজম, এমন কথা আপনাদের মনে হচ্ছে কেন? বাংলা কবিতায় গোবিন্দচন্দ্র দাস, নজরুল এবং সুকান্ত মাঝেমধ্যেই এই কাব্যরীতিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। কোথাও যে তাঁদের কবিতা কাব্যগুণহীন জার্ণালিজম হয়ে যায় নি, এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারবোনা। একজন কবি যখন প্রচলিত কোনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন এবং একটি কি দুটি কবিতা নয়, অনেক কবিতা দিয়ে তাঁর প্রতিবাদকে জোরালো করতে চান, তখন মাঝেমধ্যেই তাঁর কবিতার বাঁধন আলগা হয়ে যায়, বারবার ব্যবহারের ফলে কিছু শব্দ তাদের ধার হারিয়ে ফেলে। 'কমিটেড' কবিদের এই ক্ষতি স্বীকার করতেই হয়। দেখা দরকার কবি ক্রমাগত প্রতিবাদ করার কালে কিছু সত্যিকারের সার্থক কবিতা (anti-poetry কথাটি এখানে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হবে) লিখতে পেরেছেন কিনা। যদি শেষপর্যন্ত ঐ কাজটি তিনি ক'রে থাকেন তাহলে কবির বিরুদ্ধে, অথবা anti-poetry-র বিরুদ্ধে সজ্ঞানে (অথবা অজ্ঞানে) জেহাদ ঘোষণা করা একজন কবিতা-পাঠকের কাব্যবোধ বা রুচিকেই আঘাত করবে। নজরুল অথবা সুকান্তকে তাঁদের কিছু অক্ষম কবিতার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই বর্জন করবেন না। কমিটেড কবিতার প্রসঙ্গে anti-poetry-র কথা আগে বলেছি; কিন্তু কমিটেড কবিতামাত্রই anti-poetry, আমার কথার এমন ভুল ব্যাখ্যা যেন কেউ না করেন। কমিটেড কবিরা এমন অনেক বিশুদ্ধ (?) কবিতা রচনা করেছেন যা শ্রেষ্ঠ anti-poetryগুলির সঙ্গে সবদিক থেকে তুলনীয়। উপরন্তু, সেইসব কবিতার কাজ অনেকসময় আমাদের মানবচৈতন্যের আরও গভীরে

অনুভব করা যায়। এমন কয়েকটি কবিতার উল্লেখ এখানে করছি :

রূপনারায়ণের তীরে জেগে উঠিলাম (রবীন্দ্রনাথ)

প্রার্থী (সুকান্ত)

অন্ধকারে আর রেখো না ভয় (বিষ্ণু দে)

জননী যন্ত্রণা (মঙ্গলাচরণ)

এইসব কবিতায় কবির প্রত্যয়, সমাজচেতনা এবং কখনও বা তাঁর ব্যথা-বেদনা মাটির সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মিক বন্ধন আশ্চর্য সারল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় সবকটি কবিতার ভাষা সম্পূর্ণ অলঙ্কারহীন এবং প্রসাধনবর্জিত। মঙ্গলাচরণের কবিতাকে অনায়াসছন্দের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুটা অন্যরকম মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেও কবির ভাষা কষ্টকল্পিত নয়। বোধহয় এখানেই শ্রেষ্ঠ anti-poetry-র সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শ্লেষবর্জিত, ক্রোধবর্জিত কমিটেড কবিতার সত্যিকারের মিলন দেখা যায়।

আধুনিক বাংলা কবিতার আরও কয়েকজন প্রবীণ কবি anti-poetry-র সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন। যেমন বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ এবং সমর সেন, বিশুদ্ধ (কমিটেড) কবিতার রচনাতেও এঁদের এবং অরুণ মিত্রর দক্ষতা স্বীকার করে নিতে হয়। এঁদের সকলেরই যেখানে ঘাটতি (সমর সেনকে বাদ দিলে), তা হলো ক্রুদ্ধ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে এঁরা একজনও রবীন্দ্রনাথের মতো স্থির প্রত্যয় নিয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন নি।

সমর সেনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, সত্তর দশকে তাঁর কবিতার জন্য নয় (এ সময়ে তিনি কোনো কবিতাই লেখেন নি) ; সময়, স্বদেশ এবং মনুষ্যত্বের সঙ্গে দুঃসময়েও তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরেছেন—সেই সততা ও সাহসের জন্য। আসলে কমিটমেন্ট কীভাবে আসে, কোথা থেকে আসে, সে সম্পর্কেও এখন আমাদের কিছুটা অনুসন্ধিৎসু হওয়া দরকার। মার্ক্সবাদী বলে নিজেকে ঘোষণা করলেই কি একজনের কবিতায় আপনা থেকে কমিটমেন্ট এসে যায় ? কমিউনিষ্ট পার্টিতে নাম লেখালে ? সমাজবিপ্লব সম্পর্কে অল্পবেশী পাণ্ডিত্য অর্জন করলে ? যদি তাই হয়, তাহলে আপৎকালে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাস, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' অথবা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে আমরা (আমাদের Cultural Revolution-এর কথা মনে রেখেও) কীভাবে গ্রহণ করবো ? দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমাদের কমিটেড কবিরা কেউ একটি, কেউ দুটি, তিনটি বা চারটি কবিতা লিখে দায়মুক্ত হয়েছি। অথচ আমাদের কোনো কবিতাই (বিষ্ণু

দে-র 'জল দাও' ছাড়া। এ প্রসঙ্গেও মনে রাখতে হবে—কবিতাটি যে দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখা, কবি বলে না দিলে তা স্পষ্ট করে বোঝা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ ছিল) জীবনানন্দের 'বাংলা ১৯৪৫-৪৬'কবিতার কাছ ঘেঁসতে পারলো না কেন ?

তাহলে কি শুধু মার্ক্সবাদী হলেই কমিটেড হওয়া যায়না ? বিপ্লবী দলে নাম লেখালেও না ? কোথাও একটি আত্মীকরণের প্রশ্ন থেকে যায় ? পরিশুদ্ধির প্রশ্ন ? হয়তো, আপনারা এর উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু একটা অনুরোধ, একটু ভেবেচিন্তেই উত্তরটা দেবেন।......

প্রশ্ন ॥ যে কোনো বাঙলা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনেই আপনার কবিতা পাওয়া যায়। এত বেশী রচনার সবগুলিই উত্তীর্ণ হয়না নিশ্চয়ই, পুনরাবৃত্তি হবারও সম্ভাবনা থাকে। সে সমস্ত লেখা ছাপানোর যৌক্তিকতা কি ?

উত্তর ॥ কোনো যৌক্তিকতা নেই। খারাপ কবিতা তো ইচ্ছে করেই লিখি না ; অনেক সময় খারাপ কবিতা আমার ঘাড়ে চেপে বসে। বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের সময় একটার পর একটা কবিতা (?) এই পত্রিকায়, ঐ পত্রিকায় নিজে থেকেই পাঠিয়েছি। কোনটা কবিতা হলো আর কোনটা হলো না—এটা ভেবে দেখার সময় তখন ছিল না। বিষয়টাই ছিল প্রধান। ফলে বহু 'কাব্যগুণহীন জার্ণালিজম' হয়েছে। নকশাল তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যখন পুলিশী তাণ্ডব চলছিল, সত্তর দশকের সেই কয়েকটা বছর শুধু প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আমাকে শতাধিক কবিতা লিখতে হয়েছে। 'মুণ্ডহীন ধড়গুলো আহ্লাদে চীৎকার ক'রে', 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা', 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়', 'মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়'—এইসব পুস্তিকাগুলি প্রধানত তারই ফলশ্রুতি। এইসব বইয়েও কিছু দুর্বল কবিতা রয়ে গেছে—বইয়ে নিইনি এমন আরও অসংখ্য কবিতা ঐ সময় একই বিষয় নিয়ে লিখেছি ; সেইসব দুর্বল কবিতাও আমার কাছে তখন প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। পরে সাধ্যমত বর্জন করেছি।

প্রশ্ন ॥ আনন্দবাজার-গোষ্ঠীর কাগজপত্রে আপনি লেখেন না। এ সম্পর্কে কি আপনার কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আছে ?

উত্তর ॥ ওরা লিখতে বলেননা, তাই লিখিনা ; 'দেশ' বা 'আনন্দবাজার'-এ লিখলে আমি রাজা হবো, এমন কোনো শিশুসুলভ চিন্তা বা প্রত্যাশা আমার নেই। এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি।

প্রশ্ন ॥ সাহিত্যিকদের সংগঠন সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনার দীর্ঘ কবিজীবনে যে বিভিন্ন রকম সাহিত্য সংগঠন হয়েছে, তা আপনাকে কি কখনো কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে? এষ্টাব্লিশমেন্টের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কি এই জাতীয় সংগঠন একজন সৎ লেখককে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর ॥ ১) কোন্ সাহিত্যিকদের সংগঠন?
২) না। তবে লিটল্ ম্যাগাজিনগুলিকে যদি একটি করে সংগঠন ভেবে নেওয়া যায়, তাহলে উত্তর অন্যরকম হতে পারে। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক 'গণবার্তা'র কাছেও আমার কিছু ঋণ স্বীকার করার আছে।
৩) এষ্টাব্লিশমেন্টের বিরোধিতার জন্যই কি আপনারা সাহিত্যিক সংগঠনের কথা ভাবছেন? এত অল্পেই আপনারা সন্তুষ্ট হবেন? শুধু এষ্টাব্লিশমেন্টের বিরোধিতা একজন সৎ লেখককে কী সাহায্য করতে পারে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রশ্ন ॥ আপনি মাঝে মাঝে নিজের অথবা অন্যের কবিতা বুলেটিন বা প্যামফ্লেট আকারে প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় প্রকাশনা অনেকটাই আপনি এককভাবে করেছেন। এই ধরনের প্রচেষ্টার পেছনে আপনার কি মানসিকতা কাজ করেছে বলে আপনার মনে হয়? এক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের কোনো সংগঠন কি অধিকতর সফল হতে পারে না?

উত্তর ॥ চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা করা। কোনো সংগঠন যদি এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসতে চায়, সে তো খুবই ভাল কথা।

প্রশ্ন ॥ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের বিপ্লবোত্তর কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনার কি মনে হয়, সেখানকার সাহিত্য ক্রমে অধিকতর যান্ত্রিক হয়ে উঠছে? বর্তমানে কোন্ বিদেশী সাহিত্য আপনাকে টানে?

উত্তর ॥ ১) প্রাচীন চীনের কবিতা কয়েক হাজার বছরের ব্যাপার। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো সেদিনের ঘটনা। রুশ বিপ্লবের পরে মায়াকোভস্কী বেশ কিছু ভাল কবিতা লিখেছিলেন।
২) 'বর্তমান' কথাটি খুবই গণ্ডগোলের। যদি হেমিংওয়ে বা ব্রেশটের নাম বলি? তাঁরা তো এখন আমাদের মধ্যে সশরীরে বেঁচে নেই।

প্রশ্ন ॥ আপনার কবিতা কি এখন আবার অন্য কোনো স্তরে প্রবেশ করছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ॥ না। এজন্য আমার মনে স্পষ্টই বিষণ্ণতা আছে। তবে এ বিষণ্ণতা আমার নিজস্ব।

প্রশ্ন ॥ সাধারণ পাঠকরা প্রায়শঃই অভিযোগ করেন, এখনকার বাংলা কবিতা দুর্বোধ্য। অধিকাংশ পাঠক কবিতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন। ফলে কবিদের সঙ্গে ব্যাপক পাঠকদের যোগ তৈরী হচ্ছে না। এটাকে কি আপনি বাংলা কবিতার সংকট বলে মনে করেন ? এ সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কি ?

উত্তর ॥ যাঁরা কবিতা পড়েন না, তাঁরা কী করে জানবেন, একটি কবিতা বোধ্য অথবা দুর্বোধ্য ? কবিতা না পড়ে কবি বা কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাটা সহজ। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা তো অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং মানুষের জন্যই তিনি কলম ধরেছিলেন। ক'জন প্রগতিশীল কবিতার পাঠক তাঁর নাম জানেন ? সেদিক থেকে আমরা (বর্তমানের কবিরা) তো ভাগ্যবান।

প্রশ্ন ॥ বর্তমানে ভারতে নানাধরনের অস্থিরতা চলছে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, অত্যাচার ও নিষ্পেষণও বাড়ছে। অথচ, তেমন কোনো প্রতিরোধশক্তি তৈরী হচ্ছে না। বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য হতাশা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এইসব বিপ্লবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণী থেকে এসেছেন, যাঁদের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব ও অবক্ষয়ী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। দেশের ব্যাপক জন-সাধারণের সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের তেমন যোগ নেই। ফলে সাধারণ মানুষের আবেগকে বোঝা ও তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এঁদের পক্ষে সহজ হয়না। সংঘবদ্ধতার প্রতিও এঁদের কিছু অনীহা থাকে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কেও এসব কথা খাটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন বলে আপনি মনে করেন ? আপনি নিশ্চয়ই আশাবাদী। আপনার আশাকে আপনি কিভাবে বাঁচিয়ে রাখেন ?

উত্তর : আশা অবিনাশী। তবে আপনারা আমাকে যতটা আশাবাদী মনে করছেন, ততটা নই। আমিও তো মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, এবং যে বিচ্ছিন্নতার

অসুখ আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, তাকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক শরীরে এবং মনে কিছুটা বহন করি। আমার কবিতায় তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়ে গেছে। বিপ্লব কবে আসবে, কিভাবে আসবে তার ভাবনা প্রধানত আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের। আমার কাজ অন্যরকম। যতদিন ঐ আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব না আসছে, আমার চারদিকে মাটি আর মানুষের মধ্যে কি ঘটছে, কিভাবে ঘটছে—যতদূর সম্ভব তাদের বুঝতে চেষ্টা করা; আমার ক্ষমতায় কুলোলে কবিতার মাধ্যমে তাদের প্রকাশ করা। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আমি একই ভূমিকা প্রত্যাশা করি। বুদ্ধিজীবীরা একটি দেশের বিপ্লব আনেন না, তাদের কাজ হলো স্বদেশে Cultural Revolution-এর জমি তৈরী করা। এদিক থেকে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় (বা সাহিত্যে) কি কাজ হচ্ছে, কতটুকু কাজ হচ্ছে, তা অবশ্যই বিবেচ্য। একজন মধ্যবিত্ত লেখক মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের ভেতরে থেকে ততটুকুই সমাজ-বিপ্লবের কথা উচ্চারণ করতে পারেন যতটুকু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। যখন কেউ নিজের সাধ্যের বাইরে এগুতে চান, তখন পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোলাটে হয়ে ওঠে। আমি চাই প্রত্যেক কবি (বিশেষ করে 'কমিটেড' কবি) নিজের পায়ের নিচের মাটিকে আগে ভাল করে চিনে নিন। তিনি যা দেখছেন, যা অনুভব করছেন তা-ই বলুন; এর বেশী যেন তলোয়ার না ঘোরান। যদি কোনো কবির চৈতন্যে অথবা অভিজ্ঞতায় এমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে থাকে যাতে তিনি অনায়াসে মাও সে তুং-এর মতো 'লং মার্চ'-এর কবিতা রচনা করতে পারেন—ঐ কবিতাটি তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন। সেটাই হবে তাঁর স্বাভাবিক কবিতা। কিন্তু সোনার পাথরবাটি যেমন হয়না (আপনারাও তো তাই বলতে চাইছেন), তেমনি আমাদের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যবিত্ত-সমাজের মধ্যে থেকে বিপ্লবী সাজা চলেনা।

তাহলে কি একজন মানুষ তাঁর বিবেককে বিসর্জন দেবেন? চারদিকের নরকের মধ্যেও নিজের চিলে-ঘরটির মধ্যে স্থির বসে থাকবেন? তা তিনি কেন করবেন? মধ্যবিত্ত অবস্থানের ভেতরে থেকেও তো তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন, 'অত্যাচার ও নিষ্পেষণ'-এর বিরুদ্ধে তাঁর anti-poetry-র অস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারেন। নজরুল তাই করেছেন, সুকান্ত তাই করেছেন। অসুবিধা কোথায়? অবশ্যই যাঁরা সমাজবিপ্লবের কাজে সক্রিয় অংশ নিতে চান, তাঁদের কিছু অতিরিক্ত সমস্যা রয়ে গেছে। মূল সমস্যা কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে আমার মনে হয়না। সমস্যাটা হলো আমরা নিজেদের ঠিক মতো declassed

করতে জানিনা। শ্রেণীহীন সমাজ যাঁরা গড়বেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের অবস্থানটাকেও তাঁরা সাধ্যমতো ভেঙে ফেলবেন—এটা আমাদের বিপ্লবীদের কাছে অনেকেরই প্রত্যাশা। কিন্তু যেহেতু এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ—সেই কাজটি আমাদের বিপ্লবী কর্মীরা, আপনারা অথবা আমরা—কেউ এখনো পর্যন্ত ঠিকমত করে উঠতে পারিনি। কিন্তু যা আমরা পারছি না, তা নিয়ে আত্মবিলাপ করেই বা কি লাভ?

বরং আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই যাঁদের অবস্থান, তাঁদের কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করবেন না যা তাঁরা দিতে পারেন না। বরং, চোখকান খোলা থাকলে আপনারা ঠিকই দেখতে পাবেন, খুব ধীরে হলেও আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই অনেক পরিবর্তন ঘটছে। যারা খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক অথবা কৃষক, তাদের ভিতরেও ধীরে, খুবই ধীরে রাজনৈতিক চৈতন্যের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। সাধারণ-রাজনৈতিক কর্মীর বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে আস্তে, খুবই আস্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞান যুক্ত হচ্ছে। আপনারা যা চাইছেন তার অনেককিছুই হচ্ছে। এইসঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলিও দারুণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যা অনিবার্য।

এ সময়ে আত্মসমালোচনার জরুরী প্রয়োজন আছে, তা ঠিক। কিন্তু তা যেন কখনও আত্মবিলাপ না হয়। আপনাদের এবং আমাদেরও সবসময় মনে রাখতে হবে, কোনো দেশেই সমাজবিপ্লব রাতারাতি আসেনা; সেজন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

তার আগে আমাদের (এবং আপনাদের) মাঝেমধ্যেই নরকদর্শন করতে হবে। হতাশা আসবে। বিচ্ছিন্নতার বিষাদ বারবার আমাদের কবিতার অর্ধেক ফসল তুলে নিয়ে যাবে। একটি প্রত্যয়ের কবিতা লিখবার আগে সাতবার আমাদের কলমের নিব ভেঙে যাবে। এখানেই তো একজন কবির জীবন। একজন মানুষের জীবন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা থেকে যাবে। ততদিন আমাদের স্বদেশে, বিদেশে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জন্য মানুষের লড়াই চলতে থাকবে।

১৯৮০

নান্দীমুখ পত্রিকার পক্ষে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিহির চক্রবর্তী ও দিলীপ পাল।

বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও লোথার লুৎসে-র সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ বুদ্ধদেব, প্রথমে আমাদের আলোচনার একটা পুরনো প্রসঙ্গ সামান্য ছুঁয়ে যেতে চাই, সে হলো আপনার উপন্যাসের গঠন-প্রসঙ্গ। মনে পড়ছে আগে একদিন এই প্রশ্নটি তুলেছিলাম যে, পরিকল্পিত রূপবিন্যাস এবং নির্মীয়মাণ গঠন-বিকাশ এদের মধ্যে হয় তো নির্বাচনের একটা ব্যাপার আছে। এখন, এই মাপকাঠিতে আপনার উপন্যাসকে কোন্‌খানে রেখে আপনি দেখবেন ?

উত্তর ॥ অন্তত নিজের কথা বলতে গেলে আমার মনে হয় যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ-দু'টোই অল্প-অল্প ক'রে রয়েছে। যখন আমি উপন্যাস লিখতে শুরু করি, পুরো বিষয় সম্পর্কে তখন আবছা একটা ধারণা মাথায় থাকে। কখনো এরই মধ্যে শেষটা ভেবে রাখি, কখনো বা নয়। এমন হ'তে পারে যে, মাত্র একটা বা দুটো চরিত্র আমায় টানছে, কিংবা হ'তে পারে আমার কোনো বন্ধুর জীবনের কোনো ঘটনা, অথবা আমার নিজের জীবনের—হ'তে পারে তা-ও, আর···কিন্তু শেষ অবধি চিন্তার প্রস্তুতি থাকে একটা, যদি তা' লেখা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত-নির্দেশের আকারে না-ও হয় ; এবং এই লেখার পদ্ধতি—আমার ক্ষেত্রে গত ২০-২৫ বছর—ভীষণ শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার, কখনো আট, দশ, বারোবার একটি মাত্র পৃষ্ঠা আমি লেখালেখি করি, আর এটা এগোতে থাকে এইভাবেই। উপরন্তু গদ্যের ছন্দোরক্ষা এবং নির্দিষ্ট একটা অন্তঃসঙ্গতি আগাগোড়া বজায়

রাখতে বিশেষ যত্ন নেওয়া—এ আমার এক ধরনের বাতিক বলতে পারেন। এবং আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি, শ্রেষ্ঠ বা অনতিশ্রেষ্ঠ প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রেই উদ্ভাসমান স্বজ্ঞা কিংবা যেন একটা কিছু উঠে আসছে গভীর থেকে—এইরকম অনুভব ঘ'টে থাকে; এমনকিছু জিনিস আছে যেগুলো আগে থাকতে ভেবে রাখা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি মনে করি, আমার উপন্যাসের গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে সমগ্র বক্তব্য এটুকুই। আগাগোড়া এ বেড়ে ওঠেনা কোনো সামঞ্জস্য বজায় রেখে, যেমন আপনি বলেন, এবং আমি মনে করি একে খানিকটা অন্তত পূর্বপরিকল্পিত হতেই হবে। শেষ পর্বটা হ'লো সবচেয়ে কঠিন, এবং লেখা শুরুর আগেই তা যদি আপনি ভেবে নিয়ে না-থাকেন, তবে আরো বেশি কঠিন এটা, কোনো চুক্তিসম্মত লক্ষ্যে পৌছনোর আগে অবধি এর জন্য অনেক অনুমান, অনেক প্রয়াসের দরকার পড়ে।

প্রশ্ন ॥ বুদ্ধদেব, আমার আর একটি পর্যবেক্ষণের কথা সেদিন উল্লেখ করেছিলাম—আপনার উপন্যাস একেবারে প্রথমবার পড়তে গিয়ে এ-কথাটা সচেতন বা অসচেতনভাবে আমায় ধাক্কা দিয়ে যায় যে, উপন্যাস লেখার সময়ে আপনি হয়তো সাঙ্গীতিক-গঠনের কিছুকিছু সূত্র দ্বারা পরিচালিত হন। আপনার উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বাঙ্গের নানা শিরোনামায় ঋতু এবং দিনের বিভিন্ন সময়ের এমন একটি প্রয়োগ লক্ষ করেছি। অন্য কোনো এক প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের কতকগুলো সূত্র আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের সূত্র: বিভিন্নরকম উপস্থাপনা, মুড এবং আবহাওয়ার একটি আবর্তন। এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ আপনি কি গ্রহণ করবেন?

উত্তর ॥ হ্যাঁ। এটা আমার খুব ভালো লাগছে যে, আপনি আমার ষ্টাইলের মধ্যে কিছু সাঙ্গীতিক-উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, তবে সাঙ্গীতিক শব্দটি এখানে অবশ্যই ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যন্ত প্রসারিত অর্থে। আমি জানি, (লুৎসেকে···) আপনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ, শব্দটির প্রকরণগত-অর্থের দিক থেকেই, জানি—আপনি নিজে বাজান এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দু-দেশের সঙ্গীতেই অনুরাগ আপনার। সে-অর্থে আমি হচ্ছি দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম সঙ্গীতবিদ, কিন্তু মনে হয় আপনার পর্যবেক্ষণটা আমি বুঝেছি। নিজের মতো করে, নিজের ভাষায় তর্জমা ক'রে বলতে গেলে বলবো, যেটা আপনি বলতে চাইছেন তা হ'লো, আমি যা আগেই জানিয়েছি,

বাক্যগুলোর ভিতরে একটা স্থনির্দিষ্ট ছন্দ বজায় রাখতে আমি চেষ্টা করি। অন্যভাবে বলতে গেলে মনে হয়, গদ্যরচনায় বৈচিত্র্যমুখর ছন্দ আনার জন্য তা'তে আমি নিজস্ব বিনীত ভঙ্গিমায় কবিতার উপাদান প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের কয়েকটি মহলে অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য লেখার জন্য আমি অভিযুক্ত। তা' আমি করি। তা' করি সচেতনভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, কেননা আমি অনুভব করেছি, ছোট ছোট বাক্যের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে চলাটা আমার মাতৃভাষার একটা অভাবের দিক। এবং মনে হয় এ-বিষয়টি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, যদি একজন সাবধান না হয়, তার গদ্য তবে হ'য়ে পড়ে ভোঁতা, ক্লান্তিকর, কারণ, আপনি জানেন, বাংলায় ক্রিয়াপদ সর্বদা বা প্রায়শই আসে বাক্যের শেষে। এখন, রবীন্দ্রনাথই আমাদের শেখালেন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে, শেখালেন কী ক'রে বাক্যের সঙ্গে খেলতে হয়, তাকে উল্‌টিয়ে নিতে হয়, লাঙ্গুলে মোচড় দিতে হয় তাকে—ইত্যাকার সব ব্যাপার। বলা উচিত, কবিতার পঙ্‌ক্তির মতোই বাক্যগুলোর সঙ্গেও খেলতে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি পাক দিয়ে বা পাক খুলে তাদের ছোট বা বড় ক'রে, ব্যাকরণের দিক থেকে সম্পর্কশূন্য বাক্যখণ্ড যুক্ত ক'রে নিয়ে খেলতে। এতে হয়তো পাঠক সামান্য নিঃশ্বাসের কষ্ট অনুভব করবেন, কিন্তু বিশ্বাস করি, গদ্যকে স্থনির্দিষ্ট একটি ঋজুতা অর্পণ করে এটি, যে-ঋজুতা কবিতা পেয়ে যায় ছন্দের আঁটোসাঁটো বাঁধন থেকে। সুতরাং এদিক থেকে দেখলে আপনার মন্তব্য আমি গ্রহণ করতে বাধ্য, কারণ সঙ্গীতে আমি নেহাৎই একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, একমাত্র ভালোবাসা আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান—যাকে খুব কমই পারি পেরিয়ে যেতে।

প্রশ্ন ॥ আমি জানি না, এ ব্যাপারে আপনি একটু বেশি বিনীত হচ্ছেন কিনা, তা সে যাই হোক, ফলশ্রুতি নিশ্চিতভাবে দাঁড়ালো এক উঁচুদরের শৈল্পিক সমগ্রতা, আপনার উপন্যাসে যা আপনি অর্জন করেছেন, এবং এই পূর্ণায়তির মধ্যে, যে-চিঠিটি এক্ষুণি পড়লেন আপনি, তারও অবশ্যই একটা সুনিশ্চিত স্থান রয়েছে, কমবেশি আনুষ্ঠানিক সে-স্থান। এখন, আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, আপনার কিছু পাঠক আপনার এ-চিঠিগুলোর ভাববস্তুকে ধ'রে নিলেন বাণী হিসাবে, রুশোর সেই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের ধরণেই প্রায়। তা', এ-জাতীয় ব্যাখ্যা কি আপনি অপছন্দ করবেন?

উত্তর ॥ 'মৌলিনাথ'-এ আমি এমন একজন মানুষকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে সারাজীবন ধ'রে, অজস্র মূল্য দিয়ে, নিজেকে উৎসর্গ ক'রে, কঠোর চেষ্টা করেছে একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হ'য়ে উঠতে। ফ্লবেয়ারের মতোই কোনো একজন, বলবো আমরা, যা…এ-আদর্শ মানুষের স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না; এবং অন্যজাতের শিল্পীর ক্ষেত্রে, যেমন ধরা যাক, তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কি, ভীষণ গভীর-ভাবে বেঁচে ছিলেন তাঁরা—যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে, জুয়ার মধ্যে দিয়ে, মাতলামি, ভালোবাসাবাসি, সবরকম জিনিসের মধ্যে দিয়ে, আর খেলাধুলো—এবং এইরকমভাবেই তাঁরা দুজনে কাটিয়ে গেছেন তাঁদের আগ্নেয়-জীবন। আর একটা ধরণ আছে, যা মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার ধরণ, নিজেকে যা বহির্জগত থেকে বিযুক্ত ক'রে ফেলে—খানিকটা উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স-এর সেই পরিস্রুত বা 'Refined in the Lager'-এর আইডিয়ার মতো—নিজেকে তৈরি করার অভিপ্রায়ে…শুধুমাত্র শিল্পের জন্য বেঁচে থাকতে। এখন, স্বভাবত এ-ব্যাপারটা যেকোনো মানুষের উপর একটা সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করে, সে তিনি যতই গুণী হোন। এবং এই চিঠিটা দেখিয়েছে তাঁর…এ ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে রুশোর ধরণের, যেমন বলেন আপনি, যখন আপনার জন্য পড়ছিলাম, তখন আমাকেও আঘাত করেছিলো এটা। কিন্তু এ হ'লো একজনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, বা বলবো প্রতিক্ষেপ, যখন সে-মানুষ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর নিজেকে বন্দী ক'রে রেখেছে নিজের পড়াশোনায়, ফিরিয়ে দিয়েছে মেয়েটিকে—আসলে দুজন মেয়ে—যারা তীব্রভাবে তাকে ভালোবাসতো, পেয়েছিলো তার চেয়েও কমবয়সী এবং আরো বেশি পছন্দমতন স্বামী, তার বয়সের পক্ষে কমই উৎকেন্দ্রিক। তাই এ হলো… সে যাক্, তাই যখন বলি এ হলো রুশোর মতো, তখন ঐতিহাসিক ভাবে আমরা ভুল নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও আমাদের যোগ করতে হবে যে, নিছক রুশো নয়, এ হলো প্রতিক্রিয়া, একজন মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যে-মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন চেষ্টা করেছে।

প্রশ্ন ॥ আপনার অনুমতি নিয়ে আর একটি জিনিস আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। একজন অত্যন্ত-প্রভাবশালী জর্মন সমালোচক,—খুব বেশিদিন হ'লো মারা যাননি—নাম অ্যাডোরনো, অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পকর্ম এবং যাদের তিনি বলছেন অন্তর্বৃত শিল্পকর্ম—এ দুয়ের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা টেনেছেন, তাদের দাঁড় করিয়েছেন

অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পের বিরুদ্ধে, দাবি করেছেন যে, শেষপর্যন্ত এই অন্তর্বৃত শিল্পকর্মই, অঙ্গীকার-আশ্রিত অ-সাহিত্যিক শিল্পকর্মের চেয়েও, আরো বেশি স্থায়ী, প্রভাবসঞ্চারী। যদি আপনি পুনর্বার এমন একটি মাপকাঠি কল্পনা করেন, এ দুটি বস্তু হচ্ছে যার দুই মেরু, নিজেকে কোথায় রেখে আপনি দেখবেন ?

উত্তর ॥ আমি মনে করি আমি হচ্ছি অন্তর্বৃত শিল্পীদের দলে, অন্ততপক্ষে প্রকরণগত দিক দিয়ে। কিন্তু এ পর্যবেক্ষণ আমায় ভাবিয়েছে। অঙ্গীকারবদ্ধ বলতে আজকাল আমরা বুঝি—ফরাসীরা যাকে বলছে engage—অর্থাৎ অঙ্গীকারবদ্ধ; কিন্তু এর একটা রাজনৈতিক ইঙ্গিতবঙ্কিমা আছে। কিন্তু মনে হয় এই বিরোধিতা, অন্তর্বৃত···মনে হচ্ছে আপনার ব্যবহৃত বিশেষণটা আরো ভালো ছিল--যেমন রুদ্ধ ও মুক্ত, অন্তর্বৃত ও প্রত্যক্ষ; তলস্তয় বা দস্তয়েভ্স্কির নাম করবো আবার, পছন্দ করেন যদি, তাঁরা ভীষণরকম মুক্ত লেখক, কিন্তু জড়িত নন কোনো রাজনৈতিক ধর্মমতে। 'যুদ্ধ ও শান্তি'র পুরোটাই রাজনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি ঠিক জানিনা কোন্টার প্রভাব বেশি স্থায়ী। হয়তো সমকালীন লেখায়, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কোলাহল আর হাঙ্গামা চলছে, অঙ্গীকারবদ্ধ বা মুক্ত লেখকেরা কোনো-না-কোনোভাবে হয়তো একটা সাংবাদিকতার রঙ এনে ফেলেছিলেন নিজেদের লেখায়—তাঁদের মৃত্যুর পর যা চিহ্নিত ক'রে দেয় তাঁদের সময়কে; কিন্তু সংবৃত লেখকেরা সময়ের দ্বারা চিহ্নিত হন না, জেম্স্ জয়েসের ইউলিসিসকে এখনো বেঁধে ফেলতে পারেনি সময়, তবে সেই সব লেখকদের কথাও ভাবতে পারি—যাদের তা পেরেছে। কিন্তু যদি আমরা সাহিত্যের সম্পূর্ণ চৌহদ্দিটিকে বিবেচনা করি, বিবেচনা করি বিশ্বসাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসকে, তাহলে এটা অত্যন্ত-ভঙ্গুর একটা উক্তি হ'য়ে যায়, তাই নয় কি? কোন্ কবি হোমরের চেয়েও বেশি চিরায়ত? মহাভারতের চেয়ে কোন্ বই বেশি চিরন্তন? এবং এগুলো হলো অত্যন্ত বেশিরকমের মুক্ত-গ্রন্থ। তাই, আমি মনে করি, জর্মন সমালোচকের পর্যবেক্ষণটি একটা জায়গা পর্যন্ত ঠিক, বিশেষভাবে আমাদের সময়ে; এবং আমার কাজের জন্য বারবার আমায় যে 'গজদন্তমিনারবাসী কবি' বলা হয়, তাতে আমি লজ্জিত নই। 'গজদন্ত-মিনার' বলতে ঠিক কী বোঝায় আমি জানি না। জর্মন ভাষায় এরকম একটা শব্দ আছে না, অনেকটা 'শিল্পকবিতা' গোছের, মানে যেটা হলো Kunst··· ?

প্রশ্ন ॥ *Kunst poesie ?*

উত্তর ॥ হ্যাঁ, Kunst poesie, এমন কিছু, যা সৃষ্ট, এমন কিছু যা 'লোকায়তের' বিরোধী, তাই তো ?

প্রশ্ন ॥ এমন কিছু, যা নির্মিত, দেখুন, জর্মন Kunst'এর দু-রকম মানে,—'শিল্পিত', আবার 'কৃত্রিম'—দুই-ই।

উত্তর ॥ ঠিক, ঠিক! তাই আমি মনে করি, সেই গোষ্ঠীরই আমি অন্তর্ভুক্ত, কবিতা ও গদ্য দু-দিক থেকেই।

প্রশ্ন ॥ বুদ্ধদেব, তাহলে স্বীকার ক'রে নেওয়া যাক যে, যে-কোনো শিল্পকর্ম, যে-কোনো লেখাই খানিকটা আত্মজীবনীমূলক ; তথাপি কেউ আবারও কিছুটা পার্থক্য টানতে পারেন—আত্মজীবনীমূলক লেখা এবং যাকে বলা যায় 'বাস্তবায়িত শিল্প'—দুয়ের মধ্যে। এবং এ-প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একজন ফরাসী ঔপন্যাসিকের একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক বক্তব্য দেখাতে চাই, ইনি প্রতিবেশী দেশ জর্মনীতে একটি উপন্যাস লিখে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছেন—এই তো ক'দিন আগে, নাম : 'Le roi-des-aulnes', যা গ্যোয়েটের 'Erlkoenig' এর উল্লেখ। এখন, এই উপন্যাসের ব্যাপারে যখন তাঁকে ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়, তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, তাঁর নায়ক Tiffauges'এর মধ্যে কতটা তিনি নিজেকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। খুব কৌতূহলজনক একটি কথা তখন তিনি তুললেন ; বললেন : 'আমি বিশ্বাস করি, একজন ঔপন্যাসিক'—তাৎক্ষণিক তর্জমা করছি—'সেইসব চরিত্র সৃষ্টির জন্য নিজের কাছে ঋণী থাকেন, যেগুলো তাঁর নিজের মতো নয়। সত্যিকারের একজন ঔপন্যাসিকের এই হলো সংজ্ঞা। আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যিক সৃজনশীলতাকে এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে।' তা, আপনি কি এঁর সঙ্গে একমত, অধিকন্তু এ-প্রসঙ্গে আপনার নিজের উপন্যাস 'মৌলিনাথ'কে কীভাবে এনে আপনি দেখবেন ?

উত্তর ॥ আচ্ছা। তা এই ফরাসী ঔপন্যাসিক বলেন যে, লেখকের কর্তব্য সেই জাতের চরিত্র সৃষ্টি করা, যারা তাঁর মতো নয় একেবারেই, তাই তো ?

প্রশ্ন। মোটামুটি তাই।

উত্তর। কিন্তু এখানে আমি তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হ'তে পারছি না। প্রথমে আমাদের সকলেরই-জানা কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। এই যেমন, তলস্তয় একজন খুব বড় জাতের বস্তুমুখী লেখক ছিলেন, নয় কি? তিনি ছিলেন শান্ত, নিরাবেগ, হোমরীয় একটা ব্যাপার ছিলো তাঁর মধ্যে কিন্তু একই সঙ্গে, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত জানা থাকার ফলে, অন্ততপক্ষে আমি অনুভব করি যে, 'আনা কারেনিনা' লেখার সময়ে নিজেকে তিনি চিরে ফেলেছিলেন, বা নিজেরই কয়েকটা টুকরো—গোটা মানুষটা তা নয় অবশ্যই—চিরে ফেলেছিলেন দুজন মানুষে, একদিকে লেভিন—লেভিনরূপে তাঁর উৎকৃষ্টতর সত্তা, আর তলস্তয়ের যৌবনের অসংযমী দিনগুলো রূপ পেয়েছিলো ভ্রন্‌স্কির মধ্যে। এখন, এ-প্রসঙ্গে, কিভাবে··· বলছিলাম যে, তলস্তয় নিশ্চয়ই মানুষ হিসাবে লেভিন আর ভ্রন্‌স্কির সামগ্রিকরূপের সঙ্গেও তুলনার-অতীত এক মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কথাটা হচ্ছে, লেভিনের ভিতর র'য়ে গিয়েছিলো পরিণত তলস্তয়ের উপাদান এবং ভ্রন্‌স্কির ভিতর খুঁজে পাই আমরা যৌবনদীপ্ত তলস্তয়কে। একটি মানুষ, যে কখনো ঘোড়ায় চড়েনি, ঘোড়াকে ভালোবাসেনি কখনো, কেমন ক'রে সে পারলো অবিস্মরণীয় সেই ঘোড়দৌড়ের ছবি আঁকতে? জানেন তো, এ হলো, শেষ অবধি—এ হলো মানুষ; এমনকি ফ্লবেয়ারও সফল হননি—সম্পূর্ণ বিবিক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং ব্যক্তিগত স্পর্শ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হ'য়ে হাসপাতালের বিছানার মতো কোনো একটা ছবি আঁকতে। কখনোই আমি লিখতে পারিনা কোনো তাহিতি-রমণীর কথা, যাকে কোনোদিন দেখিনি। আমার য়ুরোপীয় ও আমেরিকান অনেক বন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁদের একজনকেও কোনো উপন্যাসে নিয়ে আসতে আমি সাহস করবো না, কারণ আমি অনুভব করি যে, এঁদের সম্পর্কে জ্ঞান আমার সীমিত। আগেকার দিনের ব্রিটিশ ঔপন্যাসিকেরা, ভারতবর্ষ নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন, এ-সম্পর্কে তাঁদের একটা বিরাট দুর্বলতা ছিলো, কেননা ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে খানিকটা হলো বিদেশ, খানিকটা···আপনি জানেন, ঐরকম সব ব্যাপার। লোকজন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে তাদের ভিতরে, তাদের চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে আমরা দু-রকমের ধরণ দেখি; যেমন, গ্যোয়েটের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই আত্মজীবনী,—গদ্য, কবিতা দু'ক্ষেত্রেই। শিল্পিত লেখকদের মধ্যে, 'Kunst-poet'-দের মধ্যে সফল ছদ্মবেশ আছে একটা, যেমন ফ্লবেয়ারের ঃ

নিজের কথা বলতে গেলে···ঠিক সেই বিশুদ্ধ···আমার গোটা আমি, আমার প্রকৃত আমিটিকে একটা উপন্যাসের ভিতর বজায় রাখা একদম অসম্ভব ; সত্যি বলতে, নিজের প্রকৃত-আমিকে কি আমি জানি ? কিন্তু শুধু বাইরের ব্যাপারগুলো দিয়ে যদি আমরা মৌলিনাথকে ভাবি, একটা পৃষ্ঠা যার থেকে পড়লাম—এখন, আমি একজন বিবাহিত মানুষ, ছেলেমেয়ে আছে, গৃহস্থ, আমার একটা সুখী বিবাহিত জীবনও আছে—বাইরের দিক থেকে আমি তো একেবারেই মৌলিনাথের মতো নই ; নিজের শিল্পের জন্য ছেড়েছি কিছু, কিন্তু জীবনের মধুও তো পান করেছি অনেক। তবু, মৌলিনাথের ধারণাটা আমি বুঝি। তার জীবাণু রয়েছে আমার মধ্যে, আমিই হ'তে পারতাম সে ; না-হলেও আমি মনে করি না যে, তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে কোনোকিছু বিশ্বাসযোগ্য কাজ আমি করতে পারতাম। আর মনে করি, সেটাই হলো·· জানিনা নান্দনিকের ভাষায় কী ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, কীটস্ যাকে বলেছেন 'negative-capability'। যেমন ধরুন, আমি লম্পট নই, কিন্তু নিজেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে এক-এক সময়ে মনে হয় যে, তা আমি হ'লেও হ'তে পারতাম। এটা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটা বেছে নেওয়ার ব্যাপার, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে·· অর্থাৎ, প্রায়শই একটা বেছে নেওয়ার ব্যাপার। তাই একজন লম্পটকে আমি এঁকে তুলতে পারবো ব'লে মনে করি। কিন্তু যেহেতু আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কোনো যুদ্ধে লড়াই করিনি কখনো, সংবাদপত্র ছাড়া কোনো ধারণাই নেই আমার, কী করে যুদ্ধ করতে হয়—তাই যুদ্ধের দৃশ্য আঁকা অবশ্যই আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এবং এরকম ক্ষেত্র অনেক আছে। প্রসঙ্গত টোমাস মানকে ধরুন—আমরা আগের সন্ধ্যায় তাঁর কথা আলোচনা করছিলাম। তিনি একজন এত-বড়ো লেখক, কিন্তু সীমানা তাঁর তলস্তয়ের অর্ধেকও নয়। সেটা নিশ্চয়ই তাঁকে লেখক হিসাবে ছোট করেনা, শুধু পার্থক্যটা দেখিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয় যে, যে-কোনো লেখক, তিনি যতই গুণী হোন, নিজের পরিপার্শ্বের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে ; তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর চারপাশ, যা তিনি জানেন, যা তিনি দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, যেসব মানুষকে ভালোবেসেছেন তিনি, বা করেছেন ঘৃণা, এই সমস্ত কিছু।

প্রশ্ন॥ এ উপন্যাসে আপনার চমৎকার সূচনাদৃশ্য, শেষঅবধি একরকম কেন্দ্রিত-আলো যেখানে ফোকাস করছে পাঠমগ্ন যুবকটির উপর, মৌলিনাথ কবিতা পড়ছেন, সুইনবর্ণ পড়ছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ নয়,—আচ্ছা, এটা কি একটা কাকতালীয় ঘটনা ?

উত্তর। এটি আমাদের ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছে আত্মজীবনী প্রসঙ্গে। তখন, আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং সেকালে—১৯২৮ বা ২৯ হবে সেটা, অনেক অনেক বছর আগে, অন্তত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এডোয়ার্ডীয় সূর্যাস্তের আমেজ লেগে ছিলো তখনো, সেসময়ে আমি, খুব অল্পদিনের জন্য, সুইনবর্ণের প্রতি নিবিড়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। বেশিদিন রইলো না এই ঘোর, খুব শিগগিরই উপলব্ধি করলাম, কত অগভীর তিনি। কিন্তু আপনি জানেন, কারোর ক্ষেত্রে প্রথম যৌবনের এইসব স্মৃতি কত মহার্ঘ, এবং আজ অবধি আমার মনে সুইনবর্ণের জন্য একটা দুর্বল কোণ বজায় আছে। রবীন্দ্রনাথের বদলে তাঁর সুইনবর্ণ আবৃত্তি করার আরও একটা কারণ ছিলো। এই পঙক্তিগুলো এক হিসাবে সুইনবর্ণের বিধর্মী আচরণের সাক্ষ্য, অন্ততপক্ষে একজন অল্পবয়সী বাঙালী কবি হিসাবে আমি, বলতে পারেন, সবে যে কবিতা লিখতে এবং প্রকাশ করতে শুরু করেছে—লিখতে নয়, শুরু করছে প্রকাশ করতে—আমার কাছে এই পঙক্তিগুলো ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মতো। জানিনা, আপনিও অনুভব করেন কিনা, একটা বিশেষ…অনেকরকম ব্যতিক্রম সত্ত্বেও শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা স্পর্শ আছে—অবশ্যই তিনি আমাদের কাছে সবকিছু, আমাদের সর্বেসর্বা, তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুই নই; সেটাও একটা প্রশ্ন। এখন, এই পঙ্‌ক্তিগুলো 'The Laurel, the palms and the paean, the breasts of the nymphs in the brake'—বেদনার তীব্র-দংশন বর্জিত এই প্রাচীন গ্রেকোরোমান পৃথিবী, অন্তত সুইনবর্ণ যেমন দেখিয়েছেন, অথবা চৈতন্য বা নৈতিকতার তীব্র বেদনা—এখন এটি, আপনি বুঝতে পেরেছেন যেটা, যথেষ্ট ছোট ছিলাম আমি, কিন্তু পিছনে তাকালে, মানে…মানে আর কি সাহিত্যের ইতিহাস, এর একটা বিরাট আবেদন ছিলো আমার কাছে, এবং সুইনবর্ণকে আমি এই যুক্তিতেই রেখেছি। খানিকটা আত্মজীবনী, এবং কিছুটা আবার ইন্দ্রিয়মুখরতা, বা এমনকি কামুকতাও, যা সেসব দিনে—সেই ১৯২০-এর শেষদিকে ভ্রূকুটি অর্জন করেছিলো বাংলা লেখার জগতে, আর 'মৌলিনাথ' লেখার সেটাই হচ্ছে সময়; অশ্লীল লেখক হিসাবে ভীষণভাবে আমরা নিন্দিত হ'লাম, এবং আমি এখনো নিন্দিত।

প্রশ্ন। যদি বাংলাদেশে এমন কোনো কবি এবং লেখক থেকে থাকেন, যাঁর প্রতি আমি 'poeta-doctus' নামটা ব্যবহার করতে পারি, সে হ'লেন আপনি।

এটা ঠিক প্রশংসা নয়, কারণ আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার ভেতরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং শিল্পীটির মধ্যে কোনোরকম সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা, অথবা এ-দু'টি, আপনার এ-দুই অংশ সবসময়ে একজাতের সামঞ্জস্যের ভিতর থাকে, এই মুহূর্তে যেরকম দেখছি ?

উত্তর ॥ শব্দের নিজস্ব অর্থ, অ্যাকাডেমিক অর্থ অনুযায়ী আমি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কিনা, আদৌ তা জানিনা, কিন্তু বুঝি যে সেটার—অর্থাৎ, পাণ্ডিত্যের—একটা মেজাজ আমার মধ্যে আছে। এটা বেড়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। যতদিন তরুণ ছিলাম, বা ছিলাম তারুণ্যময়, এ ব্যাপারটা একদম ছিলোনা আমার, অর্থাৎ, যতদিন-না বয়স পৌঁছলো চল্লিশে ; কিন্তু এটা এসেছে বোদলেয়র আর রিল্‌কের অনুবাদ করতে করতে। আমার পক্ষে এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিলো। আমাকে টীকা লিখতে হতো, লিখতে হতো বাঙালী পাঠকদের জন্য ; পরোক্ষ উল্লেখ ছিলো অজস্র—গ্রীক, রোমান, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নেওয়া—যেগুলো মূল পাঠে রাখতাম আর টীকায় যাদের ব্যাখ্যা ক'রে দিতে হতো। তাই, এটা—এবং আমি কালিদাসের 'মেঘদূত'ও অনুবাদ করেছি, একজন পণ্ডিত হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠার সেই হলো সূচনা ; সে সময়ে আমায় প্রচুর পড়তে হতো, দেখতে হতো অভিধান, এ এমন একটি জিনিস যা আগে কখনো করিনি ; এবং ক'রে আনন্দ পেতাম। ঘটনাচক্রে সে সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি পড়াচ্ছিলাম, একটি আর একটিকে সাহায্য করেছে ; আমার উদ্দীপনার একটা অংশ আসতো তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের পাঠক্রম উদ্ভাবনের চেষ্টা, টেক্সট্‌-বই অনুসন্ধান এবং মূলত, ক্লাসঘর থেকে। সৌভাগ্যবশত সেকালে আমার ভালো ছাত্রও ছিলো অল্প কয়েকজন, খুব আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক অভিজ্ঞতা এটা। তাই, সেটাই ছিলো কিভাবে,…তা এখন, মহাভারত নিয়ে যে বইটা লিখছি, তার কথা আপনাকে আমি বলেছি ; ঠিক এরকম কাজ আগে কোনোদিনও করিনি। পাদটীকা আমি ঘৃণা করি সারাজীবন ঘৃণা করেছি পাদটীকাকে, কিন্তু এ-গ্রন্থে তা রাখতে হয়েছে অজস্র পরিমাণে, ঠিক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নয়, বরং যে নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি, আপেক্ষিকভাবে তা' আমার কাছে নতুন—সেজন্য। প্রতি পদক্ষেপে আমি চাইতাম নিশ্চিত হ'তে যে, অন্তত তথ্যের দিক দিয়ে যেন ভুল না করি, আর চাইতাম পাঠকদের, চাইতাম—তাঁরা যেন পরখ ক'রে নেন আমার

তথ্যগুলো সঠিক কিনা। তাই, যদি ভুলচুক করতাম কখনো, তাঁরা আমাকে তা জানাতে পারতেন। এবং এই ব্যাপারটাই আমায় নিয়ে গেছে নানা ক্ষেত্রে, শুধু মহাকাব্য নয়, পুরাণ নয়, সর্বত্র, যেহেতু সামগ্রিকভাবে এ-এক নতুন ভুবন আমার কাছে—ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে, মানে—হয়তো তার গভীরতা, গহনতম-গভীরতা নয়, কিন্তু সেইসঙ্গে পেয়েছি মনের মতো ও উদ্দীপক এইসব-কিছু, এটা আমার বাঁচতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ॥ শেষ জটিল প্রশ্নটি, একজন পাঠকের দৃষ্টি থেকে, আপনার ভাষাপ্রয়োগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে করছি। এই পাঠকের কথা আপনি আগে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তার মনের উপর একধরণের চাপ দিতে আপনি দ্বিধাবোধ করেন না। নিজের উপন্যাসের জন্য যে-পাঠককে মনের ভিতর দেখেছেন, বোধহয় তার কথাই বলতে চেয়েছিলেন আপনি ?

উত্তর ॥ নিশ্চয়ই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিওলিট পাঠককুলকে আমি মনশ্চক্ষুতে দেখিনা—আপনি জানেন শব্দটা, ইদানীং ভারতবর্ষে, খুব-চালু—বাংলায় এখন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেগুলি সোজাসুজি নব্যশিক্ষিতদের জন্যই লেখা, সংক্ষিপ্ত শব্দভাণ্ডার এবং ছোটো-ছোটো বাক্য—ইত্যাদি নিয়ে। আমার আপত্তি নেই কোনো। কিন্তু এখন আপনাকে একটা কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার বলবো। একজন পাঠক, যিনি কোনো-এক অদ্ভুত কারণে আমার লেখার প্রতি তীব্রভাবে অনুরক্ত, কখনো তিনি স্কুলের অন্দরমহল দেখেননি, মেদিনীপুর জেলার জনৈক কৃষক তিনি, চাষ করেন নিজে, করেন এখনো ; ছোটবেলায় নিজের প্রচেষ্টাতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি কবিতা লেখেন, নামটা জানা থাকতে পারে : বিনোদ বেরা। এখন এ ব্যাপারটা শুধু লেখক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা নয়, পুরো লেখা জিনিসটার উপরই একটি নতুন আলো নিক্ষেপ করছে। আমরা নাগরজনেরা প্রায়ই, যারা স্কুলটুলে পড়েনি, নিচু ক'রে দেখি তাদের, তারা তা-নয়···কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের জনতা সম্বন্ধেই এটা আমি সবসময়ে অনুভব করি। যখন বিদেশে ছিলাম, প্রায়ই শুনতাম, আমরা একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিতের দেশ। তো, আমার জবাব ছিলো, নিরক্ষরের দেশ ঠিক, কিন্তু অশিক্ষিতের নয়। মুখে-মুখে এবং আরো অনেক···সেখানে, আমি মনে করি সংস্কৃতির স্তর এখানে কিঞ্চিৎ উঁচু। সে যাই হোক, আমার

লক্ষ্য সবসময়ে হলো, আদর্শ পাঠক, শ্রেষ্ঠ পাঠক। আর পাঠক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতাসমূহ—পুরো রবীন্দ্রনাথ আমি পড়েছি, অর্থাৎ, সেসময়ে যতটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তখন আমি খুব অল্পবয়স্ক ছিলাম, ছোট্ট একটি বালকমাত্র—অবশ্যই বুঝিনি সবকিছু, কিন্তু সেই পরম আনন্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি আমার মনে আছে, পরম-আনন্দ যা তিনি শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগের মাধ্যমে দিয়েছিলেন আমায়, অনেক শব্দ—যাদের আগে দেখিনি, অভিধান ছাড়াই সেসবের অর্থ আমি অনুভব করতে পারতাম ; বিষয়বস্তুর থেকে সোজা ছিলো এটা। এমনকি ইংরেজীর ক্ষেত্রেও কখনো-কখনো এমন হতো। তো আমি··· যদিও এটা ছিলো একটা বিদেশী ভাষা, কিন্তু খুব ছোটবেলায় আমি এটি শিখেছিলাম, আর জানেন, অর্থ টর্থও অনুমান করতে পারতাম বেশ। তাই আমি বলবো না, বলা সম্ভবও নয় যে দুরূহ স্টাইল পাঠকের পক্ষে একটা বাধা ; অবশ্যই তা আপনার জনতার সংখ্যাকে কমিয়ে দেবে, ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খারাপ, কিন্তু আমি নিজে বোধ করেছি যে, যন্ত্রণা পাওয়ারও একটা আনন্দ আছে। টোমাস মান সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা এখন আপনাকে বলবো। দুর্ঘটনাবশত ছোটবেলায় আমি তাঁকে খেয়াল করিনি—মানে বলতে চাই, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে—যদিও তাঁর 'যাদু-পর্বত' বহুআলোচিত ছিলো সেসময়েই। আমার একজন কবি-বন্ধু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নামটা আপনার জানা থাকতে পারে, একজন অপূর্ব কবি ও গদ্যলেখক। এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন, 'কী, আপনি টোমাস মান পড়েন নি ! নিশ্চয়ই পড়বেন, তাঁর মনটা জানা আপনার ভীষণ দরকার।' এবং তিনি আমায় তাঁর 'ডক্টর ফস্টাস'-এর কপিটা ধার দিলেন, তখন সদ্যসদ্য যেটা বেরিয়েছে। যদিও তখন আর আমি তরুণ নই··· চল্লিশের কাছাকাছি বা চল্লিশ পেরিয়ে গেছি—তবু অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে সেই উপন্যাস পড়তে গিয়ে কষ্ট হলো খুব ; কিন্তু যতই তা করলাম, যতই তাঁর বাক্যগুলোর সঙ্গে, তাঁর চিন্তার জটিলতাসমূহের সঙ্গে লড়াই করলাম, ধীরে ধীরে যতই উপলব্ধি করলাম তাঁর অপরূপ মাস্টার প্ল্যান, তাঁর সজ্জা··· একটি প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেখ করেন তিনি, সম্ভবত দশম অধ্যায়ে, তাতে আমরা ফিরে আসি ৫১তম অধ্যায়ে—এইরকম সব জিনিস, আমায় মুগ্ধ করেছিলো এটি। এবং আমি জানি, এর থেকে ও আগে আরো নানাকিছু থেকে···আর-একটি প্রাচীর হচ্ছেন মার্সেল প্রুস্ত, যৌবনে তাঁকে আমি চেষ্টা করেছিলাম, বহুবার, ব্যর্থ হয়েছি ; কিন্তু, জানেন, মাত্র পাঁচ বছর আগে ইংরেজীতে তাঁর বারো-ভল্যুম পড়লাম

সানন্দে, সোল্লাসে। তাই মনে হয়, এটা একটা খারাপ চিন্তা নয় যে, সর্বশ্রেষ্ঠের জন্য আপনি লিখুন এবং অপেক্ষা করুন, যতদিন না আপনার পাঠক—ক বা খ—যথেষ্ট পরিণত হয়! এটা কোনো বিবৃতি নয়···আশা করি কোনো অহংকারের গন্ধ নেই এতে, কিন্তু সবটুকু বলবো যে, দীর্ঘ ও জটিল বাক্য, নতুন শব্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে, কথকতার চালের সঙ্গে সংস্কৃতের চাল মেশানো সম্বন্ধে, আমার কোনোরকম দ্বিধা নেই। আমি মনে করি, যদি আমার একশ'-জন পাঠকও থাকে, কিছুকালের জন্য সেটা করা যায়।

প্রশ্ন ॥ বুদ্ধদেব, আজ এবং আগের দিন এ-প্রসঙ্গ আমরা বেশ কয়েকবার ছুঁয়ে গিয়েছি, তবু, 'মৌলিনাথের স্বপ্ন' কবিতাটির সঙ্গে অন্বয়সূত্রে, আপনার সাহিত্য-কৃতিতে গদ্য ও কবিতার সম্পর্ক-প্রসঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। উপন্যাসটি শেষ কর'র পর—মনে হয় ১৯৫২'এ প্রথম সংস্করণ—আপনি ১৯৬৫ সালে পুনর্বার বসেন—এবং এর একটি গদ্যাংশকে রূপ দেন কবিতার।

উত্তর ॥ মনে হচ্ছে, আমার স্টাইলের সাঙ্গীতিকতার বিষয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরেই এ বিষয়টা আমরা ছুঁয়ে গিয়েছিলাম। তবু, আবার বলছি, আমার গদ্যের মধ্যে একটা ছন্দ বজায় রাখতে সবসময়ে আমি চেষ্টা করি, চেষ্টা করি সে ছন্দ দুলিয়ে নিতে, যদি তেমন ক'রে বলা যায়, দুলিয়ে নিতে—চিন্তার প্রবাহ অনুসারে। তা, যখন গদ্যে ঐ-অংশটুকু লিখেছিলাম 'মৌলিনাথ'-এ, তখন খুব সচেতন ছিলাম তার কাব্য সম্ভাবনা সম্পর্কে; এমনকি গদ্যের মধ্যেও ছিলো লুকনো, গোপন, ধ্বনিসাম্য ও অর্ধমিত্রাক্ষর, দুটি বিপ্রতীপ ধ্বনির মধ্যে মৌখিক-স্বারসাম্য—এইসব। কবিতাটি আমি লিখেছিলাম, কিছুটা হয়তো মজার জন্য, বাকিটা—এটা হয়তো একটু আত্মসচেতনতার লক্ষণ—কবিতা ও গদ্যের ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনাকে স্পষ্ট প্রমাণ করতে। কবিতাটির কাব্যত্ব নিয়ে আমার কোনো দাবি নেই, কিন্তু অন্তত আপনার মতো একজন বিদগ্ধ কবির কাছে গদ্যাংশ এবং কবিতার তুলনার ব্যাপারটা এবং তাদের পার্থক্য আকর্ষণীয় ব'লে মনে হ'তে পারে। যে-পার্থক্য অনিবার্যভাবে প্রবেশ করেছে কাব্য সংস্করণে।

প্রশ্ন ॥ শেষ প্রসঙ্গ, আগের দিন আমি আনন্দ পেয়েছিলাম খুব, যখন এখানে, কলকাতার এই অংশে 'Hugo Von Hofmansthal'এর আর

একজন ভক্তকে দেখতে পেলাম। ইনি এমন একজন, যিনি Letter of Lord Chandos পড়েছেন—যা, আপনি জানেন, আমার দেশে একটা সাহিত্যিক ইতিহাস তৈরি করেছিলো। ভাবতে অবাক লাগে, কবি ও লেখক হিসাবে কখনো আপনি এই Chandos-সমস্যার মুখোমুখি এসেছেন, অর্থাৎ ভাষা-ব্যর্থ হওয়ার আচমকা উপলব্ধি; কিভাবে তাতে প্রতিক্রিয়া হবে আপনার। আর এর থেকে যদি এক ধাপ পিছিয়ে যেতে পারি, আপনার প্রদেশে থাকবার সময়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে, এমন এক সংস্কৃতির আমি মুখোমুখি হচ্ছি যা লেখককে একটা নির্দিষ্ট মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও প্রবলভাবে মৌখিক। এখন, লেখক জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে কি আপনি প্রশ্ন করেছেন নিজের পেশাকে, ভেবেছেন পেশা বর্জনের কথা—মানে, আগে যাকে বলছিলাম Chandos-সমস্যা, সেই সূত্রে?

উত্তর ॥ আমি মনে করি, প্রতিটি কবি বা লেখক তাঁর সাহিত্যজীবনের কোনো-না-কোনো পর্বে—যদি তিনি মোটামুটি দীর্ঘায়ু হন, যদি অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু না হয়—তবে Lord Chandos'এর সমস্যা অনুভব করবেন মনের গহনে। কিন্তু শেষ দিকে ঐ ভাষা, ঐ বাংলাভাষা—যাকে নিয়ে বসবাস করছি আমি গত পঞ্চাশ বছর বা আরও বেশি—আমাকে ভীষণ-কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে তার সঙ্গে। কখনো-কখনো বাংলাকে দোষ দিই তার অপর্যাপ্ততার জন্য, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে বলি, যা এতাবৎ ভাষায় নেই, তা তাকে দেওয়া—এ তো তোমারই কাজ। আসলে মনুষ্যভাষা তার চূড়ান্ত-পর্যায়ে এবং উচ্চতম জমিতে পৌঁছেও সবজাতীয় অনুভূতির মাত্রা, শ্রেষ্ঠ অনুভূতির মাত্রা-প্রকাশের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত রয়ে যায়। এবং তাই আদিম যুগের রহস্যমেদুর ধর্মাচরণে, হিন্দুধর্মেরও বিশেষ কয়েকটি প্রশাখায়, যেমন তন্ত্রবাদে, ঈশ্বরকে আবাহন করা হয় অর্থহীন উচ্চারণে, ডাইনি-প্রতিম হিং-টিং-ছটের সাহায্যে—বোধ্য শব্দের চেয়ে আরো শক্তিমান বিবেচিত হয় ছন্দ। লেখকের নিজের পেশা সম্বন্ধে অসন্তোষের এ-একটা কারণ। অন্যটি হচ্ছে—এটিও Lord Chandos'এর পত্রের অন্তর্ভুক্ত—জীবন ও শিল্পের মধ্যে ভীষণ অমোঘ সেই বৈষম্য। ইতিমধ্যেই আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। এই যে 'একজনকে কেন এত কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, লেখার জন্য লড়তে হবে কঠোরভাবে'—এ দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে নিহিত ছিলো বোদলেয়রের ভিতরে। একজন প্রেমিক হ'য়ে, স্বামী হ'য়ে, উপার্জক হ'য়ে কিংবা পিতা বা বন্ধু ইত্যাদি হিসাবে

বেঁচে থাকা কি আরো ভালো নয়? সুখী হওয়ার জন্য চেষ্টা করাই কি একজনের লক্ষ্য নয় জীবনের? লেখনকর্মটির মানে, আর যাই হোক. সুখ নয়। তাহ'লে আমার ক্ষেত্রে এ-প্রশ্নের জবাব, জানেন আপনি, একজন কবি এ সমস্ত প্রশ্নের যে জবাব দেন, অবশ্যই তা নির্ভর করে, প্রথমত তাঁর বিশেষ অবস্থার উপর, কিন্তু সবচেয়ে বেশি হলো তিনি কি ধরণের মানুষ তার উপর। এখন, আমি হচ্ছি এমন একটা লোক, অন্য কোনো কাজ যার দ্বারা হবে না, কোনো কাজই নয় একমাত্র বই লেখা ছাড়া—যদি এতেও ভালো হই—কিন্তু মনে হয়, একমাত্র ঐ জিনিসটিই আমি করতে পারি। ধরে নেওয়া যাক, আমার ভিতর এটাও প্রদত্ত, মিলটনের কথায় ধরা যাক যে, এ হলো পিতার পুত্রকে-প্রদত্ত একটি গুণ। প্রায়ই দারুণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, হ'য়ে পড়ি উত্যক্ত, কিন্তু সেইসঙ্গে এটা অনুভব করি যে, আমি পারবো না···মানে, জীবনের শেষদিন অবধি স্বাস্থ্য যদি আমার ভালো থাকে, কিছু না ক'রে, ডেস্কে বসে কিছু না ক'রে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তেমন হ'লে ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত। প্রথম কথা হলো, আমার সমস্ত স্নায়ু, গোটা শারীরিক অবস্থান সেই কাজটির সুরে বাঁধা; যাবতীয় অসুবিধা সত্ত্বেও আমি খুব ভালো থাকি, শান্তিতে থাকি এতে। এটা একটা জিনিস, আর কারোর জীবন-যাপনের উপার্জনের প্রশ্ন হলো অন্য একটি। আমার বই বিক্রী হয় না, আগে যা লিখেছি তার উপর নির্ভর ক'রে আমার চলতে পারে না দিন, তাই আমাকে··· বলবো, এটা হচ্ছে একটা দিক মাত্র, কিন্তু যদি অজস্র টাকা থাকতো আমার, তবু আমি বই লিখতাম; কারণ বিরত থাকতে আমি পারবো না, কিছুতেই না। আর গীতার কৃষ্ণের কথায় নিজেকে তাই বলি, এ আমার 'স্বধর্ম', গুরুতর অপরাধ একে বর্জন করা, এমনকি অপ্রচুরভাবে এ কাজ করাও অন্য লোকের নৈপুণ্যদীপ্ত কাজের চেয়ে ভালো।

১৯৭৩

মূল সাক্ষাৎকারটি ইংরেজিতে নেওয়া। বাংলায় তর্জমা করেছেন

শ্রীঅভিজিত দাশগুপ্ত

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্ত-র সাক্ষাৎকার

[জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল বার বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার নিই ১৯৭১-এর জুলাই মাসে, শেষ ফর্মাল সাক্ষাৎকার নিই ১৯৮২-র গোড়ায়। এ ছাড়াও মধ্যবর্তী সময়ে বহুবার সাধারণ ভাবে সাহিত্য নিয়ে ও বিশেষ করে তাঁর সাহিত্য নিয়ে অজস্র আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এই সমস্ত সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা থেকে প্রশ্ন ও উত্তর সংগ্রহ করে বর্তমান সাক্ষাৎকারটি সাজানো।]

—সাহিত্যমঞ্চে আপনার প্রবেশের পর বছর পঁয়তাল্লিশ কেটে গেছে। এই সময়টা চিন্তা করলে আপনার কী মনে হয় ?

—মনে হয় খুব বেশী দিন যেন আমি সাহিত্যচর্চা করছি না। পূর্বসূরীদের সাহিত্যে যথাযথ তৃপ্তি আমি পাই নি, যেন আরো কী দেবার রয়ে গেছে। তা দিতে হবে আমাদের, তাই আমার সাহিত্যমঞ্চে প্রবেশ। তারপর তো কত বছর কেটে গেল। যতটা ক্ষমতা ছিল সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি বোধ হয় আজও পাই নি। তাতে অবশ্য আমার কোন আফ্‌সোস নেই। যা দিয়ে গেছি বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল তার স্থান অক্ষুণ্ণ থাকবে, এতেই আমার সান্ত্বনা।

—আপনার গল্প ও উপন্যাস পড়ে মনে হয় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের নিয়ে লিখতে আপনি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

—হ্যাঁ, মধ্যবিত্তদের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। আর তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে উচ্চবিত্তদের নিয়ে যারা লেখেন, তাদের সৃষ্ট করা চরিত্র-গুলো তো মানসিকতার বিচারে ঐ মধ্যবিত্তই।

—সাহিত্যে আমার মনে হয় দ্রষ্টার ভূমিকাতেই আপনার বেশি উৎসাহ। কিন্তু 'খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'রাবণবধ', 'তারিণীর বাড়ি বদল'-য়ে একটা চাপা দর্শনবোধের পরিচয় স্পষ্ট। এটা কি ইচ্ছাকৃত ?

—ঠিকই বলেছ, ভূমিকা মূলতঃ দ্রষ্টার। যেগুলোর নাম করলে সেগুলো ছাড়াও 'বনের রাজা', 'সেই ভদ্রলোক'-য়ে অবশ্য আমার ভূমিকা দার্শনিকের। পরিশ্রম করে লিখি আমি, সেখানে যেমনটি সার্থকতম মনে হয় সেই ভূমিকা নিই।

—আপনার লেখার কোন্ গুণটা আপনার সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় ?

—আলাদাভাবে কোনটাই না।

—আমার ধারণা সংলাপ, পরিবেশ ও মানসিকতার ডিটেলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর আর মনোবিশ্লেষণে গভীর আগ্রহ আপনার সাহিত্যের দুটি প্রাথমিক গুণ।

—তা বলতে পার। ক্রমপরিণতির দিকে আমার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে। দুম্ করে কিছু বলে ফেলায় আমার মন ওঠে না। আমার মনে হয় এমনটি হওয়া উচিত, সুতরাং ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে দেখাই কীভাবে অমনটি হল। ঐ যা বলেছি, ক্রমপরিণতির দিকে ঝোঁক। চলতে চলতে বা বসে বসে এই বিশ্লেষণের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা আমার ধাতে নেই, লিখতে গিয়ে সহজভাবেই ওটা হয়ে যায়। আমার ৯০% লেখার শেষটা আমি আগে জানতাম না।

—মনস্তত্ত্বের কথায় বলা যায়, আপনার লেখায় নির্জনতা ও প্রকৃতির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। প্রেম ও যৌনতা আপনার সাহিত্যে অনেক সময়ে এই নিঃসঙ্গতা-বোধ ও প্রকৃতি থেকেই জন্ম নেয়। প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির এই সম্পর্কের ধারণাটা কতদূর সত্যি বলে মনে হয় ?

—হ্যাঁ, এটা ঠিক। আমার 'চাওয়া' গল্পেও তো তাই হয়েছে, যেমন 'প্রেমের চেয়ে বড়'তে। শাশ্বত কিছু আর কি! যেমন ধরো না, সাধারণতঃ রাত্রিতেই যে লিখি আমি—, সেই নির্জনতা, স্তব্ধতা, তার প্রভাব তো অস্বীকার করা যায় না।

—বাংলা একটা পরিভাষা প্রথমে বীতশোক ভট্টাচার্য আপনার লেখা সম্পর্কে ব্যবহার করেন, এখন আমিও করছি, তা হল : দ্বিধাসমতা—unity because of contrast or diversity, যেমন উইট ও সিনিসিজম, প্যাশন ও নিরাসক্তি, মানিকের বিজ্ঞানবোধ ও বিভূতির সৌন্দর্যচেতনা...আপনার লেখায় এগুলো এসে

মিলেছে। এই দ্বিধাসমতা আপনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কাজ করে। যেমন কামনার কাছে অসহায় মানুষের গল্প 'মঙ্গলগ্রহ', মানুষের কামনা-প্রবৃত্তির বিপরীতে নিবৃত্তি নিয়ে 'সামনে চামেলি।' 'ছিদ্র'-য়ের অসুস্থ মানস 'সোনার চাঁদ'-য়ে এসে সুস্থতায় প্রতিভাত: 'অসুখ হয়েছিল সেরে গেছি।' 'হিংসা'-য় অপ্রত্যাশিত হত্যা, 'বুনো ওল'-য়ে সম্ভাব্য হত্যা থেকে সরে আসা। 'ছিদ্র'-য়ে চরম অভাবে স্বামী স্ত্রী আত্মহত্যা করে মরে গেল, 'ক্ষুধা'-য় চূড়ান্ত প্রাচুর্য স্ত্রীর হাত দিয়ে স্বামীকে মেরে গেল। এর কোনটাই আকস্মিক নয়, জীবনের প্রতি আপনার প্রেম অপ্রেম, নারী প্রকৃতি, সময় স্মৃতি, আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব সন্ধি ও সমাসের একটা মোচড় দেওয়া, বাঁকিয়ে ধরা ভঙ্গিই আপনার শিল্পকৌশল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই দ্বিধাসমতা আপনার সাহিত্যকে উপাদানগতভাবে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে?

—পরিবেশ যতটা টেনে আনে। ইচ্ছে করে এটা করব ওটা করব না এরকম মন নিয়ে আমি লিখি না। যেমন ধরো 'শ্বেতপায়রা', গল্পটা আমি যে মন নিয়ে লিখেছি 'বাবার চোখ' ঠিক সেই মন নিয়ে তো আর লিখি নি। 'সেই ভদ্রলোক' বলে যে গল্প লিখেছিলাম সেই বছরই 'জীবন' গল্প লিখেছি। দেখলাম যে সেই ধরনের গল্প আমাকে টানছে। 'সেই ভদ্রলোক'-এর মত গল্পটা যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি গল্পে হাত দিই নি। আমি ভেবেছি ওই ধরনের একটা গল্প লেখার ইচ্ছে এসেছে আমার ব্রেনে, আমার বুদ্ধিতে, আমার বোধে, ঠিক পরের গল্পই হয়তো হয়ে গেল 'ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার,' আমার রুচি বিভিন্ন দিক চায়। আমার মেজাজ বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লেখার জন্য আঁকুপাকু করে। কখন কোন্‌টা লিখি কোন ঠিক নেই। এবং সে সম্পর্কে আমি সচেতন নই।

—আপনি নিজেই একবার বলেছিলেন, কী লিখব তা যেমন ভাবি, তেমনি কীভাবে লিখব তাও আমাকে ভাবতে হয়। এখানে আপনার আঙ্গিক-সচেতনতার প্রমাণ। আবার আপনি যখন বলেন, আঙ্গিক হবে নিঃশ্বাসের বাতাসের মত তখন বোঝা যায় আঙ্গিকসর্বস্বতায় আপনার বিশ্বাস নেই। ফলে আপনি সুষম আঙ্গিক যা বিষয়ের সঙ্গে যায় এবং বিষয়ের জন্যই যে আঙ্গিক আসা উচিত সেই আঙ্গিকে বিশ্বাস রাখছেন। সাধারণভাবে আপনার সাহিত্যে আঙ্গিকের সংজ্ঞা ও ধারণা বলতে কী বোঝেন সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

—সেটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাও যেটা সরাসরি বলা যায় আমি আঙ্গিকগত খুঁটিনাটির মাধ্যমে বলার কথা ভাবি। এ ব্যাপারে আসল হচ্ছে গল্পের অ্যাপ্রোচ। কী ভাবে গল্পটা আরম্ভ করব এবং তার সারা অঙ্গ কীরকম হবে,

সেখানে বর্ণনা বেশী থাকবে না সংলাপ বেশী থাকবে সে সম্পর্কে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়। এবং প্রত্যেকটারই দরকার। ধর 'ছিদ্র' গল্পে সংলাপ বেশী, সেখানে বর্ণনার দরকার হয় না, ওটা আপনা থেকেই এসে যায়। কিন্তু 'সামনে চামেলি' গল্পে বর্ণনার দরকার হয়ে পড়েছে। সে জন্য গল্পের সিচুয়েশন বুঝে, থিম বুঝে, চরিত্র সমঝে আঙ্গিক বাছতে হয়। এবং গল্পটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারপর কোথায় শেষ করব আমি সেটাকে আঙ্গিকের মধ্যেই ধরি, তার কারণ সেটা আঙ্গিকের একটা প্রধান অঙ্গ, সেটাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিই। পাঠকের হাতের মুঠোয় যাতে গল্প না চলে যায়, আবার কম্যুনিকেশন হবে না পাঠকের সঙ্গে তাও যেন না হয়, মোটামুটি একটা ইঙ্গিত যাতে থাকে এবং সেটা উইটি হওয়া চাই, এটা আমার লক্ষ্য। ব্যাপারটা যেন একটা ম্যাজিক খেলা, কোথায় গিয়ে শেষ করব সেটা পাঠকও বুঝবে না, সে জন্য পাঠক তৈরীও থাকবে না। সেটা যে একটা বিস্ময় একটা চমক তাও নয়। একটা মাত্রাবোধে, একটা ছন্দে, সমে এসে থেমে যাওয়া, তারপর যদি একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়, মনে হয় যে আঙ্গিকটা নষ্ট হয়ে গেল, আমি আঙ্গিককে এতটা গুরুত্ব দিই।

—তাহলে আঙ্গিক প্রসঙ্গে জরুরি হয়ে পড়ে ভাষারীতির কথা। ভাষাকে আমরা শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন, বাক্যসমূহকে সাজানো—এইভাবে ভাগ করে নিতে পারব—

—আমার কথা হচ্ছে শব্দ বসাবার ব্যাপারে যাতে যতটা সম্ভব হ্যাকনিড্ শব্দ বাদ থাকবে। খুব একটা পেরেন্টিজম্ থাকবে না। খুব কমন, খুব ফ্রী শব্দ যদি এসে যায়, আমি ফ্রী শব্দই দেব। আমি অনেককে দেখেছি গল্প লেখার সময় বিশেষভাবে সচেতন হয়ে যাচ্ছে। এমন শব্দ বসিয়ে দিল যেটা ভাবনার সঙ্গে মেলে না। আমি এ ব্যাপারে খুব বেশী সচেতন। একটা গেরস্থ মেয়ের চিন্তাধারায় আমি কোন সফিস্টিকেটেড শব্দ ব্যবহার করব না। ওই পরিস্থিতি শব্দ টেনে আনবে। আমার নিজের কোন ইচ্ছে থাকবে না। সেখানে আমি পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করব।

—ভাষারীতির পর্যালোচনা করলে মোটামুটি ভাবে আমরা দুটো ধরন দেখি—অনেকে সমগ্র ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কলাকৌশল সচেতন। আবার অনেকে ভাষার কলাকৌশলগত দিক ছাড়াও ভাষার আবেগগত, নান্দনিক দিকটার কথাও বিশেষ মনে রাখছেন, যেমন হেমিংওয়ে একবার বলেছিলেন, Sometime I make some technical deficiency in order to make it emotionally

more valid. আমার প্রশ্ন আপনার ভাষা কি ওই টেকনিক্যালিটিকে মেনে তৈরি হয় না অসাধারণ শিল্পবোধ থেকে লেখা আপনার ভাষা আপনা-আপনিই টেকনিক্যালিটি কর্তৃক সমর্থিত হয়ে পড়ে? অর্থাৎ একই সঙ্গে সুদক্ষ ও শিল্পিত ভাষা নির্মাণে আপনি ভাষার কৌশল ও ভাষার রহস্য কার উপর কেমন জোর দেন?

—আমি দুয়ের উপরেই জোর দিচ্ছি তবে আমি প্রথম ভাষার কৌশলটার উপর জোর দিই। ভাষার কৌশল ইমোশনের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে সেটা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে নিই, তার একটা গড় ভ্যালু বার করে মাঝামাঝি অবস্থায় আনি। তবে কোথাও কোথাও ভাষার রহস্যটাও বেশী জোর পেয়েছে, 'চশমখোর', 'ভয়' সেগুলো হল ভাষার রহস্যভিত্তিক। আজকাল আমি টেকনিক-টাকে আরও বেশি ফ্রী করতে চাই। যেন আলো বাতাসের মত চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। লেখক কিছু করে না। লেখকের কিছু করার নেই। আমি সেদিক থেকে এখন কিছুটা হেমিংওয়েপন্থী।

—ভাষার রহস্য প্রসঙ্গে বলা যায় আপনার ভাষা উপমাপ্রিয়। হিউমারের জন্য আপনি কখনো কখনো উপমা ব্যবহার করে থাকেন। সমান্তরাল, দ্বান্দ্বিক, সদৃশ ও আপাত বিসদৃশ ইমেজ ও আইডিয়া ইণ্টার-কানেক্ট করার কাজে আপনার গঠনও তুলনামূলক। এটা বাইরের দিক।

—দেখ, আমার লেখায় এখন উপমা কমেছে, আমি ইচ্ছে করেই কমিয়ে দিয়েছি! যেখানে আমি যথার্থ শব্দ দিয়ে অর্থ পরিষ্কার করতে পারি, সেখানে খামকা উপমা টেনে আনব কেন?

—আগেকার লেখায় আপনার এই উপমা নির্বাচনে আমরা শ্লেষ দেখতাম, এখনও আপনার লেখায় একটা শ্লেষ থাকছে। এটা কি আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার না আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন? আপনার লেখা সম্পর্কে আমি মনে করি তা কোথাও কোথাও একটু বেশি পরিমাণে তির্যক হয়েছে।

—ঠিক। ক্রমেই আমি সিনিক হচ্ছি। আগে যেমন প্যাশন হলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, রূপ দেখলে দিশেহারা হয়ে যেতাম এখন তা হয় না। এখন নেগেটিভের দিকে ঝোঁক এসে গিয়েছে। এবং ভবিষ্যতে হয়ত আমি এমন একটা উপন্যাস লিখব যে একটা লোক অনেক কিছু করেছে, অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু পেয়েছে। তা সত্ত্বেও তার মনে হয় কিছুই হল না। জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিনের ভূত এখন আমার মধ্যেও কাজ করছে।

—এটাকে অবশ্য নতুন বলব না। 'মঙ্গলগ্রহ' বা 'শালিক কি চড়ুই' গল্পেও এই শ্লেষ বিশেষভাবে দেখেছি। তবে আপনার আগের লেখা থেকে এখনকার লেখায় এর একটা মাত্রাগত তফাত আছে, আগেকার শ্লেষটা সদর্থকভাবে এনে ঋণাত্মকভাবে ব্যবহার করেছেন, এখন ঋণাত্মকভাবে ব্যবহার করলেও, শেষমেষ তার যে অভিঘাতটা পাই তা সদর্থক। এটা 'ভাত' গল্প থেকে শুরু হয়েছে, আমার ধারণা এটা অ্যাটিচুডের সদর্থকতা থেকে এসেছে।

—যদি তাই হয় তবে ত ভালই, It's a boon to me.

—যত দিন যাচ্ছে আপনার লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে প্রাণবস্তুতা। বর্ণের বদলে ধ্বনি, ধীর ও ধারাবাহিক নির্মাণের বদলে কল্পমূর্তিকে গতিময়তা দেওয়া, অ্যানিমেটেড কম্পোজিশন ইত্যাদি। যা আগে স্থান কাল ও ভাবের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসত তা এখন অন্যভাবে আসছে। এখনকার লেখার যে পার্থক্যের কথা আপনি বললেন এটা কি সেইসব পার্থক্যের অঙ্গ, না আপনা থেকেই এসেছে ?

—এসে যাচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতার দরুণ বয়সের দরুণ এসে যাচ্ছে। আমার মানসিকতা এভাবে লেখাচ্ছে! আমি চাইছি আমার লেখা যেন স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে যায়। একটা গল্প আগে যত সময় নিয়ে লিখতাম এখন তার চেয়ে কম সময়ে লিখি। তার কারণ আগে ভাষা বা বর্ণনার অলংকরণ আমার লেখায় ছিল, এখন আমার ঐ লেখা পড়ে মনে হয় আজ হলে গল্পটা অযথা ভারী করতাম না। এই ভার ভাষার দিক থেকেই বেশী, শব্দের ব্যবহারে উপমায় দৃষ্টান্তে। রূপ বাড়াবার জন্য, এখন মনে হয়, ওগুলো পোষাকের বাহুল্য। আমার খুব অনুশোচনা হয় আমি কেন ওসব লিখতে গেছিলাম।

—তার মানে আপনি বলছেন মোবিলিটি আপনার কাছে এসেছে সারল্য ও সহজতার প্রতীক হিশেবে। এই মোবিলিটির পাশাপাশি আমি আর একটা ব্যাপার দেখতে পাই, যাকে বলব ইনোসেন্স।

—Yes, right you are. আমি ঠিক শব্দটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তুমি ধরিয়ে দিলে। আমায় শিল্পীই বল আর লেখকই বল যত বয়স বাড়ছে ততই আমার মনে হচ্ছে লেখা যত সরলভাবে এগোন যায়, যত ডায়নামিক হয় ততই ভাল। ছোটগল্প যেন তাই হওয়া উচিত।

—রাসেলের অত্যন্ত ভারী প্রথম দিককার লেখার সঙ্গে শেষ দিককার লেখার যে মাত্রাগত ও গুণগত পার্থক্য আপনার এখনকার লেখায় সেটা দেখা যায়।

—বাঃ এটা তো তুমি ঠিক ধরেছ।

—যেন আর কোন আড়ম্বর, অলংকরণের প্রয়োজন নেই আপনার যা কেবল একজন মুক্ত লেখকই লিখতে পারেন। এই কি আপনার শিল্পের চরম পর্যায়?

—চরম পর্যায় বলতে তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটাই আমি চাইছি, চেয়েছি।

—অন্নদাশঙ্কর নিজের সাহিত্য জীবনে তাঁর ছেলের মৃত্যুর ঘটনাকে বিশেষ তাৎপর্যময় বলে মনে করেন। আপনার সাহিত্যজীবনে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে কি?

—তেমন কিছু নেই। কোন একক ঘটনাকে আমি তেমন প্রশ্রয় দিই না।

—শিশু ও কিশোরদের নিয়ে লেখার সময়ও আপনি বেশ প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে লেখেন। এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করলে ভালো হয়।

—সে আমি কী করে বলি? কখনো কখনো হয়েছে। 'রাবণবধ'-য়ে, 'অভিনয়'-য়ে একটু, 'কেষ্টনগরের পুতুল'-য়ে। আবার 'কৈশোর'-য়ে হয়নি, 'তুই শিশু'-তে হয় নি, হয় নি 'অবনী নিখোঁজ'-য়ে। এগুলির মানসিকতা, অনুভূতি ও আবেগের যন্ত্রণাবিদ্ধ ছেলেমানুষি কিশোর সুলভ। সহজ ভাষা, ছোট বা সরল বাক্য, স্মৃতি ও অভিমানের সরল চিত্রায়ন। সহজ সিদ্ধান্তে আসার ও দূর প্রতিতুলনা টানার প্রবণতা তো কৈশোরক। প্রেমের উল্লেখে বড়মানুষি কিছু নেই। শিশুদের কাছে প্রেম তো তাদের ঈশ্বর-উচ্চারণের মত, স্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য।

—বড়দের কাছে? আপনার নিজের কতটা বিশ্বাস ঈশ্বরে—আদৌ যদি থাকে?

—ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। পবিত্রতা ও ন্যায়বোধের প্রতীক হিসেবে কোন একটা চেতনায় আমার বিশ্বাস স্থাপিত। জীবনে জ্ঞাতসারে কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি সেই তৃপ্তিই আমার ট্রুথ।

—এবার শেষ প্রশ্নটি করা যাক। সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গ আপনার কেমন লাগে?

—ভালোই লাগে। বুদ্ধিমান মানুষ বুদ্ধি দেখাতে এলে ভালো লাগে না। প্রদর্শনপ্রিয়তা ভালো লাগে না। নিরপেক্ষ মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে।

১৯৮২

মোহিতলাল মজুমদার-এর সঙ্গে ড. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ-এর সাক্ষাৎকার

[আমার সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক মুখ্যত শিক্ষক-ছাত্র হিসেবে। তথাপি সাহিত্যপাগল মোহিতলাল আমার মত নগণ্য ছাত্রকে যে সাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে আমার নিকট লিখিত তাঁর চিঠিগুলিতে।

গৃহগত পরিবেশে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন তিনি যে তীব্র ভাষায় আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তা এখনও আমার মনে পড়ে। এ ভর্ৎসনার কারণ ছিল, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতির ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে ১৯৩৫ সালে ঢাকার একটি সাহিত্য সভায় আমার উচ্ছ্বসিত ভাষণ। আমার মত নগণ্য ছাত্রের সাহিত্যের রীতি বিষয়ক তুচ্ছ একটি মন্তব্য অপরের মুখে শুনে (মোহিতলাল সে-সাহিত্য সভায় উপস্থিত ছিলেন না) মোহিতলালের মত পণ্ডিত সাহিত্যিকের এ বিস্ফোরণ দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। তবু ভয়ে হোক, শ্রদ্ধায় হোক, সেদিন চুপ করে ছিলাম। এ নীরবতা তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করতে হয়ত সাহায্য করেছিল। রুদ্রমূর্তি শান্ত হলে মোহিতলাল গদ্যরীতির আদর্শ সম্পর্কে দুচার কথা বলে' আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার আহ্বান জানিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

এর পরে মোহিতলালের বাসার সাহিত্যিক আড্ডায় মাঝে মাঝে হাজিরা দিতে লাগলাম। কখন কিভাবে যে তাঁর উদার হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় লাভ করেছিলাম মনে নেই। তবে এটা বেশ মনে আছে আমার অপরিণত সাহিত্যজিজ্ঞাসার পরিচয় পেয়ে, তিনি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। শুধু

মাত্র ক্লাসে নয়, তাঁর বাড়ীর সাহিত্যিক আড্ডাতেও তিনি আমাকে সাহিত্যের রূপ, রীতি এবং চিরায়ত সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে অক্লান্ত উপদেশ দিতেন। একদিন—তোমাকে সাহিত্য বোধ বৃদ্ধির জন্য একখানি প্রেসক্রিপশান দিচ্ছি—বলে' তাঁর নিজস্ব প্যাডের উপর কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থের নামও লিখে দিলেন। তার মধ্যে, আমার যতদূর মনে পড়ে, ছিল মেয়ার-এর আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস, ম্যাথ্যু আর্ণল্ডএর Essays in Criticism, র‍্যালের Style, ওয়ালটার পেটার-এর Appreciations, এ্যারিষ্টটলের Poetics, এ্যবারক্রমবী-র Principles of Literary Criticism, টলস্টয়ের What is Art? মিডলটন মারীর Style প্রভৃতি।

কবি হিসেবে মোহিতলাল দেহাত্মবাদী, রোমান্টিক—যাই হোন না কেন, সাহিত্যের আদর্শ সন্ধানে এবং আদর্শ বিচারে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ক্লাসিকপন্থী। ভাবের দিক দিয়ে হোক, রূপের দিক থেকে হোক, যে-সাহিত্য চিরকালীন মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারে না সে-সাহিত্যের প্রতি মোহিতলালের কোন শ্রদ্ধা ছিল না।

নিচের কথাগুলি মোহিতলাল বহুদিন নানা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন। একত্র করে প্রকাশ করলে এই রকম দাঁড়ায়।]

ফর্ম ও ম্যাটার

ফর্ম ও ম্যাটার (Form & Matter) সাহিত্যের হরিহর-আত্মা। এ দুয়ের অঙ্গাঙ্গী মিলন না ঘটলে সাহিত্য কখনও কালজয়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ফর্ম বলতে শুধু সাহিত্যের বহিরঙ্গ নয়। ফর্ম সাহিত্যের শুধু বহিরাগত প্রকাশভঙ্গী নয়—ফর্ম সাহিত্যের দেহ—যে দেহকে অবলম্বন করে' সাহিত্যের ভাববস্তু বিকাশ লাভ করে। ফর্ম যদি বিকৃত হয়, কুৎসিৎ হয় তাহলে সাহিত্য সুন্দর হতে পারে না। ফর্মের ভেতর লেখকের ব্যক্তিত্বও প্রতিবিম্বিত হয়।

ফর্মেরই একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হলো স্টাইল। স্টাইলের মধ্যে শুধু ভঙ্গীর প্রাধান্য বা রচনার ঔজ্জল্যই থাকে না, স্টাইল লেখকের আত্মার দর্পণ। স্টাইল শুধুমাত্র ভঙ্গী নিয়ে চোখ ভোলায় না, পাঠকের আত্মাকে জাগ্রত করে নতুন বোধের রাজ্যে। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য স্টাইলের ভেতর সাহিত্যবিলাসীর লীলাখেলা আছে, লেখকের আত্মার অকৃত্রিম প্রতিফলন নেই। তাই সে স্টাইল মার্জিত, উজ্জ্বল, পাঠকের চোখ-ভোলানো একটি ভঙ্গীমাত্র—ড্রইং রুম সাজাবার

কাগজের ফুল। বুদ্ধদেব বসুর স্টাইলে আছে কাগজের ফুলের সৌন্দর্য—বাগানের ফুলের সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ততা নেই। তার স্টাইলে ব্যক্তিটিকে চেনা যায় না, ভঙ্গীটি সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে। তাঁর সাহিত্য যেমন অবসর-বিলাসী ডিলেটেণ্টের পাঠ্য, স্টাইলও তেমনি নকল ঝুটা মাল।

clarity বা স্বচ্ছতাই ভালো স্টাইলের মেরুদণ্ড। চিন্তা যেখানে অস্বচ্ছ, এলোমেলো—রচনাভঙ্গীতে সেখানে স্বচ্ছতা আসতে পারে না। বুদ্ধদেব বসুর মত লেখকদের জীবনে বাঙালী কালচারের কোন প্রভাব নেই, একটা মেকী hybrid কালচারের দ্বারা তাঁর মানসিকতা পুষ্ট। এ জন্য তাঁর রচনার স্টাইলেও স্বচ্ছতা নেই,—সে স্টাইল তাঁর hybrid culture-পুষ্ট চিন্তাধারার মত চমকপ্রদ।

বুদ্ধদেব বসুর স্টাইলের ঔজ্জ্বল্যের প্রশংসায় তুমি যে পঞ্চমুখ সে এই চমক দেখে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টাইলসম্পন্ন লেখক যাঁরা, তাঁদের রচনাভঙ্গীতে এ-চমক নেই, চিন্তাধারাও এত অস্বচ্ছ বা এলোমেলো নয়। সাহিত্যরাজ্যের বিশিষ্ট ক্লাসিক লেখকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হও, তাহলে তোমার এ মোহ কেটে যাবে।

গদ্যসাহিত্য

বাংলা গদ্যের সর্বোত্তম লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শুধুমাত্র বক্তব্যের যুক্তি-শৃঙ্খলার অনবদ্য উপস্থাপনায় নয়, জ্ঞান-চিন্তা-মনীষার বিস্তীর্ণ ও গভীর রাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে তাঁর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ নেই। এত বিচিত্র জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিপুণ সমাবেশ, অথচ বক্তব্য পাষাণভারের মত পাঠকের মনের ওপর চেপে বসে না। পাণ্ডিত্য আছে, অথচ পাণ্ডিত্য দেখাবার ভান নেই। আশ্চর্য রসসিক্ত স্বচ্ছ সে গদ্য। বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, তুলনারহিত।

তেমনি বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর গদ্য রচনায়। তাঁর উপন্যাসের গদ্যে কবি বঙ্কিম আত্মপ্রকাশ করেছেন, আর প্রবন্ধের গদ্যে নৈয়ায়িক বঙ্কিম। বঙ্কিমের প্রবন্ধ সাহিত্যের গদ্য আদর্শস্থানীয় গদ্য। এ যুগের হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্যভঙ্গীও উল্লেখ করার মত। আবার প্রমথ চৌধুরীর খপ্পরে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধুভাষায় রচিত গদ্য রচনাভঙ্গীর কৌলিন্য হারিয়ে ফেলেন। প্রমথ চৌধুরীর জীবনের মত তাঁর ভাষাও কালচার-বিলাসী। সে ভাষা বাঙালীর জীবনোদ্ভূত নয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর সব চাইতে বড় অপকীর্তি হলো তিনি একদল ভঙ্গীপ্রধান লেখক সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের গদ্যে যুক্তি, প্রাঞ্জলতা ও কবিদৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয়। সমসামযিক গদ্য লেখকদের মধ্যে

তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বাংলা দেশের মাটির গন্ধ আছে।

কবিদৃষ্টিই ঔপন্যাসিকের শিল্পসিদ্ধির চাবিকাঠি। বঙ্কিম উপন্যাস-জগতে যে চিরকালীন আসন লাভ করেছেন সে ওই কবিদৃষ্টির জন্য। [ঔপন্যাসিকের কবিদৃষ্টি বলতে কি বোঝায় মোহিতলাল স্পষ্ট কথায় তা বলেন নি। হয়তো তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর মনে তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। তবে বুঝতে পারতাম কল্পনা সমৃদ্ধির সাহায্যে অপূর্ব বস্তুনির্মাণের ক্ষমতা এবং তার ফলশ্রুতিতে চিরকালীন জীবনরস সৃষ্টির প্রতিভাকেই মোহিতলাল বলতে চাইতেন কবিদৃষ্টি। পরবর্তীকালে তাঁর সমালোচনা গ্রন্থে মোহিতলাল তাঁর পরমপ্রিয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে কবি-বঙ্কিম বলে অভিহিত করেছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের এই 'কবি-প্রতিভা'র (সৃষ্টি প্রতিভা) সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণে মোহিতলাল নিজেও যে কবিদৃষ্টির পরিচয় দিতেন তার বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' সম্পর্কীয় বক্তৃতায়। শরৎচন্দ্রের কবিদৃষ্টির কথাও মাঝে মাঝে বলতে শুনতাম তাঁকে। তিনি বলতেন, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সত্যিকারের জীবনদৃষ্টির পরিচয়ও ওই কবিদৃষ্টির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির তথা কবিদৃষ্টির মূল্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি পরবর্তীকালে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে।

শুধু ঔপন্যাসিকের পক্ষে নয়, সমালোচকের পক্ষেও এ কবিদৃষ্টির অপরিহার্যতার কথা বলতে শুনেছি মোহিতলালকে।]

সার্থক সমালোচনা

[বাংলা সাহিত্যে সার্থক সমালোচনা কর্মের জন্য মোহিতলাল তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিতেন।] প্রথম, ভারতীয় সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপকদের রচনায় যার অভাব বড় বেশী।

বঙ্কিম-উপন্যাস সমালোচনায় ভারতীয় সাধনার প্রয়োগ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য—প্রকৃতি-পুরুষ মতবাদ। ভারতীয় জীবন চিন্তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে পুরুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে পরম রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতি। প্রকৃতিপ্রভাবিত পুরুষ স্বভাবদুর্বল—অসহায়। তাই প্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণের মুখে পুরুষের সমস্ত প্রতিরোধশক্তি তীব্র গঙ্গাস্রোতে ঐরাবতের মতই ভেসে যায়। শেক্‌সপীয়রের নায়কদের ভাগ্যও প্রকৃতিপ্রভাবিত। এ কারণে তারা এত বেদনাসুন্দর—ট্র্যাজিক। বঙ্কিমও শেক্‌সপীয়রের মত একই কবিদৃষ্টি সম্পন্ন। এ কবিদৃষ্টির

প্রেরণার উৎসে ভারতীয় জীবন চিন্তার শক্তিময়ী প্রকৃতি।

তবু বাংলা সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের জন্য যেমন একদিকে ভারতীয় সাহিত্য-নীতির সঙ্গে পরিচয় দরকার তেমনি আর একদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-নীতির সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজনও অপরিহার্য। বাংলা সমালোচনার মান উন্নয়ন করতে হলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপরিহার্য। পূর্ববর্তী সমালোচকদের মধ্যে একজনের ওপর আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম, তিনি শশাঙ্কমোহন সেন। শশাঙ্কমোহনের সমালোচনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব আছে বলে' সে সমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। [বাংলা সমালোচনার অগভীরতা এবং পল্লবগ্রাহিতা দেখে তিনি নিরাশ হতেন। বাঙালী সমালোচকের মৌলিক চিন্তাশূন্যতা তাঁকে গভীর পীড়া দিত। তিনি সে-সমালোচনাকে বলতেন 'চোরাবাজার', আর ইংরেজী সাহিত্য ও সমালোচনাকে বলতেন—সমুদ্র।

একারণেই মোহিতলাল সমালোচকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিতেন খুব বেশী—যার নির্দেশ পেয়েছিলেন তিনি তাঁর সমালোচক গুরু ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের কাছে। মোহিতলাল প্রদর্শিত সমালোচনা সাহিত্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যও হলো এখানে।]

রবীন্দ্রকাব্য

'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশকাল—কি ভাবের দিক থেকে, কি রূপের দিক থেকে। কল্পনার বর্ণময় ঐশ্বর্য, শব্দ যোজনায়, ছন্দ ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়, সঙ্গীতে, ধ্বনিতে, ভঙ্গীতে উক্ত কাব্য পরম্পরায় তিনি যে-ভাব ও রূপলোক সৃষ্টি করেছেন তা বাংলার কাব্য গৌরবকে শত শত বৎসর এগিয়ে দিয়েছে। এরপর রবীন্দ্রকাব্যের ক্ষয়িষ্ণুতার কাল। মিলহীন গদ্যভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যক্রীড়া শুরু করলেন তা তাঁর পূর্ব কাব্য গৌরবকে ভূমিসাৎ করে দিলো। রবীন্দ্রনাথ কি-আর বেঁচে আছেন? তিনি তো মরে গেছেন। এখন বাঙলার শ্মশানের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রেত ধেই ধেই করে নৃত্য করছে। সে দৃপ্ততেজ স্বদেশপ্রেমিক ক্ষত্রিয় রবীন্দ্রনাথকে তো তোমরা দেখনি—যিনি উদ্দীপ্ত দেশাত্মবোধের চেতনাকে সবল সঙ্গীতে রূপ দিয়ে মহানগরীর রাজপথে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপ দেবার জন্য। পড়ে দেখো তাঁর এ সময়কার কাব্য, সঙ্গীত, প্রবন্ধ সাহিত্য—যা গভীর মননশীলতায়, হৃদয়ের উষ্ণতায়, প্রকাশের দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

'বলাকা'-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কবিচেতনা ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় দেখা যায় প্রথমত, প্রত্যক্ষ স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা অতিক্রম করে' রবীন্দ্রনাথ অপ্রত্যক্ষ ভাবসর্বস্ব বিশ্বচেতনায় মেতে উঠেছেন। কবির স্বদেশচেতনা আন্তরিক, আর বিশ্বচেতনা কল্পনানির্ভর একটা ভঙ্গী মাত্র [যাকে তিনি 'ভণ্ডামি' বলতেও দ্বিধা করেন নি]। দেশের মাটির সঙ্গে কবি কল্পনার নিগূঢ় যোগ ছিল বলে' কবির প্রথম জীবনের কাব্য-কবিতা এবং ছোটগল্প রূপে রসে ধ্বনিতে সঙ্গীতে এত উচ্ছল। কবি-কল্পনার সংহতি বিচিত্র ছন্দলীলার বন্ধনে অপরূপ রূপৈশ্বর্য লাভ করেছে। এ যুগের কাব্য ভাব ও রূপ সন্ধানী কবির হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে স্বতঃ উৎসারিত। তাই রূপ ও রসের সমন্বয়ে দুর্লভ মহিমায় ঐশ্বর্যবান।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনের কাব্য যে পরিমাণ সচেতন চিন্তা-মননের দ্বারা উদ্দীপ্ত সে পরিমাণ হৃদয়-অনুভবের দ্বারা নয়। অনুভূতি ও কল্পনার স্বতঃস্ফূর্তির অভাবে এ পর্যায়ের কাব্য মননশীল ভাবনাকে যে পরিমাণে জাগ্রত করে সে পরিমাণে হৃদয়কে আলোড়িত করে না। মননপ্রধান বলে' এ যুগের কাব্য ছন্দগৌরবকে অস্বীকার করেছে। কল্পনা স্বদেশের মাটি ছেড়ে ভাবলোকে উধাও হয়েছে বলে' এ যুগের কাব্যে পূর্বযুগের কাব্যের সংহতি নেই।

কাব্যে মননশীলতার প্রাধান্য (Intellectualism) হলো কাব্যের শিরঃপীড়া। যুক্তি তর্ক ও জ্ঞাননির্ভর মননশীলতা প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরব, কাব্যের নয়।

—জানো, এ যুগের সাহিত্যের সব চাইতে ক্ষতি করেছে কোন্ বস্তুটি?

প্রেসের সাহায্যে সুলভ মূল্যে বই ছাপবার সুযোগই এ যুগের সাহিত্যের অবনতির প্রধান কারণ। এ সুযোগ নিয়ে প্রতিভাহীন যশোলিপ্সু বহু লেখক মূল্যহীন বহু বই ছাপিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রকে আগাছায় ভরে তুললো। এর ফলে সাহিত্যের বাজারে উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ছে সাহিত্যের মান সে পরিমাণে অবনমিত হচ্ছে।...

তুমি গত শতাব্দীর কথাই ভেবে দেখো না। গত শতাব্দীতে এ শতাব্দীর মত মুদ্রণ যন্ত্রের এত প্রসার হয়নি। বই-এর উৎপাদনও এ শতাব্দীর মত এত বেশী হয়নি। গ্রন্থকারের সংখ্যাও এ যুগের মত এত বেশী ছিলনা। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত, কোন কৃতবিদ্য গুণী ব্যক্তি জ্ঞানের প্রসারের প্রয়োজন অনুভব করলে বই লিখবার জন্য কলম ধরতেন, কিংবা কোন বক্তব্য প্রকাশের তাগিদ অনুভব করলে গ্রন্থ প্রকাশে মনোযোগী হতেন। ফলে বিগত শতাব্দীর বহু গ্রন্থ এ যুগের পাঠকের কাছে যেমন মূল্যবান বিবেচিত হয়, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছেও তেমনি

মূল্যবান বিবেচিত হবে। এ সমস্ত গ্রন্থ সাহিত্য-জগতে ক্লাসিক। লোক-ভোলানো মূল্যহীন চটকদার বই-ও সে যুগে রচিত না হতো তা নয়, এ পর্যায়ের বই পরিচিত হতো বটতলার সাহিত্য বলে। কিন্তু এ যুগের অশিক্ষিত-পটু অনেক লেখক কোন প্রকার বক্তব্যবর্জিত যে ভূরিপরিমাণ বই লিখে চলেছেন সেগুলিকে কী বলা যাবে? বটতলার সাহিত্য? না সাহিত্যের আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা? দেখে নিও, সাহিত্যের জমা-খরচের ইতিহাসে এ সমস্ত ভাবনা-চিন্তাহীন বক্তব্যবর্জিত বই খরচের খাতায় লেখা হবে, স্থায়িত্ব অর্জন করবে না। আর এ সমস্ত আবর্জনা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে এ যুগের সুলভ মুদ্রণ যন্ত্র।

—প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানির অভিনবত্ব নিয়ে সমকালীন সাহিত্য-জগতে হৈ-হৈ ব্যাপার চলছে। সাহিত্যের দিক্‌পাল রবীন্দ্রনাথও বইখানির উৎকর্ষ সম্পর্কে ভালো সার্টিফিকেট দিয়েছেন। বাস্তব ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে চটকদার রোমান্টিক কাহিনীর ভিয়েন দিয়ে লেখক আমার মত সাধারণ পাঠকের হৃদয় লুঠ করে নিয়েছেন। এই জনপ্রিয় বইখানি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

তোমার সাহিত্যবোধ এখনও কাঁচা। তাই এ যুগের ভঙ্গীপ্রধান লেখকদের চটকদার রচনাকে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি বলে ভুল করছ। প্রবোধ সান্যাল সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে একজন চটকদার ব্যবসায়ীমনোভাবাপন্ন লেখক। ওঁর লেখায় হয়ত ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু চিরন্তনতার দাবী করতে পারার মতো মালমসলা নেই। যে সৃষ্টিশীল কল্পনা (Creative Imagination) চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক সে কল্পনা ওঁর নেই। যে কল্পনার সাহায্যে তিনি বইখানিতে তরল রোমান্টিক ভাবাপন্ন লোকরঞ্জন কাহিনী রচনা করেছেন তাকে বেশী হলে তুমি বলতে পার Fancy বা খেয়ালী কল্পনা। এ কল্পনার উৎসে থাকে নেহাৎ ব্যবসায়িক মনোভাব, খুবই সূক্ষ্ম উপায়ে অপরিণত পাঠকের যৌনচেতনাকে জাগিয়ে তুলে বই-এর কাটতি বৃদ্ধি। কোন রকম অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ এ ধরনের শিল্পকর্মে নেই, মানবাত্মার গভীরতম আলোড়ন উপলব্ধি করা যায় না এ পর্যায়ের রচনায়। শুধু প্রবোধ সান্যালের রচনায় নয়, এ যুগের অধিকাংশ জনপ্রিয় লেখকের রচনায় সেই একই সৃষ্টিশীল কল্পনার অভাব, অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির অপ্রতুলতা, খেয়ালী কল্পনা ও ব্যবসায়িক মনোভাবের প্রাধান্য। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য Decadent সাহিত্যের লক্ষণ। শুধু প্রবোধ সান্যালের রচনায় নয়, এ যুগের অধিকাংশ তথা-কথিত সৃষ্টিধর্মী রচনায় এ decadence-এর চিহ্ন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—Decadent Art বলতে আপনি কী বোঝেন? আধুনিক সৃষ্টিধর্মী রচনাকে

আপনি Decadent Art বলছেন কেন, বুঝিয়ে বলুন।

সমকালীন অধিকাংশ রচনাকে আমি decadence-এর লক্ষণাক্রান্ত বলছি কয়েকটি কারণে: প্রথমত, এঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা মৌলিক বা আন্তরিক নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণাত্মক। দ্বিতীয়ত, এঁদের রচনায় ভঙ্গী-প্রাধান্য যত বেশী বিষয় প্রাধান্য সে তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য; এঁদের সাহিত্য জীবনের উপরিতল-বিহারী, জীবন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার অভিপ্রায় বা সামর্থ্য এঁদের নেই।—উচ্চতর জীবননীতির দিকে সমকালীন সাহিত্য আকর্ষণ করে না, জীবনের স্থূল দিক উদঘাটনের দিকেই এ যুগের সাহিত্যিক বেশী মনোযোগী। এক কথায় সমকালীন সাহিত্য ভারসাম্যহীন—আকর্ষণীয় ভঙ্গীসৃষ্টির দিকে অধিকতর জোর দিতে গিয়ে বিষয়গুরুত্ব হারিয়েছে। এ decadence শুধু মাত্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করে' সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে জীর্ণ করে দিয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অকৃত্রিম অন্তঃপ্রেরণার অভাব নয়, অশুচি আবেগ, অস্পষ্টতা, হেঁয়ালি এবং দুর্বোধ্যতাও বাংলা কবিতাকে ক্ষয়িষ্ণুতার প্রান্ত সীমায় এনে উপস্থিত করেছে।

যেহেতু আধুনিক শিল্প সর্বজনীন আবেদনহীন এবং 'এলিট' গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ সে কারণে এই শিল্পরূপ সারল্যহীন, জটিল, কৃত্রিম এবং হেঁয়ালিপূর্ণ অস্পষ্ট। অথচ পূর্বযুগে দেখতে পাচ্ছি, লেখক শুধুমাত্র নিজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য কলম ধরছেন, এবং সে বক্তব্যকে সর্বজনবোধগম্য রূপ দেওয়াই ছিল তার চরম ও পরম লক্ষ্য! গ্রীক শিল্পীরা, য়িহুদী ধর্মপ্রবক্তারা এবং আমাদের দেশের পুরাণকারেরা অকৃত্রিম আবেগ এবং মহোত্তম মানবাদর্শের প্রেরণায় যে শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন তার আবেদন এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অগণিত মানবগোষ্ঠির মধ্যে সজীব। তাঁদের রচনায় আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু শিল্পীদের মত উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার-বাহুল্য নেই, কথায় কথায় তাঁরা এ যুগের লেখকদের মত পুরাণ বা ইতিহাস থেকে পরোক্ষ উক্তি (allusion) সংযোজন করেননি, শুধুমাত্র অন্তরের অকৃত্রিম আবেগকে প্রাণের ভাষায় তাঁরা রূপ দিয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁদের শিল্প সৃষ্টি ছিল সূর্যালোকের মতই স্বচ্ছ, সমাজের সকল স্তরের মানুষের অন্তরকে সে যুগে যেমন আলোকিত করতো এখনও তেমনি করছে। আর এ যুগে কী দেখছ? এক শ্রেণীর কালচার-বিলাসী, অকৃত্রিম আবেগহীন মানুষ নির্দিষ্ট গোষ্ঠিবদ্ধ একশ্রেণীর মানুষের জন্য শিল্প সৃষ্টির নামে যা সৃষ্টি করছেন তা শুধু ধোঁয়াটে, রহস্যময় এবং অস্পষ্ট নয়, তা যাথার্থ্যহীন, অনির্দিষ্ট, এবং স্বতঃস্ফূর্ততাহীন—কষ্টকল্পিত। অথচ

মজার কথা, এ ধরণের রচনাই এখন উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এ সমস্ত প্রবণতা শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যকে নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরিয়ে দিয়ে সে সাহিত্যকে পূর্বঐতিহ্য বিচ্যুত করেছে।

—কাব্য-কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবি রবীন্দ্র-ঐতিহ্য অতিক্রম করে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে উঠেছেন। ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী—সমস্ত দিক থেকে বাংলা কবিতাকে ঢেলে সাজাবার প্রয়াস চল্‌ছে। ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘোষণা, অভিনব অলংকার প্রয়োগ, কাব্য-ভাষাকে গদ্যধর্মী করে তুলে রোমান্সবিরোধী জীবন ঘনিষ্ঠ করবার প্রয়াস, উদ্ভট অলংকার প্রয়োগ, স্বচ্ছ ভাবসৃষ্টির পরিবর্তে অস্পষ্ট, হেঁয়ালিপূর্ণ ধোঁয়াটে ভাবের সৃষ্টি—এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই নতুন বিদ্রোহী কবিতার স্মারকচিহ্ন। 'এলিট' পাঠকশ্রেণীর মধ্যে এ পর্যায়ের কবিতা নব যুগের পরিচয়বাহী বলে মনে করা হচ্ছে। যাঁদের মন এখনও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যপুষ্ট তাঁরা বিভ্রান্ত। সে বিভ্রান্তি আমারও মনে। অভিনবত্ব সৃষ্টি প্রয়াসী এ নতুন কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগ, সুর ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি—প্রভৃতি সব দিক থেকেই অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার আনন্দে মেতেছিলেন এ আধুনিক যুগেই বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেহেতু তাঁদের নব সৃষ্টির প্রেরণা ছিল মৌলিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সে-কারণে তাঁদের নতুন পরীক্ষার ফসলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিত হতে, সে কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পাঠকের খুব বেশী দেরী হয়নি। অভিনবত্বসৃষ্টি প্রয়াসী সমকালীন কবিসমাজের কাব্যকবিতা পড়তে গিয়ে যে আধুনিক পাঠক পদে পদে হোঁচট খাচ্ছেন তার প্রধান কারণ: (১) এ পর্যায়ের কবিতার প্রেরণার উৎসে কবির অনুভূতিশীল অন্তর নয়, কবির বুদ্ধিবৃত্তি (২) কল্পনা স্বতোৎসারিত নয়, কষ্টকল্পিত (৩) কবিতার বহিরঙ্গের চমৎকৃতি সৃষ্টিতে এঁরা যতটা তৎপর অন্তরঙ্গে রসসৃষ্টিতে ততটা উদাসীন (৪) শব্দ ও উদ্ভট অলংকার-নির্ভরতাই এঁদের কবি-প্রয়াসের মুখ্য পরিচয় (৫) ছন্দ ও সুরের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন কাব্যপ্রিয় পাঠক অন্তরে দোলা দেয় তা বর্জন করে কাব্য রচনার বাহন হিসেবে গদ্যের আদর্শ গ্রহণ (৬) সর্বোপরি, পাশ্চাত্ত্য, বিশেষ করে আধুনিক ফরাসী কাব্যাদর্শের অন্ধ অনুকরণ।

যেহেতু আধুনিক ফরাসী কবি বদলেয়ার (Baudelaire) তাঁর কাব্যজগৎ থেকে বাক্‌বিভূতি (eloquence), স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং সত্যের যথাযথ মূর্তি

প্রতিষ্ঠা বর্জন করেছেন, সে কারণে আমাদের কাব্যজগৎ থেকেও সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে হবে এবং কবিতায় অভিব্যক্ত কবির বক্তব্যকে অনুমান করে নিতে হবে; কিংবা ভেরলেইন (Varlaine) যখন প্রচলিত কবিতার সুর, ধ্বনি ও সঙ্গীত মাধুর্যের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ হেনে বলেন:

Music, music before all things
The eccentric still prefer,
Vague in air, and nothing weighty,
Soluble·········
Dearest are grey songs where mingle
The defined and undefined.

তখন এ মতবাদ তাঁদের নিকট বেদবাক্য হয়ে ওঠে; কিংবা তরুণতর কবি মালার্মে (Mallarmé) যখন বলেন, কবিতার অর্থ অনুমান করে নেবার মধ্যেই নিহিত কবিতার যথার্থ মাধুর্য,—কবিতা হবে সব সময় ধাঁধাঁ জাতীয় বস্তু—তখন কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এ স্বেচ্ছাবিহারের আনন্দে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। শুধুমাত্র ফরাসী দেশেই যে কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে এ অস্পষ্টতা একটা মতবাদে উন্নীত হয়েছিল তা নয়—তা সংক্রামিত করেছিল জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, ইতালীয়, রুমা এবং ইংরেজী কাব্যকেও। একমাত্র কবিরাই এ অস্পষ্টতার মতবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন হননি, এ যুগের চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পীরাও সমানভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। শিল্পরাজ্যের কালাপাহাড়েরা উৎকেন্দ্রিক উত্তেজনায় যেমন স্বেচ্ছাচারে মেতে উঠেছিলেন, সে উৎকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক ডুমিক (Doumic)। তিনি বলেছিলেন: 'It were time also to have done with this famous 'theory of obscurity,' which the new school has, practically raised to the height of a dogma.'। কিন্তু এ অন্ধ অনুকরণকারী আধুনিক বাঙালী কবি সমাজ এ সাবধান-বাণী শুনবে কেন? বাঁধনছেঁড়া লীলায় মেতে উঠে হাজার বছরের কাব্য ঐতিহ্যকে এরা ধূলিসাৎ করে দিলো—

—আমাদের নাট্যজগৎ অনুর্বর কেন?

দ্যাখো, নাট্যশিল্প সাহিত্যের সব বিভাগের চাইতে কঠিনতম শিল্প, যেহেতু কল্পনার objectivity-ই হলো এ শিল্পসৃষ্টির সব চাইতে বড় হাতিয়ার। বাঙালী সাহিত্যশিল্পীরা মুখ্যত আত্মমুখী ভাব-কল্পনায় বিভোর। তাদের পক্ষে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টির অধিকারী হওয়া খুবই শক্ত। এ কারণেই এ যুগে নাট্য-সাহিত্য বন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। তবু এ যুগে দু' একটি সার্থক নাটক যে রচিত না হচ্ছে তা নয়—যেমন রবি মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল'।

১৯৩৬—৩৭

গোপাল হালদার-এর সঙ্গে বীতশোক ভট্টাচার্য-র সাক্ষাৎকার

১. আপনি গদ্য লেখেন কেন?

গদ্যের সব চেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে সর্বার্থসিদ্ধি। গদ্য মেড অফ অল ওঅর্কস্। লিটারেচর অফ পাওয়ার আর লিটারেচর অফ নলেজ দুটোই গদ্যে হতে পারে। যখন আমাদের দেশে গদ্য ছিল না তখন কবিতাতেই কাজ চলতো। তবু পদ্য একটা কৃত্রিম ভাষা। আর ইনফরমেশনের কাজটা গদ্যই করে। গদ্য প্রয়োজন-সিদ্ধির ভাষা, জ্ঞানের ভাষা, সাধারণ তর্কবিতর্কের ভাষা। আর রসসাহিত্যেরও ভাষা। উপযুক্ত লোকের হাতে পড়লে গদ্য কতো কিছু করতে পারে। তবে যোগ্যতার উপর সব নির্ভর করছে।

২. রচনায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ আপনার কেন দরকারি মনে হয়?

একেবারে আলাদা ক'রে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণের কথা না বললেও চলে। একসময় তো সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ ছিল না, তখনো সমাজ ছিল, সাহিত্য ছিল। সমাজ ও ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রাকে বুঝবার জন্য এখন এ দৃষ্টিকোণ দরকার হয়েছে। অন্তত ডেমোক্র্যাটিক একটা মনোভাব—মানসিক ঔদার্যটুকু অন্তত দরকার। রবীন্দ্রনাথের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তাঁর মতো মানসিক ঔদার্য আর কার?

৩. সাহিত্যের ইতিহাস না ইতিহাসের সাহিত্য—আপনার বিবেচনায় কোনটি সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শ পথ?

হঠাৎ কোনো কিছু জন্মায় না। সব কিছুর একটা ধারাবাহিক বিবর্তন আছে। সেই গ্রোথ সেই ডিকে-র ধারাতে ইতিহাস তৈরি হয়। সাহিত্য সেই ধারা থেকে আলাদা নয়। সেখানেও একজনের পর একজন আসে। সেটা অস্বীকার করলে সাহিত্যের ইতিহাস হয় না। মধুসূদন না এলে আধুনিক কবিতা হতো না। আমাদের কাশীরাম দাসেই ঠেকে যেতে হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় চোখের বালি কল্পনা করা যেতো না। আবার রবীন্দ্রনাথই একখানে বলেছিলেন, সাহস করিতে পারি নাই। কারণটা ঐতিহাসিক।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় কিরকম ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেছে ব'লে আপনার মনে হয়?

ফাঁক থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের হাতে তথ্য এতো কম। একমাত্র চর্যাপদ, তাও কতোদিন বাদে পাওয়া গেলো! তারও কতো পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—তারও সময়ের নিশ্চয়তা নেই। আমরা ইতিহাস রাখি না, এটা আমাদের জাতির স্বভাবগত ত্রুটি। আর ফাঁকিটা হলো ইতিহাসলেখকের ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, কোথাও বা কাস্টগত। তবে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ সাহিত্যের অন্য ঐতিহাসিকরাও সম্প্রতি নিচ্ছেন। আমাদের মতো অত স্পষ্টভাবে না হ'লেও নিচ্ছেন। নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সমাজ ও ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখার শিক্ষা পূর্ব থেকে না থাকায় তাঁদের কাজ অসম্পূর্ণ হচ্ছে। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য হলো। উঁচুতলার মানুষরা আগে যে এসব শুনতেন না তা নয়। তবে লিখতে হলে তাঁরা সংস্কৃতেই লিখতেন। এমন সময় তুর্কি আক্রমণ হলো। তাঁরা দেখলেন তাঁরাও নিচে নেমে এসেছেন। তখন মঙ্গলকাব্য হ'য়ে উঠলো সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহিত্য। আত্মরক্ষার সাহিত্যও বলা যায়। সেখানে রিকগনিশন শুধু মনসার চণ্ডীর এসব দেবতার নয়, রিকগনিশন নিচু শ্রেণীরও। ব্যাধ কালকেতুও তখন হিরো। এটা আমরা প্রথমের দিকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম।

৫. যাঁরা এখন ভাষাতত্ত্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞানের দিকে একান্ত ঝুঁকেছেন ব'লে দাবি করছেন তাঁদের সে দাবি আপনার কতোদূর সঙ্গত মনে হয়?

ভাষাতত্ত্বের মতো ভাষাবিজ্ঞানেরও আলাদা চর্চা আমাদের দেশে হোক, আমি এটা চাই। আপাতত কিছুদিন এ-ধরণের আলোচনা খুব একান্তভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু লাফালাফি করলে হবে না, যোগ্য লোকের হাত দেওয়া চাই। সুনীতিবাবু তো এদের কাছে বারবার জানতে চেয়েছেন, আপনারা নতুন কী বলতে চান বলুন, ক্লাস নিন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ এগোতো না। এক পবিত্রবাবু

ছাড়া আর কারোর লেখায় তো নতুন ধারার তেমন চিহ্নও দেখি না। সুনীতিবাবু বলেছিলেন, দেখুন, এখন সব কিছুতেই তো অ্যালিয়েনেশন, বিচ্ছিন্নতা, তা এদের এসব কাজ হলো অ্যালিয়েনেশন অ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন ল্যাংগুয়েজ। কথাটা আমিও বলি। ভাষা তো আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জেনারেটিভ গ্রামারের আলোচনা কেউ করতে চাইলে করতে পারেন, কিন্তু তার সঙ্গে ডেসক্রিপটিভ আর কমপারেটিভ গ্রামারও এসে যায়। আমি যে ডায়ালেকটিকাল, না, ডায়ালেক্টাল গ্রামারের চর্চা করেছি তা ডেসক্রিপটিভ, কিন্তু মনে হয়েছে এই উপভাষায় কী আছে, ওই উপভাষায় কী আছে, ফলে কমপারেটিভ ব্যাপারটা এসে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পুরোনো আর নতুন দুটো শাখার পরিপূরক, হ্যাঁ পরিপূরকই বলা যায়, পরিপূরক অস্তিত্ব প্রয়োজন। ভালো কাজ পুরোনো ধারাতেও হয়, পরেশবাবু তার প্রমাণ। অবশ্য পরেশবাবুর ক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু তাঁর কাজ তো পুরোনো ধারাতেই।

৬. উপভাষাচর্চা, আঞ্চলিক অভিধান রচনা—এসব ব্যাপারে আমাদের সার্বিক ঔদাসীন্যের মূল কোথায় ব'লে আপনি মনে করেন ?

ঔদাসীন্য যদি বলেন তবে তার উৎস বলা যায় ব্যক্তিগত স্বার্থে, অহমিকা-বোধে। আঞ্চলিক অভিধানের জন্য সুনীতিবাবু টাকাও যোগাড় করেছিলেন, সুকুমারবাবুকে বললেন। আর সুকুমারবাবু বললেন, টিম কী হবে, ও আমি একাই ক'রে দেবো। ডিসিপ্লিনের অভাবও একটা কারণ। কামিনীকুমারের কাজে এই ডিসিপ্লিনের অভাব। সুনীতিকুমার, আবদুল হাই এঁদের পর আমাদের ফোনেটিক্সের লোকও তেমন নেই। তাও সুনীতিবাবু ফোনেটিক্সের দিকে তেমন নজর দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কিছু কাজ হচ্ছে। আঞ্চলিক প্রতিশব্দগুলো পাশাপাশি বসানো একটা মেথড হতে পারে। এটা একটামাত্র মেথড, অন্যগুলোও দরকারি। ঢাকার শব্দকোষ দেখেছেন ? ভালো। শহীদুল্লাহ ছিলেন, অর্থ ও লোকবল ছিল—এগুলোও দরকার। তবু ওটাই আঞ্চলিক অভিধানের চূড়ান্ত আদর্শ বলবো না। গ্রিয়রসন করেছিলেন বিহারের পেজান্ট লাইফ নিয়ে কতো বড়ো কাজ। সরকার আর য়ুনিভারসিটিগুলো একটা কাজ অবশ্য করতে পারেন। লোকভাষা আর ফোকসংগুলো টেপ ক'রে রাখতে পারেন। তাহলে অন্তত কিছু উপাদান তৈরি হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাও তো হচ্ছে না।

৭. গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে অধিকারী ভেদ থাকা প্রয়োজন, আপনি একথা মনে করেন কেন ?

যোগ্যতা থাকা দরকার। অধিকার থাকা চাই। পরিশ্রমও করা দরকার। এখন তো বাংলায় রচনাবলি সম্পাদনা হয় না, পুনর্মুদ্রণ হয় মাত্র। তাই রচনাবলির ঠিক সম্পাদনাও হয় না। ইনসিস্ট করলেও নিরক্ষরতা প্রুফ দেয় না। এসব এডিটিং ট্রানস্লেশন এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত। হয় না ব'লে পি এইচ. ডি-র রেফারেন্সেও কবেকার এডিশন, কোন ডেট, কোনো কিছুরই ঠিক ঠিকানা থাকে না।

৮. আপনার গদ্যরীতি কী বিশেষ শিল্পায়াসের ফল, না উনিশ শতকের সাধারণ উত্তরাধিকার?

গদ্যরীতি তৈরি করার আলাদা সময় পাই নি। তাড়াতাড়ি লিখতে হয়েছে। রসরচনাও কিছু লিখি নি যে তা নয়। স্বপ্ন ও সত্য, পরে সেটাই বাজে লেখা নামে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে একটা আলাদা লিখন রীতির প্রয়োজন ছিল। বনচাঁড়ালের কড়চা এরকম রচনা। তাও নোটের মতন লেখা। এভাবে পাবলিশড্ হোক এ আমি চাই নি। কিন্তু জ্ঞানের ভাষা আলাদা। তার জন্য পণ্ডিতকেও সমতলে নেমে আসতে হয়। ফরাসি ভাষায়, টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরির ইংরেজিতে সে স্বচ্ছতা, সে পরিচ্ছন্নতা আছে। তার জন্য ভাষার প্রস্তুতি চাই। ফরাসিদের মতো আলাদা কালচার চাই। শান্তিনিকেতনে আমি তাই বলেছিলাম ক্ল্যারিটি ফার্স্ট, ক্ল্যারিটি সেকেণ্ড, ক্ল্যারিটি লাস্ট। বাংলায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রীতি আমার মনঃপূত। তাতে একটু বেশি বলতে হয় বটে, কিন্তু সেটুকু সাধারণ পাঠকের জন্য দরকারি। বঙ্কিমচন্দ্রের নিবন্ধের ভাষাতেও সে স্বচ্ছতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখকদের জন্য কিছু উপদেশ আছে, পড়েছেন? সরলতার কথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সেটা বুঝেছিলেন। তারপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা বলতে হয়। আপনি ক্ষেত্রমোহনের কথা বলছেন। দুজনে এক কলেজে ছিলেন, ঠিক বলা যায় না, তবে শুনেছি ক্ষেত্রমোহনের লেখায় রামেন্দ্রসুন্দরের হাত ছিল। সুনীতিবাবুর এ ধরণের কথা শুনতে খুবই ভালো, লেখায় এসব পড়তে গেলে কষ্ট হয়, এত দীর্ঘ পেরেনথিসিস দেওয়া বাক্য। ধূর্জটিপ্রসাদও একসময় আমার ভালো লাগতো, স্পষ্টতার জন্য, কথাগুলো শেষের দিকে উনি বাঁকিয়ে দিতেন। নতুনদের মধ্যে অনেকের গদ্যরীতি খুব ভালো। তবে সাম্প্রতিকদের মধ্যে অর্থবহ জ্ঞানের ভাষা তৈরি ক'রে দিয়েছেন কে জানেন: রাজশেখর বসু। ব্যক্তিগতভাবে আমি চলতি শব্দ যতটা পারা যায় ব্যবহার করি, সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দও অবশ্য ব্যবহার করতে হয়, না করলে চলে না।

৯. কী ধরণের প্রভাব বা মানসিকতা আপনাকে সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যে নিয়ে এসেছে ?

সৃষ্টিশীল আর হ'তে পারলাম কই। যা লিখেছি তার একটা দিক হলো জীবনচিত্র, জীবনরস বলতে পারেন। পৃথিবীটা যেমন দেখেছি লেখায় তেমন ধ'রে রাখা। আরেকটা অনেকটা ঐতিহাসিক দিক—সামাজিক বিকাশের দৃষ্টি—কীভাবে মানুষগুলো একটা সময়ের মধ্যে, একটা পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠলো তা দেখানো। লিখে দিন সৃষ্টিশীল লেখার সময় পাই নি বিশেষ, রাজনীতিতে সময় গেছে, পারিও নি।

১০. স্মৃতিচারণ ছাড়া আপনার প্রকাশিত স্মৃতিকথার আরো কী বিশিষ্ট মূল্য আছে ব'লে আপনি মনে করেন ?

ঐ দুটো পয়েন্ট। প্রথমত, যেসব ছোটো সাধারণ অসাধারণ কিছু ঘটেছে, সমাজের বিকাশে যার মূল্য আছে, সেসব কথাও তো লোকে ভুলে যায়। দ্বিতীয়ত, নিজেকে উপলক্ষ না করে, যদি 'আমি' ব'লে জিনিশটা কিছু থাকে—সেসব চরিত্র ও ঘটনার দ্বারা আমি গঠিত হ'য়ে চলেছিলাম,—হ'য়ে চলেছি··· এখানে তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এককথায় হোআট হ্যাপেনড অল অ্যাবাউট মি। মি-টাকে পিছনে রেখে বলা, কিন্তু মি-র দৃষ্টি দিয়েই তো বলতে হয়েছে। সবটা পারি নি। দ্বিতীয় খণ্ডে সেটা আরো কঠিন হ'য়ে গেছে। আরো সময় দিতে পারলে হয়তো হতো।

১১. আপনার কিছু গল্পের একটি তাৎক্ষণিক দিক আছে : নতুন মুদ্রণের সময় সেই রচনাগুলি আপনি সংশোধন দরকার মনে করেন না কেন ?

সংশোধন দরকার ছিল। কতো লিখেছি, লিখেই প্রেসে দিতে হয়েছে, পাবলিশার বলেছে, এখনি লেখা দিয়ে দিন। আমার লেখায় অনেক ত্রুটি আছে, বিশেষ ক'রে এই ত্রুটি সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু অন্যান্য কাজ ও সম্পাদকের তাগিদে সংশোধন হ'য়ে ওঠে নি। সময়ের অভাবের জন্য হয় নি। রাজনীতিতে বেশি ব্যাপৃত থাকায় তা সম্ভব হয় নি। বাংলা সংস্কৃতির রূপান্তরে এখন অনেক কিছু বাদ দেওয়ার আছে, এখনও তা খাপ খাওয়ানো হয় নি।

১২. মানবিকী বিদ্যার প্রতি আপনার বিচিত্র আগ্রহ। এতে উনিশ শতকের বাঙালি মনীষার ঐতিহ্য কতোখানি ক্রিয়াশীল ?

অন্য দেশে স্পেশালাইজেশন সম্ভব, ইতিহাসের কারণে অন্য দেশে সে সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের মতো আনডেভলপড দেশে সাধারণ পাঠকের মানসিক

স্তরকে উঁচু করার প্রশ্ন আছে। বিদ্যাসাগর, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা তো লোকশিক্ষা দিয়ে গেলেন। সুনীতিকুমারকেও এ প্রশ্ন করেছিল রাশিয়ায়। আপনার বিশেষ ক্ষেত্র কী? না, ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করে ইণ্ডো-এরিআন ফিলোলজি। সব মিলিয়ে একটা ব্যাপক দৃষ্টি আছে। এই যে সমগ্রতার বোধ—আমার কাছে তার প্রাপ্তি ও আকর্ষণ আছে। শুধু আর্টস কেন, অঙ্ক জানি না, তবু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাকে এখনো গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শেষে বলতে হয় মার্কসের ঐ কথায়, যা কিছু মানবীয় তা না জানলে আমিই খণ্ডিত।

১৯৮০

নন্দলাল বসু-র সঙ্গে নিমাই চট্টোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকার

[১৯৫৩ সালে আমরা শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা করেছিলাম : বিভাগোত্তর দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে সেই মেলা এখনো একটি স্মরণীয়, কারো কারো চোখে ঐতিহাসিক, ঘটনা। সাহিত্যমেলার উপদেশক মণ্ডলীর মধ্যে একজন ছিলেন নন্দলাল বসু ; নানা ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, বিশেষ ক'রে মঞ্চসজ্জার কাজে। তবে কোনো কোনো বিষয়ে তিনি হয়তো আমাদের ভুল বুঝেছিলেন। সাহিত্যমেলার অল্প কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাই ; মেলার প্রসঙ্গ ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পের নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেদিন কথা হয়েছিল, এখনকার দিনে যাকে বলা হয় 'সাক্ষাৎকার'। সেই সাক্ষাৎকারের অনুলিখন পরের দিনই তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম ; মনে আছে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং তাঁরই অনুমোদন ও পরামর্শক্রমে সেটি ১৯৫৪ সালে এক বাংলা দৈনিকপত্রে ছাপা হয়েছিল। প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন-কারকে নেপথ্যে রেখে শিল্পাচার্যের কথাগুলিই, তিনি যেমনভাবে বলেছিলেন সেইভাবে, তুলে ধরা হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে নন্দলাল শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ওই কথোপকথনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের ফলে সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে যে sectarian মনোবৃত্তি দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে ; নূতনদের শিল্প

বা মডার্ণ আর্ট সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, folk art বা লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং দ্রুত নগরায়ণের ফলে কমার্শিয়াল আর্টের প্রভাবের ব্যাপকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে। উত্তরে তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল, সত্যের সীমানা ও শিল্পীর সহিষ্ণুতা বিষয়ে। সেই বক্তব্যের প্রতিলিপি নিচে দেওয়া হল।]

শিল্পীর জাতি-বিচার

সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে আজকাল যে দলনিষ্ঠা বা sectarian মনোবৃত্তি অতিমাত্রায় দেখা দিচ্ছে এটা সুলক্ষণ নয়। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলতঃ কোনো বর্ণভেদ নেই; অমুক ব্রাহ্মণ অমুক শূদ্র অমুক ক্ষত্রিয় বা অমুক বৈশ্য, এ বিচার এখানে চলে না। বাংলা সাহিত্যের আলোচনাতেও, এটা হিন্দু ভাবধারা আর ওটা মুসলমানী ভাবধারা, এরকম কোনো ভেদরেখা টানতে যাওয়া অসঙ্গত। শান্তিনিকেতন সাহিত্য-মেলায় তোমরা যে কাউকে-কাউকে পূর্ব বাংলার মুসলমান প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করেছিলে, এটা আমার মনঃপূত হয়নি। কারণ সাহিত্যিকের একমাত্র চরিত্র পরিচয় হল এই যে তিনি সাহিত্যিক; তিনি হিন্দু না মুসলমান, পূর্ব বাংলার লোক না পশ্চিম বাংলার—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক। আর্টিস্ট প্রাথমিক বিচারে আর্টিস্টই; শিল্পের আলোচনায় বা সমঝোতায় শিল্পীর জাতি-বিচার খণ্ডিত দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। বাংলা সাহিত্যকেও পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় এই দুই কৃত্রিম আঞ্চলিক ভেদ রেখায় বিভক্ত করতে আমার মন সায় দেয় না। কারণ বাংলা সাহিত্য এক এবং অভিন্ন; তার ভাষায় কোনো ভেদ নেই। পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক ভাষা পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্য ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই সবজনস্বীকৃত; তারা যদি আজ ঢাকা বা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেন, তবে সে কৃত্রিম চেষ্টা ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনের সেই পুরোনো বাঙাল সভার কথা মনে পড়ছে; সে সভার ভাষা সাধারণ কথাবার্তায় হাসিঠাট্টায় চলবে, ঘরোয়া বৈঠকে বা সাংসারিক হিসেবনিকেশে চলবে, কিন্তু তা' দিয়ে অভিনব কোনো বাঙাল সাহিত্য তৈরি হবে না। পশ্চিম বাংলার ভাষাই চলবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যেও; যা যথার্থই গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত, তার বিরুদ্ধে অকারণ বিদ্রোহ যদি কোনো দিন দেখা দেয়, তবে তা টিকবে না। পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্ট সাহিত্য যদি পূর্ববঙ্গের পাঠক বর্জন করেন, তবে সেটা বাংলা প্রবাদের ভাষায় সতীনের উপর রাগ করে ভূঁয়ে ভাত খাওয়ারই সামিল হবে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা ও

পশ্চিম বাংলার নাড়ির যোগ কেউ কোনো দিন ছিন্ন করতে পারবে না। আজ তো দেখতেই পাচ্ছ পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ কতখানি আত্মসচেতন হয়েছে, উভয় বাঙ্গলার মৌলিক ঐক্য কিভাবে অনুভব করছে।

ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য

আগেই বলেছি যা যথার্থ আর্ট তা বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। কোনো দল বা বর্ণবিশেষের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি থাকতে পারে না। এক কথায় তা সর্বদলীয়। অমুক কেন আমার মতের সঙ্গে মানিয়ে চলেন না, শিল্প বা সাহিত্য এ অভিযোগের ক্ষেত্র নয়। কত মুসলমান কবিই তো বৈষ্ণবীয় বা হিন্দুপুরাণের বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন; মুসলমান পট গায়কেরা আজও রাধাকৃষ্ণ, রাম সীতার আখ্যায়িকা এঁকে ও গেয়ে বেড়ান বাংলার গ্রামে গ্রামে। তাঁরা মনেপ্রাণে শিল্পী, তাই অন্ধ গোঁড়ামি বা bigotry অসংকোচে পরিহার করতে পেরেছেন, যা গ্রহণীয় তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন ভেদ বুদ্ধি অতিক্রম করে, ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ কম নয়।

শিল্পী বা সাহিত্যিকদের শ্রেণীবিভাগ

আমি দেখেছি সাহিত্যিকদের শ্রেণী বিভাগ শুধু একটি প্রকারেই সম্ভব। সে শ্রেণীবিভাগ হবে, কে কতদিন লিখছেন তার ভিত্তিতে। ইনি দশ বছর লিখছেন, অতএব এর সাহিত্যিক বয়স দশ বছর; উনি পঁচিশ বছর লিখছেন, অতএব ওর পঁচিশ। অর্থাৎ প্রধানতঃ এঁদের দুটি শ্রেণী,—নূতন ও পুরাতন। সাহিত্য-মেলা যদি আবার কখনো করতে চাও, তবে পুরাতনদের প্রাপ্য কুল-মর্যাদা দিতে ভুলো না; সে মেলা যেন শুধুমাত্র নূতনদেরই সমাবেশ না হয়ে ওঠে। এরকম পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টি যেন কারো না থাকে। একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাত মানেই তো পূর্ণতার অভাব। আর্ট যখনি জন্ম নেয়, তখনি সে সর্বজনগ্রাহ্য। কারণ আর্টের প্রধান কথা আনন্দ, এবং আনন্দ বিশ্বজনীন। এক সূর্য সকলেরই আনন্দ বিধান করছে; ওই সূর্য তোমাদের নয়, সূর্য আমাদের, এ দ্বন্দ্ব বা কাড়াকাড়ি এখানে চলতে পারে না। মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি অধিকারের দ্বন্দ্ব নেই; তা' দলমতনির্বিশেষে সর্বজনের হৃদয়কে নাড়া দেয়। সাহিত্য-মেলা শুধু শান্তিনিকেতনেরই জিনিস হবে না,—হবে সর্ব বাংলার। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিচারে এখানে

অতিথিদের আহ্বান করলে চলবে না ; মুক্ত মন নিয়ে তাঁদের সকলকেই ডেকে আনতে হবে, তাঁরা যে সাহিত্যিক শুধুমাত্র এই পরিচয়েই ; অন্য পরিচয়কে গৌণ করে। অতিথিরা যেন শান্তিনিকেতনে এসে নিজেদের প্রবাসী মনে না করেন। শান্তিনিকেতন যদি এরকম মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে, তবে সেটা তার নিজেরই পুষ্টির ও গর্বের কারণ হবে ; এবং এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা বাংলাদেশে আর নেই।

মডার্ণ আর্ট

আগেই বলেছি শিল্পীকে মুক্ত ও অপক্ষপাত মনের অধিকারী হতে হবে। আমি যে মডার্ণ আর্ট ভালো বুঝি না, তাই বলে কি তাকে একেবারেই বুঝতে চেষ্টা করব না, নির্বিচারে অস্বীকার করব যে এ সব প্রচেষ্টার কোনো মূল্য আছে ? যে কোনো শিল্প তার জন্মলগ্নেই স্বীকৃতির দাবি রাখে,—সে যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে তাকে যেন আমরা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা না রাখি। শিল্পী আমার দলভুক্ত নন ব'লেই যে তিনি বর্জনীয় এরকম চিন্তা অন্যায়। সহানুভূতিশূন্যতা হল শিল্পীর স্বধর্মচ্যুতি। আমি স্বতন্ত্রধারার শিল্পী হতে পারি, কিন্তু অন্য শিল্পীর সম্পর্কে সহানুভূতি ও সংবেদন আমার কেন কম থাকবে ?

লোকশিল্প

তোমরা আজকাল folk art বা লোকশিল্পের কথা খুব বেশি বলো। মনে রেখো, লোকশিল্পের প্রধান কথা হল লোকসংযোগ। যদি তুমি গ্রামের লোকের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারো, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হও, তাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে নিতে পারো, তবেই folk art সৃষ্টি করতে পারো, নচেৎ নয়। শহুরে মেজাজ নিয়ে, গ্রাম সম্বন্ধে অসীম অজ্ঞতা নিয়ে, যে শিল্পী বড়াই করেন যে তিনি folk art সৃষ্টি করছেন তিনি ভুল বুঝেছেন, অথবা তিনি সাধু শিল্পী নন। শহর থেকে লোকশিল্পকে বাঁচাও এ শ্লোগান তোলা একান্ত নিরর্থক। লোকশিল্প যদি বাঁচে, তবে তা নিজের অন্তর্নিহিত রসের গুণেই বাঁচবে ; লোকশিল্পের সেই রসোত্তীর্ণ উপাদানই আমাদের মতো শহরবাসীকেও আকৃষ্ট করে, আনন্দ দেয়। তবে একথা সবসময়েই মনে রাখতে হবে যে, লোকশিল্পের যথার্থ স্ফুরণ তার পরিবেশের বাইরে সম্ভব নয়, শহর তার ক্ষেত্র নয়। Stage বেঁধে যাত্রা করার চেষ্টা অর্থহীন,—সেখানে থিয়েটারই শোভন। আজকের দিনে যে যাত্রা

করতেই হবে তা তো নয়, তবে যাত্রাওয়ালাদের কাছ থেকে আমরা আজও অনেক কিছু শিখতে পারি। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক—যেমন 'ফাল্গুনী'—open-air যাত্রার ধরণে সুন্দর অভিনয় করা চলে। আবার অবনীন্দ্রনাথ যে যাত্রা লিখেছেন তা-ও তো মামুলি যাত্রা নয়, আধুনিক মন এখানে যাত্রার আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করছে, অভিনয়ের ব্যবস্থাও তেমনি। তবে এ সব ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ proportion-বোধ প্রয়োজন। Stage-এর উপর সাঁওতাল নাচ চলবে না, কারণ তা পরিবেশ-বিরোধী, অতএব সৌন্দর্যঘাতী। এরকম পরিবেশবিরোধী প্রচেষ্টার সঙ্গে উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে, এ যেন পরিচ্ছন্ন বিছানার উপর খানিকটা গোবর এনে ফেলা। গোবর অসুন্দর জিনিস নয় নিশ্চয়, তার নিজের পরিবেশে সার দেওয়ার খেতে সে আদৌ বেমানান নয়, সেইটাই তার নিজস্ব স্থান; কিন্তু যখনি সে ওই পরিচ্ছন্ন বিছানার উপর উঠে এল তখনি অসুন্দর হয়ে উঠল। লোকশিল্প সম্বন্ধেও একথা সত্য, 'স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে।' লোকশিল্পের 'পুনরুজ্জীবনের' হুজুগ তোলা বা এ বিষয়ে হৈ চৈ তোলা নিরর্থক। শহরবাসীর patronage লোকশিল্পকে উপকৃত করবে কিভাবে?

শহর আজ বিপুল বেগে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে, মরুভূমি যেমন এগিয়ে চলে তার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে। রাজপুতানার মরুভূমি যেমন এগিয়ে আসছে, ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন। গ্রাম তো শহরের দিকে এগোচ্ছে না। এই সাঁওতালরাই কি আর টিকে থাকবে তাদের বর্তমান রূপে? তারাও শিক্ষা পাবে, শহুরে চালচলনে অভ্যস্ত হবে, পোষাক বদলাবে; তবে তার বর্তমান সংস্কৃতিই বা টিকবে কেমন ক'রে? কালীঘাটে যখন প্রথম পটুয়ারা এসেছিল, তখন তাদের পরিবেশ ছিল অনুকূল; দেবীর পূজায় তারা সহায়ক ছিল; তারা ছবি আঁকত সাধারণের জন্যে এবং তাতে তাদের নিজেদেরও জীবিকাসংস্থান হয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু পরিবেশ যখন বদলাল, বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে স্ফীত হয়ে উঠল মহানগরী, কালীঘাটের পটুয়ারাও তাদের স্বাভাবিক পরিবেশ তখন হারিয়ে ফেলল। 'শহুরে' হয়ে ওঠায় তাদের স্বাভাবিক দীপ্তিও তখন থেকে স্তিমিত হয়ে এল। এমনি ক'রেই লোকশিল্পের অনেক ধারা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসে। অবশ্য এতে অনুশোচনার কিছু নেই। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুরাও তো লুপ্ত হয়ে গেছে, তাতে কি কোনো ক্ষতি হয়েছে পৃথিবীর? নূতন আসে, পুরাতনের স্থান হয় জাদুঘরে। তবু পুরাতন কি অশ্রদ্ধা বা অবহেলার বস্তু হয়ে ওঠে কখনো?

কমার্শিয়াল আর্ট

আমাদের যুগটা ক্রমেই কমার্শিয়াল আর্টের যুগ হয়ে উঠছে। বারাঙ্গনা কি আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে কখনোই? কল্যাণী গৃহবধূই আমরা নিজের জীবনে কামনা করি। তেমনি মহৎ আর্টই আমাদের প্রকৃত আনন্দ দেয়, কমার্শিয়াল আর্ট তা দিতে পারে না। অর্থনৈতিক কারণে, বাণিজ্যিক কারণে এই কমার্শিয়াল আর্টের ব্যাপ্তি ও প্রসার আজ অরোধ্য হয়ে উঠেছে। শিল্পের এই পণ্যবৃত্তি, টাকার জন্যে মা-বোন-মেয়েদের সিনেমায় নামানোর মতো। একে কি বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারি? প্রয়োজনের দিক থেকে অবশ্য কমার্শিয়াল আর্টকে স্থানচ্যুত করা উচিত হবে না, কিন্তু মহৎ শিল্পের স্থান যেন সে অধিকার না ক'রে বসে, স্বাভাবিক শিল্পস্পৃহাবশতঃ এই কামনাই আমরা নিরন্তর পোষণ করি।

শিল্পীর সহিষ্ণুতা

শিল্পীকে এগিয়ে যেতে হবে, দল বা মতের সংকীর্ণতায় জড়িয়ে না পড়ে। উপমা দিয়ে বলি: একটা জাহাজ চলেছে; মনে করো লণ্ডন তার গন্তব্যস্থল, তার আগে সে থামবে না। সে জাহাজে নানান মতের নানান শিল্পীর একত্র সমাবেশ। মধ্যপথে যদি কেউ ভাবেন, এঁদের সঙ্গে আমি কেন সহযাত্রী হব, অকস্মাৎ যাত্রা থামাতে চান, তবে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সমুদ্রে, যার অর্থ মৃত্যু। শিল্পী যেন এরকম অসহিষ্ণু না হন, ঐক্যে যেন তাঁর আস্থা থাকে, স্থির ও সহিষ্ণুচিত্তে তিনি যেন অগ্রসর হতে থাকেন।

১৯৫৪

রামকিংকর-এর সঙ্গে শোভন সোম-এর সাক্ষাৎকার

[নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতাকালীন শান্তিনিকেতন কলাভবনে ভাস্কর্যের একমাত্র অধ্যাপক ছিলেন রামকিংকর। সে সময় শিল্পশিক্ষার্থীর পক্ষে কলাভবনে শিক্ষণীয় প্রতিটি বিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং পনের দিন অন্তর এক একজন অধ্যাপক অধ্যাপিকার একটানা পনের দিন ক্লাস হত। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার সূত্রে এবং পরবর্তীকালে নানা প্রসঙ্গে শিল্পশিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসাবশত রামকিংকরের কাছে আমরা যা জানতে চেয়েছি কিংবা তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যা বলেছেন, তারই ভিত্তিতে এই সাক্ষাৎকার তৈরি হয়েছে।]

প্রশ্ন ॥ কিংকরদা, ছবি আঁকা শেখার উপায় কি ?

উত্তর ॥ প্রথমে তোমাকে দেখা শিখতে হবে। তোমার চোখ আর মন থাকবে খোলা আর সজাগ। রূপরসে পৃথিবী তোমার মধ্যে নিজের মায়ার প্রতিরূপ দেখতে চায়। সেই প্রতিরূপ হচ্ছে তোমার ছবি। ছবি আঁকার উপায় হচ্ছে রেখা (লাইন), পর্দা (টোন), রঙ (কালার) আর ত্বক (টেক্‌শচার) ব্যবহার করে রূপবন্ধ (ফর্ম) সৃষ্টি করা। এগুলি হচ্ছে ছবি আঁকার বর্ণমালা বা অ আ ক খ। দর্শক যখন ছবি দেখে, তখন এগুলির ভিতর দিয়ে রূপদর্শন করে। রেখা, পর্দা, রঙ আর ত্বকের ধারণা প্রকৃতির রূপের মধ্যেই আছে। ছবি আঁকা শেখার উপায় হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে এই অ আ ক খ শেখা। যদি তুমি ঠিকমত দেখতে পার, তবে দেখাতেও পারবে।

প্রশ্ন ॥ আর্ট স্কুলের ছাত্রেরা সামনে বসানো জীবন্ত মডেল দেখে ছবি আঁকা শেখে। আপনি আমাদের ক্লাসে জীবন্ত মানুষকে মডেল হিসাবে বসান না, অথচ বলেন জীবন থেকে গড়তে।

উত্তর ॥ সামনে জড়ভঙ্গীতে বসানো মডেল আর জীবন এক ব্যাপার নয়। জীবনকে আড়ষ্টতার মধ্যে পাওয়া যায় না। জীবন গতিময়, জীবন রয়েছে স্বাভাবিকতার মধ্যে। সচল জীবনের সেই স্বচ্ছন্দতা দেখবে, তোমার কাজে তা ধরতে চাইবে, দেখবে তুমি প্রাণের স্পন্দনকে অনুভব করতে পারছ শিল্পী হিসাবেও তুমি আঁকবে সচল জীবনের ছবি। দেখবে, বুঝতে চেষ্টা করবে. তারপর আঁকবে বা গড়বে। যদি না পার, যদি ভুল হয়, বারবার দেখে আসবে ; বুঝতে চেষ্টা করবে কোথায় কেন ভুল হচ্ছে। আবার আঁকবে, আবার গড়বে। ছবি মানে অ্যানাটমির নকল নয়। নিষ্প্রাণ জড়ত্বকে হুবহু নকল করলে তা ছবিও হয় না, মূর্তিও হয় না।

প্রশ্ন ॥ আবক্ষ ভাস্কর্য প্রতিকৃতির ক্লাসে কমন মডেল না দিয়ে আপনি আমাদের বলছেন, তোমরা একজন আরেকজনের প্রতিকৃতি গড়। এর কারণ কি ?

উত্তর ॥ আবক্ষ ভাস্কর্য প্রতিকৃতিতে বিষয়কে চারপাশ থেকে (ইন্ দি রাউণ্ড) দেখতে হয়, নতোন্নতভাবে (ইন্ রিলিফ) নয়। তোমাদের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা গত চার বছরে পরস্পরের চেহারাই কেবল চেননি, পরস্পরকে গভীরভাবে চেনেছো। প্রতিকৃতিতে মানুষটির সাদৃশ্যের সঙ্গে পরিচয়ও তুলে ধরতে হয়। মানুষটিকে যেমন সামনে থেকে, তেমনি সবদিক থেকেও ধরতে হয়। তোমরা যখন ঘুরন-চৌকিতে মাটি রেখে কাজ করবে, তখন পরস্পর পরস্পরকে চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে পাবে। কাজ করতে করতে মাটির স্পর্শের ভিতর দিয়ে একজন আরেক-জনকে আরো গভীরভাবে জানতে পারবে। একজন মানুষকে মডেল হিসাবে আড়ষ্টভঙ্গীতে বসিয়ে দিলে তাকে এমন সচল অন্তরঙ্গ অবস্থায় পেতে না।

প্রশ্ন ॥ প্রতিকৃতিতে মাপজোকের ব্যাপার আছে। মাপকাঠি (ক্যালিপার) ব্যবহার করব ?

উত্তর ॥ যার মুখ করছ, তার মুখের বিভিন্ন অংশের মাপজোক নিতে মাপকাঠির

ব্যবহার যথাসম্ভব কম করবে। যন্ত্র তোমাকে ঠিক মাপ দেবে, তবে শিল্প মানে মাপজোক নয়। চোখের অনুপাত এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অনুপাত। যেখানে তোমার সংশয় থাকবে, দেখবে পারছ না, সেখানেই যন্ত্রের সাহায্য নেবে; নইলে নয়। ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা তোমার চোখই বলে দেবে। আর একটা কথা, আপাতদৃষ্টিতে একরকম মনে হলেও লক্ষ্য করে দেখবে, মানুষের দু'টো চোখ ঠিক এক নয়। নাকের দু'পাশ, গাল, কান, ঠিক এক নয়। মানুষের মুখের আধখানা বাকি আধখানার মত হুবহু এক নয়। প্রতিকৃতি গড়তে এদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে।

[একটি গোটানো ছবি বা স্ক্রল পেইন্‌টিং-এর যত্নহীন মাউন্টিং দেখে কিংকরদা'র মন্তব্য]

এ কি করেছ হে!

প্রশ্ন ॥ কেন, কিংকরদা!

উত্তর ॥ রাজকন্যেকে একেবারে গামছা পরিয়ে দিয়েছ। মাউন্টিং যে ছবির অঙ্গ। রাজকন্যেকে গামছা পরালে যেমন তার মর্যাদা হানি ঘটে, তেমনি যেমন তেমন ভাবে ছবি হাজির (প্রেজেন্ট) করলে ছবিরও মর্যাদা নষ্ট হয়। ঠিকমত মাউন্টিং না হলে ভালো ছবি মার খায়। ছবি আঁকার পরেও মাউন্টিং না হওয়া পর্যন্ত ছবি শেষ হয় না। মাউন্টিং দামি হলেই হল না। বিলিতি গিলটিকরা ভারী ফ্রেম দেখেছ তো! তাতে ছবি দেখবে না ফ্রেম দেখবে, সেটা বোঝা দায়। ফ্রেমটাই চায় ছবিকে ছাপিয়ে উঠতে। কিন্তু ভালো মাউন্টিং তা করে না, নিজে ছবিকে চাপা দেয় না। ভালো মাউন্টিং ছবিকেই ঠিকমত হাজির (প্রেজেন্ট) করে। জাপানীদের দেখে এদেশে গগনবাবু (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) পরিচ্ছন্ন মাউন্টিং-এর পরিকল্পনা করেন। মাউন্টিং-এর উপর আর দু'পাশ একমাপ আর নিচে তার দেড়গুণ, এই হল কাট মাউন্টিং-এর মাপ। ফ্রেম হল সরু সাদাসিদে আর কোরা। ছবি বুঝে আবার ফ্রেমের নিচ দিকের বাহু হল বাকি তিন বাহু থেকে একটু চওড়া। মাস্টারমশাই (নন্দলাল বসু) মাউন্টিং বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁদের মাউন্টিং-এর নকশাই এদেশে চলছে।

প্রশ্ন ॥ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট কি, তার উদ্দেশ্যই বা কি?

উত্তর ॥ কোনো শিল্পে থাকে বর্ণনা, কোনো ছবিতে বা মূর্তিতে রূপের নকলের বদলে বিষয়ের ভেতরের সুর ধরার চেষ্টা হয়। সংগীতেও তেমনি বিষয়ের ভেতরের সুর ধরার চেষ্টা থাকে। সংগীত রূপের নকল করে না। বসন্তের রাগ গাইতে পাপিয়া কোকিলের ডাকের নকল কেউ করে না; সুরের ভিতর দিয়ে বসন্তের অর্থাৎ বিষয়ের অনুভব আর আবহ তৈরির চেষ্টাই সংগীতে থাকে। রাগরাগিণী এইভাবে তৈরি। এইভাবে সংগীতে সীমার মধ্যে অসীমকে ধরা হয়। গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) গানে আবার কথা দিয়েও অসীমকে ধরা হয়েছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হল, দৃশ্যজগতের অনুভবের রেখায় ও ছন্দে বাঁধা সংগীত। তাতে সামঞ্জস্য থাকবে, নানাভাবে করে করে দেখতে হয় রেখা ও ছন্দের সামঞ্জস্য তৈরি হল কি না। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট কি, তার উদ্দেশ্যই বা কি, তা বুঝতে হলে তাকাতে হয় আমাদের ধ্রুপদী (ক্ল্যাসিক্যাল) সংগীতের দিকে। বস্তুব্যতিরেকের বা অ্যাবস্ট্রাকশনের ব্যাপার আমাদের ট্র্যাডিশনেই (পরম্পরায়) আছে।

প্রশ্ন ॥ আমাদের কোনো ছাত্র যদি ক্লাসে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট করে, তাহলে আপনি সেই মূর্তি ভেঙে দেন। এটা করেন কেন?

উত্তর ॥ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট করব ভাবলেই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হয় না। কাজ করতে করতে শিল্পী অ্যাবস্ট্রাকশনের একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছবেন। যেমন মাস্টারমশাইর (নন্দলাল বসুর) 'মহিষাসুরমর্দিনী' ছবিতে রেখার ঋজুতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা আর তেজ। শিল্পী স্বাধীন; দেখতে ও আঁকতে জানার পর নিজের ক্ষমতায় তিনি নিজের পথে যাবেন। কিন্তু তোমরা এখন শিখছ। তোমাদের দেখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, কাজ করতে হবে। তোমাদের চোখ, মগজ আর হাত আগে তৈরি করতে হবে। তোমরা কি শিক্ষার এই দিকগুলি উড়িয়ে দিতে পার? শিল্পের মূলমন্ত্রগুলি না শিখলে শিক্ষার্থীর চলবে কি করে? তোমরা কি হামাগুড়ি না দিয়েই দৌড়বীর হতে চাও?

প্রশ্ন ॥ আপনাকে মডার্ন আর্টিস্ট (আধুনিক শিল্পী) বলা হয়। বলা হয় আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট করেন।

উত্তর ॥ আমি চলতি অর্থে আধুনিক কি না, জানি না। আমি কারো মতে বা পথে চলি না। আমি যা অনুভব করি, আমার কাজে সেই অনুভবের রূপ

দিতে চেষ্টা করি। স্বাধীন ইচ্ছায় যা ভালো লাগে, তাই করি। ও সবের অত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর এক ধরনের স্টেট আর্ট (সরকারি শিল্প) তৈরি হল ; লেনিন আর স্তালিন ছাড়া তাতে কথা নেই। ফল হল বিপরীত। তখন রাশিয়ার বাইরে আধুনিক শিল্পের বাঘা বাঘাদের মধ্যে দেখা গেল রাশিয়ানদেরই সংখ্যা বেশি। তেমনি এদেশে গান্ধিজীর ছবি না আঁকলে তুমি পাত পাবে না, তা চলবে না। তা বলে গান্ধিজীর ছবি আঁকব না বা মূর্তি গড়ব না, তাও নয়। আসলে শিল্পের প্রেরণা আসে ভিতর থেকে, ভিতরের এক ইচ্ছা বা অতৃপ্তি থেকে। এই ইচ্ছা বা অতৃপ্তিই শিল্পীকে এগিয়ে দেয়। শিল্পী পথিক, সে চলে, আটকে থাকা তার ধর্মে নেই। মাস্টারমশাইকে (নন্দলাল বসুকে) দেখ, জীবনে তিনি কোথাও থেমে থাকেন নি। তাঁর সৃষ্টির অসাধারণ বৈচিত্র্য শিল্পের কত না দিককে উদ্ভাসিত করেছে।

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। তাঁর ছবির বিষয়ে আপনি কি মনে করেন ?

উত্তর ॥ গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) ছিল প্রখর দৃষ্টিশক্তি, ছন্দজ্ঞান আর প্রগাঢ় অনুভব। রেখা আর রঙের ডিজাইন (নক্‌শা) সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এদেশে তিনি প্রথম একেবারে নূতন পথে এগিয়েছিলেন। তাঁর ছবি কাব্যিক নয় আবার অ্যাকাডেমিকও নয়। তাঁর ছবির বড়ো গুণ বলিষ্ঠতা আর রূপের এক অনাস্বাদিত অথচ ঘনিষ্ঠ জগৎ।

[উনিশ শ তিয়াত্তরে শান্তিনিকেতনে এক সান্ধ্য আসরে কিংকরদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেদিন গান শুনতে চাইছিলেন। সবার গান হবার পর তাঁকে বললাম :]

প্রশ্ন ॥ একসময় শান্তিনিকেতনে মাঠে ঘাটে আপনার উদাত্ত গলায় অনেক গান শুনেছি। আজ একটা গান গাইবেন, আপনার প্রিয় একটি গান !

কিংকরদা গাইলেন : তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া ॥

এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে
তরী এল তীরে—
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া ॥···

[সেদিন তাঁর সেই গানে তাঁরই জীবনের কথা যেন শুনেছিলাম। কলাভবনের অধ্যাপক সুরেন দে সেই গান টেপ-এ তুলেছিলেন।]

সত্যজিৎ রায়-এর সঙ্গে তপেন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকার

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্রের সঙ্গীত

[প্রথম যখন মার সঙ্গে টকি দেখতে যাই তখন ছবির গান-বাজনা সম্বন্ধে ভেবেছিলুম যে, পর্দার পেছনে বসে এক দল গাইয়ে-বাজিয়ে বোধহয় গান-বাজনা করে। তবু সন্দেহ যায়নি এবং ভাবনারও শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত সন্দেহ নিরসনের জন্য মার শরণ নিলুম। মা'ও যে খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন তা নয় ; তাই ভাসা ভাসা ভাবে বললেন যে ছবির গান-বাজনা মানুষ করে না—যন্ত্রে করে। কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হল না। আমার বাবার এক বন্ধুর একটা সিনেমা হাউস ছিল, সেখানে গিয়ে সন্দেহ নিরসন করব স্থির করলুম। কিন্তু যেখানে গিয়ে গাইয়ে-বাজিয়ের দেখা পাব ভাবলুম সেখানে গিয়ে দেখলুম লোহা-লক্কড়। কাজেই মনে হল যে, মা-ই ঠিক কথা বলেছেন।

কয়েক যুগ বাদে আমাদের পরিবার কলকাতায় চলে এল। ইতিমধ্যে সিনেমার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যাওয়াতে আমি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লুম এবং শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হলুম। এই সময়ে ফিল্ম সোসাইটিতে ফিল্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা সভা হত ও শীঘ্রই সোসাইটি একটি দলিল-চিত্রর কাজে হাত দিল। শ্রীরায়ের সুচিন্তিত পরামর্শে ছবিটা মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছিল।

পরে শ্রীরায়ের ছবি তৈরির ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছি এবং যে সঙ্গীতে

আমার আগ্রহ সর্বাধিক তাও চোখের সামনে হতে দেখেছি। তাঁকে সঙ্গীতকর্মে রত দেখে অনেকবার ভেবেছি এই বিষয়ে তাঁর কোন সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব কি না।

রায়মশাই যখন 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র সঙ্গীতগ্রহণে ব্যস্ত তখন একটা সুযোগ এসে গেল। স্কোরিং থিয়েটারে শ্রীরায়ের কয়েকটা ছবি নিলে কেমন হয়? আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু অরুণ গাঙ্গুলি এ বিষয়ে একমত হতেই আমরা টেকনিশিয়ান ষ্টুডিওর (যেখানে শ্রীরায় কাজ করছিলেন) দিকে বেরিয়ে পড়লুম এবং অরুণ শ্রীরায়ের অনেকগুলো ছবি নিল। তারপরে ছোট একটা প্রশ্নোত্তরের পালা।

এর পরে রজার ম্যানভিলের দ্য টেকনিক অফ ফিল্ম ম্যুজিক প্রবন্ধটি পড়ি এবং এক ঝাঁক প্রশ্ন আমার মাথায় গজিয়ে ওঠে। একটা সাক্ষাৎকারের আবেদন জানিয়ে শ্রীরায়কে একটি চিঠি লিখি—এ কথাও জানিয়ে দিই যে, মোলাকাৎটা একটু দীর্ঘ হতে পারে—এবং তিনিও সম্মত হন। এর ফল হল এই সাক্ষাৎকার।]

তপেন বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ছেলেবেলায় সঙ্গীতে শিক্ষালাভ সম্পর্কে আপনার দু'চারটা কথা দিয়েই আরম্ভ করা যাক। এই শিক্ষা পরবর্তীকালে আপনার ফিল্মের সঙ্গীত রচনায় কতখানি সাহায্য করেছে সে সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন।

সত্যজিৎ রায়॥ সঙ্গীতের কেতা-দুরস্ত শিক্ষা আমার কখনো হয়নি, তবে একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছিলাম কারণ আমার পরিবারের প্রায় সকলেই গাইতে পারতেন। কিন্তু তারা ছিলেন স্বভাবপটু—তালিম-পাওয়া গাইয়ে নয়। কলেজে পড়ার সময় থেকে আমি উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে আগ্রহী এবং ঐ বিষয়ের গ্রামোফোন রেকর্ডের উৎসাহী সংগ্রাহক হয়ে উঠি (পুরনো রেকর্ড দিয়েই অবশ্য কাজটা সুরু করি)। পরে সিম্ফনি এবং চেম্বার মিউজিক শোনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য স্বরলিপির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। পরে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতেও আমার ভীষণ আগ্রহ জন্মায়। বইয়ের সাহায্যে রাগ এবং তাল চেনার শিক্ষা লাভ করি। পরে যখন নিজের ছবির সঙ্গীত রচনায় হাত দিই তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সঙ্গে এই পরিচয় আমার খুব কাজে লেগেছিল। রবিশঙ্কর, আলি আকবর এবং বিলায়েত খাঁর মত সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও আমাকে সাহায্য করেছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়॥ প্রথম দিকে আপনার ছবির সঙ্গীত রচনার ব্যাপারে নামকরা সঙ্গীতজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার পরে কী কারণে আপনি নিজেই নিজের

ছবির সঙ্গীত রচনার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি ?

রায়॥ পথের পাঁচালীর সময়ে যখন রবিশঙ্কর তার আবহসঙ্গীত রচনা করছিলেন তখন থেকেই আমি নিজের মধ্যে সাঙ্গীতিক প্রেরণার উন্মেষ অনুভব করছিলাম। এইসব সাঙ্গীতিক ধারণার কোন-কোনটা আমি রবিশঙ্করের কাছেও ব্যক্ত করেছিলাম। অপরাজিত, জলসাঘর, অপুর সংসার, পরশ পাথর, দেবী—পরবর্তী এই পাঁচটি ছবি তৈরি করার সময় ব্যেপে আমার মধ্যে এই সাঙ্গীতিক প্রেরণা ও ধারণার প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে চলেছিল। বলাই বাহুল্য, সেইসব রচয়িতারা আমার মতো একজন সঙ্গীত-অজ্ঞ লোকের পরামর্শে চালিত না হয়ে নিজেদের ধারণাব দ্বারা চালিত হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। এঁদের দু'জন ছিলেন বিরাট ওস্তাদ—ফিল্মের সঙ্গীতরচয়িতা নয়। যে ছবির সঙ্গীত তাঁরা রচনা করতে এসেছেন তাঁর স্বার্থে নিজের অস্তিত্ব লোপ করে দিতে তাঁরা সচরাচর সম্মত ছিলেন না যা অধিকাংশ চলচ্চিত্র সঙ্গীতকারকে প্রায়শঃ করতে হয় বা করা উচিত। এই ঘটনা এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ না হতে দেওয়ার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত আমাকে নিজের হাতে সঙ্গীত রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে এগিয়ে দিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়॥ আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম কোন সাধারণীকরণে পৌছানো যায় কি যে, একজন চলচ্চিত্রকারের পক্ষে তার ছবির সঙ্গীত-পরিচালক তার নিজেরই হওয়া অধিকতর কাম্য, অবশ্য সেই রকম সাঙ্গীতিক দক্ষতা এবং কল্পনাশক্তি যদি পরিচালকের থাকে।

রায়॥ চলচ্চিত্র সৃষ্টির আদর্শ অবস্থায় ক্যামেরার পেছনের যাবতীয় কাজ যেমন পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, পরিকল্পনা, সম্পাদনা এবং আবহসঙ্গীত রচনা—সব কিছু পরিচালকেরই নিজের করা উচিত। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলেও শেষের চারটির উপরে তার সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। বর্তমানে পরিচালনা এবং সঙ্গীত রচনার কাজ আমি নিজে করি এবং বাকি তিনটি বিষয়ের উপর যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখি। আমার মনে হয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গত কয়েক বছর সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে আমার উন্নতি হয়েছে। তিন কন্যাতে রচয়িতা হিসাবে আমার যে দুর্বলতা ছিল, চারুলতায় এবং তার পরে তাকে কাটিয়ে উঠে সাঙ্গীতিক উপকরণের উপরে আমার দখল কায়েম করতে পেরেছি।

বন্দ্যোপাধ্যায়॥ এখন এমন একটা প্রশ্ন আপনাকে করা যাকে সাজান কঠিন। প্রত্যেক সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে একটা প্রেরণার ব্যাপার থাকে,

আপনার ফিল্ম সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। ছবি তৈরি করার সময় আপনাকে যেন 'কিসে পেয়েছে' বলে মনে হত, আপনার সঙ্গীত রচনার সময়েও কি আপনার তেমন কোন অনুভূতি হয়েছে ?

রায় ॥ কোন কোন ছবি নিশ্চয়ই সুরকারকে অন্যগুলির চেয়ে অধিকতর অনুপ্রেরিত করে। চারুলতাতেই আমি প্রথম বুঝতে পারি যে, উপযুক্ত সঙ্গীত একটা ছবির মেজাজ এবং বুন্থনিকে কতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। এই সময়ের সঙ্গীত রচনা করে আমি খুব সুখী হয়েছিলাম। কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, অরণ্যের দিন রাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বীর মত ছবিতে অবশ্য তেমন সঙ্গীতের দরকার ছিল না। প্রয়োজন ও যৌক্তিকতার প্রশ্ন অবশ্য সব সময়ই থাকে এবং তা স্থির করার কোন সোজাসুজি রাস্তা নেই। তা ঠিক করতে হয় ছবির অন্তঃশীল শৈলী এবং সুর থেকে—কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে বা নেই—এবং তা থেকেই তার সাঙ্গীতিক বিকল্পের সন্ধান করতে হয়। কোন সময় প্রেরণার বিদ্যুচ্চমকে তার জবাব পাওয়া যায়—কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিআনোর সামনে বসে থাকতে হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অনেক বাংলা গানে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে, কবি এবং সুরকারের এক প্রকারের মিলন দেখা যায়। অনুরূপ মিলন কি সঙ্গীত এবং ফিল্মের ক্ষেত্রেও সম্ভব, বিশেষ করে এ দুটি যখন একই ব্যক্তির সৃষ্টি ?

রায় ॥ পরিচালকের পক্ষে সুর রচনা যেহেতু খুব বিরল ঘটনা সেই হেতু এই প্রশ্নের কোন সাধারণ জবাব হতে পারে না। আমি কেবল বলতে পারি যে, আমি যে সব ছবির জন্য সুর রচনা করেছি তাদের কোন কোনটার বিষয়ে আমি খুবই সুখী যা অন্য কোন কোনটার ক্ষেত্রে তত নই।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আপনার ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। যেমন চারুলতাতে আপনি দুটো গান ব্যবহার করেছেন—'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' এবং 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'। প্রথমটাকে বলা যায় ধার করা সঙ্গীত অর্থাৎ এটাকে তুলে নিয়ে আপনি ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যা সচরাচর করা হয়। দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে শুধু ধার করেন নি—তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু করেছেন। গানের বাণী বাদ দিয়ে আপনি শুধু তার সুরটাকে নিয়েছেন এবং এমন একটা সঙ্গীতসত্তা সৃষ্টি করেছেন—হ্যাঁ, সৃষ্টিই করেছেন বলব—যা সমস্ত ছবিটার উপরে আধিপত্য বিস্তার করে দর্শকের উপরে দারুণ অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। এটা হল আমার ধারণা। এ সম্বন্ধে

বিস্তারিত করে কিছু যদি বলেন তাহলে কৃতজ্ঞ হব।

রায় ॥ 'চিনি গো চিনি' ছবিটার একটা চরিত্রের মুখের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর 'মম চিত্তে' সুরটাকে পটভূমিতে রেখে ছবির সুরচ্ছন্দসমন্বিত মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কার্যকারিতার কারণ এর সুর ও ছন্দের অনন্যতা—দর্শক এর বাণীর সংগে পরিচিত কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। এই সুরের অন্তর্নিহিত কারুণ্য এবং লীলাচাঞ্চল্যের যুগ্ম ভাব চারুলতার মানসিক অবস্থা প্রকটনের ব্যাপারে একে যোগ্য করে তুলেছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন সংস্করণের স্বরলিপির বিশুদ্ধতার তর্কে না গিয়েও আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি আপনার ছবিতে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলিত স্বরলিপি থেকে কোন ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন? আরও জিজ্ঞাস্য, এই ধরণের বিচ্যুতিকে ছবির স্বার্থে আপনি সমর্থন করেন কি?

রায় ॥ আজ পর্যন্ত আমার ছবিতে তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি ব্যবহার করেছি—বাজে করুণ সুরে (মণিহার), এ পরবাসে রবে কে (কাঞ্চনজঙ্ঘা) এবং চিনি গো চিনি (চারুলতা)। প্রথম দুটি প্রচলিত-স্বরলিপি-অনুসারী। তৃতীয়টির ভিত্তি এখনকার প্রচলিত স্বরলিপি নয়—তার ভিত্তি এমন একটি সুর যার সঙ্গে আমি আবাল্য পরিচিত। এটির স্বরলিপিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেইজন্য এইটিকেই আমি সব চেয়ে নির্ভুল এবং শিল্পের দিক থেকে সবচেয়ে সন্তোষজনক বিবেচনা করি।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আমার মনে হয় বাংলা ফিল্ম সঙ্গীতে গুপী-বাঘা এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কারণ আবহসঙ্গীত ছাড়াও এই প্রথম আপনি ফিল্মের গানের কথা এবং সুর দুই-ই রচনা করলেন। এরূপ সম্ভাবনা কি আরও আছে যে, আপনার সাঙ্গীতিক সৃষ্টির প্রেরণাবলে আপনি এই ধরণের ফিল্মের এবং তার বাইরের গান আরও রচনা করবেন?

রায় ॥ ভবিষ্যতে আরো একটা গানের ছবি করার খুব ইচ্ছা আমার বিলক্ষণ রয়েছে। এখন অপেক্ষা করছি একটি যোগ্য বাহনের। হয়তো একটা লোক-কাহিনী, বাংলা দেশের ঐতিহ্যিক কোন গাথা নিয়েই হয়ত সেই ছবি করব। এখনও কিছু স্থির করিনি। তবে গুপী-বাঘার জন্য গান রচনা করার সময় যে উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম তাতে ও-রকম আর একটা সুযোগ পেলে তাকে আমি স্বাগত জানাব। তবে ছবি ছাড়া অন্য গান কখন লিখব কিনা তাতে আমার খুব সন্দেহ আছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আপনার কি মনে হয়, ফিল্মী-সঙ্গীত সঙ্গীত রচনার এমন এক রূপবন্ধ যা স্বাধিকারে স্বতন্ত্র সঙ্গীত রূপে এবং দৃশ্যসংগতি ব্যতিরেকেই শ্রুতি এবং উপভোগ দাবি করতে পারে ?

রায় ॥ কোন কোন ফিল্মী সঙ্গীত এমন যে তা তার নান্দনিক গুণে স্বতন্ত্র স্বীকৃতির দাবি করতে পারে যেমন আইজেনষ্টাইন-চিত্রাবলীর জন্য প্রোকোফিয়েফের রচিত সঙ্গীত। ফিল্মী সঙ্গীত হল প্রায়োজনিক শিল্প এবং যতক্ষণ তা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে ততক্ষণ তা সার্থক, অর্থপূর্ণ সাঙ্গীতিক সৃষ্টি হিসাবে স্বাধীন সত্তা আছে কি নেই সে প্রশ্ন অবান্তর।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শোনা যায় যে, আজকালকার ছবিতে যখন-তখন খাম-খেয়ালীভাবে ধ্বনি (sound) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী ?

রায় ॥ এখানে ধ্বনি (sound) বলতে কী বোঝাচ্ছে বুঝতে পারছি না। এর মানে যদি সঙ্গীত হয় তাহলে বলব আধুনিক প্রবণতা হল ফিল্মে যত কম সঙ্গীত ব্যবহার করা। তার বদলে সমান পরিমাণে এফেক্টের ব্যবহার বাড়িয়ে সাউণ্ড ট্রাককে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। আমি অবশ্য মননশীল চলচ্চিত্রকারদের কথা বলছি—আজে-বাজেদের কথা নয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আপনার কি মনে হয় আধুনিক ইলেকট্রোনিক সঙ্গীত পদ্ধতি ফিল্মী সঙ্গীতের মান উন্নত করছে বা তার বিকাশে সাহায্য করছে ?

রায় ॥ ইলেকট্রোনিক সঙ্গীত এবং অন্যান্য কৃত্রিম সাঙ্গীতিক প্রক্রিয়া ফিল্মে ক্রমেই বেশী করে ব্যবহৃত হচ্ছে। টেপ-রেকর্ডারের বিভিন্ন গতির সাহায্যে উৎপন্ন যৌগিক সঙ্গীত আমি নিজেই ব্যবহার করেছি এবং অনেক সময় অসাঙ্গীতিক প্রকরণও ব্যবহার করেছি। চিড়িয়াখানার সমগ্র আবহ সঙ্গীত এইভাবে একটি মাত্রও সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত তৈরি করা হয়েছিল। পথের পাঁচালীর সময়েও উল্টো দিকে রেকর্ড চালিয়ে এবং অন্যভাবে সঙ্গীত রচনা করা হয়েছিল। একথা আগেও বলেছি আবারও বলছি—যা কিছু ছবির অভিঘাত সৃষ্টি করতে ও বাড়াতে সাহায্য করে তাই ব্যবহার করা অনুমোদিত।

বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য যন্ত্র পরিহার করে কি কেবল ভারতীয় যন্ত্রের উপর নির্ভর করে থাকতে পারি ?

রায় ॥ সঙ্গীত কোন জাতের হবে তা নির্ভর করে ছবির বক্তব্য বিষয় এবং পরিচালকের মনোভাবের উপরে। সাধারণভাবে বলতে পারি সমকালীন নাগরিক

পরিবেশের কোন ছবিতে সরোদ এবং সেতার বাজান বেমানান। আবার পথের পাঁচালী, জলসাঘর এবং দেবীতে ভারতীয় যন্ত্র নেবার উপরে আমি নিজেই জোর দিয়েছিলাম। চারুলতা, অভিযান এবং মহানগরে মিশ্র যন্ত্র নিয়েছিলাম। আবার কাপুরুষ, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতে বিশেষভাবে পাশ্চাত্য যন্ত্র নিয়েছিলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ফিল্মী সঙ্গীতের বাইরে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ বলে পরিচিত। ফিল্মের সঙ্গীতের রচনার জন্য এক স্বতন্ত্র ধরনের শিল্পপ্রবণতা প্রয়োজন। আপনার কি মনে হয় যে সব ওস্তাদ অন্যান্য বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বীকৃত শিল্পী তাদের পক্ষে ফিল্মী সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ প্রতিভার অপচয়?

রায়॥ একজন সুরকারের কার্যকর ফিল্মী সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। আমার মনে হয় না কোন ওস্তাদ এ জিনিস করতে পারবেন যতক্ষণ না ফিল্ম মাধ্যমটাকে তিনি পুরোপুরি বুঝে নিতে পারবেন যেমন সহজে তিনি বুঝতে পারেন তার সঙ্গীতকে।

বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সঙ্ অফ সিলোন ছবির সুরকার ওয়াল্টার লে বলেছেন যে, 'সুরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত সবরকম ধ্বনির যৌগিক ফলকে ট্র্যাকে ধরে রাখা। তিনি আরও বলেছেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়েও সাউণ্ড এফেক্ট সৃষ্টি করা সম্ভব। তার মতে সঙ্গীত যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করে তেমনিভাবে কোলাহলের জন্য কোলাহলকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বিকশিত করা দরকার। নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রেই সব চেয়ে সৃজনশীল অগ্রগতি এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ আবিষ্কার সম্ভব হবে'। ফিল্মী সঙ্গীতের সুরকার হিসেবে আপনিও কি এইরকম অনুভব করেন?

রায়॥ ওয়াল্টার লের সংগে আমিও একমত। আমার ধারণা বিষয়ের তীব্রতা সাধনে স্বাভাবিক ধ্বনিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী হল একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৭১

মূল সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছিল ইংরেজিতে। ভাষান্তরিত করেছেন হীরেন্দ্র চক্রবর্তী।

ঋত্বিক ঘটক-এর সঙ্গে অজয় বসু-র সাক্ষাৎকার

[ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। খুব সোজা কারণে। অধিকাংশ খ্যাত-অখ্যাত এমন কথা বলার প্রয়াসী যা বললে ভাল হয়; ঘটক এমন কথা বলেন যা বলতে তাঁর ভাল লাগে। তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগে ততটা কথার জন্যে নয় যতটা এই যা বলতে ভাল লাগে তাই বলার স্পর্ধার জন্যে। বলার এই ভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর ছবির মেজাজের অন্বয় আছে। তাঁর কথা শোনার সময় এবং তাঁর ছবি সম্পর্কে চিন্তা করার সময় একই আবহ সঙ্গীত খাটে। একথা সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সত্যজিৎ রায়ের মগ্ন ভঙ্গীতে বলা কথা শোনার কিংবা তাঁর ছবির সমালোচনা লেখার সময় দরকার মৃদু কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর কিংবা বীথোভেনের কিছু, ব্যথার কি আনন্দের যা মুহূর্তেই বোঝা যায় না; মৃণাল সেনের ক্ষেত্রে যে কোন ভাল সঙ্গীতই চলে যদি তার রেকর্ডে কোন খুঁত থাকে কিংবা থাকে আকস্মিক উঠে মিলিয়ে যাওয়া কোন কোলাহল। ঋত্বিক ঘটকের কথা কিংবা ছবির ক্ষেত্রে কোন সঙ্গীতের কথাই আমি ভাবতে পারি না, এখানে মানায় নিঃশব্দতাকে ভেঙে কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর কোন একাদিক্রমিক করাঘাত যা শেষ পর্যন্ত একটা প্যাটার্নে রূপ নেবেই। এবং সে কারণেই যেদিন তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হাজরা মোড়ে তখন ভাবতে পারলাম না কোন ড্রয়িংরুমের জন্যে অপেক্ষা করার কথা, ঢুকে পড়লাম সামনের এক পাঞ্জাবী রেস্টুরেন্টে—তাঁর চিন্তাভাবনার অংশীদার হতে কোন নোটিস দিতে হয় না, সবকিছুই এমন স্বতঃস্ফূর্ত।]

অজয় বসু : আপনি একাধিক ছবি একসঙ্গে করছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঋত্বিক ঘটক : আমার হাতে এখন তিনটি ছবি। একটি ঢাকায়—'তিতাস একটি নদীর নাম'। আর একটি কলকাতায়—'যুক্তি তর্ক ও গল্প'। আরও একটি দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে ; এটি character study ; documentary বলা ভুল। তিতাসের গল্পটা—অদ্বৈত মল্লবর্মণ যা বলবার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে—নদীর ধারে একটা জেলেদের সমাজ এবং সেই নদীটা আস্তে আস্তে শুকোতে শুকোতে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজটাও চুরমার হয়ে গেল। তার স্মৃতি বহন করছে শুধু একটি ব্যাপার—আশেপাশের গ্রামের লোক এখনও বলে যে এখানে তিতাস নামে নদী ছিল। অদ্বৈতবাবু এইখানে শেষ করা সত্ত্বেও আমি একটু টেনে ছেড়েছি। নদী আর নেই কিন্তু ধানের ক্ষেত রয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা সভ্যতা শেষ হয়ে যাওয়াটাই শেষ নয়। তার মৃত্যুর মধ্যেই উপ্ত আছে নতুন সভ্যতার বীজ। এভাবেই মানব জীবন-প্রবাহ চলে। বাবা ও ছেলের সম্পর্কের মত। 'যুক্তি তর্ক' সম্পূর্ণটাই ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে দিন রাত্রি বাস করে যে জীবন প্রবাহ আমি দেখেছি তার ওপর ভিত্তি করে। একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এ ছবিতে আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। এমন সব ঘটনা যা ঘটছে কিন্তু ঘটা উচিত নয়। এ অন্যায় এ পাপ। অবশ্য ব্যাপারটা নতুন নয়। সৎ শিল্পীরা সব সময়ই এই প্রতিবাদ করে আসছেন। প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস, এই দাসত্ব স্বীকার করে তবে সে ছবি করবে।

বসু : আপনার ছবিতে টেকনিককে আপনি কতখানি গুরুত্ব দেন ?

ঘটক : টেকনিকের নিজস্বতা নেই। আমরা মায়ের পেট থেকে পড়ি। তখন ভাষা জ্ঞান নেই। বয়স বাড়লে ভাষা শিখি, ব্যাকরণ শিখি। কেন ? আমাদের ভাবকে প্রকাশের জন্যে। ভাষার দাম নেই ; তার প্রকাশিত ভাব ভালবাসা ক্রোধের দাম। ভাষা শেখা সেসবকে তীব্রভাবে প্রকাশ করার জন্যে। সিনেমায়ও ব্যাপারটা তাই। যন্ত্রপাতি নিয়ে চলতে হয় তাই শিখতে হয়। টেকনিক-সর্বস্বরা জোচ্চোর। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি একটা কথা বলতে চাই—টেকনিক আপনা আপনি আসে। আগের ছবিতে কি টেকনিক

করেছি তা এখন আমার মাথায় নেই। পরে বলাটা intellectual ফাজলামি। Film is no mystery. এটা একটা ডাল ভাত। একটা ভোর দেখছি। কি লেন্স দরকার তা কি অঙ্ক কষে দেখি? মনে করি ভাল হবে তাই। হয়তো ভাল হবে; হয়তো নয়। ফিল্ম-এর কাগজগুলো গেড়োমিতে ভর্তি। পড়তে পারি না। আসলে ছবি করার সময় অন্য কোন শক্তি ঢোকে। তার প্রথমে থাকে আবেগ; আবেগ চালিত করে। সমস্ত ব্যাপারটা আবেগ থেকে আসে। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। এ হল ভেতর থেকে উৎসারিত। যে কোন শিল্পকর্ম সম্পর্কে এ কথা খাটে। লোকে গ্রহণ করুক অথবা না করুক। যেদিন দর্শকরা স্ক্রীন ছিঁড়ে দিল সেদিন থেকে চুল পাকতে শুরু হল। শিল্পী কি গাড়ী রেডিওগ্রাম বৌ-এর গহনার জন্যে ছবি করবে? সবচেয়ে বড় কথা চেষ্টা করা। হবে কি না জানি না। I can never say I shall succeed.

বসু: 'যুক্তি তর্ক' কি পলিটিকাল ছবি?

ঘটক: সম্পূর্ণভাবে। পলিটিকাল ছবি করা আসলে মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

বসু: সেন্সারে অসুবিধে হবে না?

ঘটক: Up to the end চেষ্টা করব। পলিটিক্স কি জীবনের বাইরে? ১৯২৮ সালে চ্যাপলিন মস্কোয় বলেছিলেন I am interested in man. Politics is a part of man. ফিল্ম apolitical—কোন শিল্পী একথা বলে না। কিন্তু প্রশ্নটাই রাজনীতিভিত্তিক। Schlessinger-এর মতে পলিটিক্স ছাড়া উচিত শিল্পীর--কিন্তু এটাই পলিটিকাল কথা।

বসু: পলিটিক্স এবং সেক্স—এ দুটো নিয়ে সেন্সরের সবচেয়ে ভাবনা। অকারণে সেক্স এও এক ধরণের পলিটিক্স।

ঘটক: Law of life বলে একটা জিনিস আছে। শিল্পের প্রয়োজনে নয়, পয়সার প্রয়োজনে যে সেক্স তা vulgar. বম্বের ছবিতে যেসব কাণ্ড হয় তার চেয়ে bare breast দেখানো ভাল।

[ওপরে যা লিখলাম তার চেয়ে বেশী কিছু ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন আমাকে। পল গগ্যাঁ, French Academy, সেরিনা, লিওনার্ডো ইত্যাদি নামগুলি এসেছিল শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে। কিন্তু সেদিন তার ভঙ্গী ছিল অস্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত—মন্তব্যগুলি জটিল; কথার জোয়ারে গেলাম ভেসে, ফলতঃ যা তৎক্ষণাৎ লিখিনি তা পরে আর লেখার সাহস করি নি, যেহেতু স্মৃতির স্বাভাবিক ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতা।

এর পরই ঋত্বিক ঘটক ছবির কাজে গেলেন বিদেশে—মানে ঢাকায়। ('ঢাকাটা একটা বিদেশ'—এক অচেনা ভঙ্গীতে বলেছিলেন পরে আমাকে)। ফিরে এলেন হাসপাতালে—বাংলা দেশের হাসপাতাল থেকে বাংলার হাসপাতালে। গেলাম।

এবং হাসপাতালের ঘরে পা রেখেই বোধ হল শেষ অবধি সাদৃশ্যই বুঝি সময়ের পরিমাপ। কিংবা বৈসাদৃশ্য। বোধ হল এক যুগ কেটে গেছে, কিংবা একাধিক। পাঞ্জাবী হোটেলের ঋত্বিক ঘটক ব্যাক-স্টেজ-এ, অন্য ঋত্বিক ঘটক যিনি তীব্র স্রোতের দীর্ঘ নদী পার হয়ে যেন কেবল তীরে উঠলেন, ক্লান্ত, শীর্ণ। বিছানার ওপর বসে আছেন, সোজা শিরদাঁড়া। অবিন্যস্ত বিছানা। লম্বা ঘর; ঝড়ে পড়ে যাওয়া ডালের মত কতকগুলি মানুষ শুয়ে আট দশটা বিছানায়, এক-জনের সামনে বেডপ্যান। জিজ্ঞাসা করলাম 'কেমন আছেন'? 'ভাল, ভাল হয়ে গেছি তবে এরা ছাড়ছে না'। মনে হল আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 'এখানে তো অবসর, লিখছেন কিছু script?' 'script? চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না। চারিদিক তাকিয়ে দেখুন। আমি আসার পর দুটো লোক পটল তুলল, প্রায় ঠ্যাং ধরে নিয়ে গেল, আর একটা লোকও তুলবে। আপনার পিছনে।' তাকালাম না, আগেই দেখেছি, বেডপ্যান সমেত লোকটি—নাটক শেষ হওয়া এবং পর্দা পুরোপুরি নামার মাঝে যে কয়েক মুহূর্ত সংজ্ঞার অতীত সময়—সেই সময়ের মধ্যে রয়েছে এই অভিনেতাটি। একটু থেমে বললেন, 'এর মধ্যে লেখা যায়?' জিজ্ঞাসা করলাম 'চিকিৎসা কেমন হচ্ছে?' 'খুব ভাল, চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই, ওষুধপত্রের অভাব নেই।' 'খাওয়া দাওয়া?' 'খাওয়া দাওয়া! খাবার যা দেয় ঋত্বিক ঘটক খেতে পারে না। অসম্ভব। পাশের ক্যান্টিনে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। দুদিন খেলাম। ওরা বিল পাঠালো বিয়াল্লিশ টাকার মত। সখ মিটে গেছে। এখন নিজেদের রান্না করা খাবার খাই। পাঁচ টাকার মধ্যে হয়ে যায়।' একটু থেমে বললেন 'ভাল হলে মাস চারেকের মধ্যে ছবি দুটোর কাজ শেষ করে মাস ছয়েক শুধু বিশ্রাম নেব, কলকাতার বাইরে আমার স্ত্রীর কর্মস্থলে।' আমি কি প্রশ্ন করতে পারি এরকম ক্ষেত্রে, কি উত্তর দিতে পারি—এ সময় নীরবতাই সবচেয়ে বাঙ্ময়। হঠাৎ মনে পড়ল তখন শেষ বিকেল, পশ্চিমের আকাশ বহুরঙা; ডোবার আগে সূর্য এত রঙ ছড়ায়।

এর কয়েক দিন বাদেই ঋত্বিক ঘটক মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে চলে এলেন.

পার্কসার্কাসের একটি ছোট হাসপাতালে। ছোট হাসপাতাল ভাল পরিবেশ। পরিচিত ডাক্তার। বেশ আশাপ্রদ পরিস্থিতি, একটা কবিতার ছন্দে মিলে যাওয়ার মত। তৃতীয় দিন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নেওয়ার শেষদিন সকাল সাড়ে আটটায় ঘরে ঢুকলাম, প্রথম প্রশ্ন করলাম নটায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কৌতূহল মেটাতে হল এই সময়ে। টেপ রেকর্ড করলাম সময় বাঁচাবার জন্যে।]

বসু: আপনি যে দুটি ছবি করছেন তাতে special কোন obstruction এসেছে কি?

ঘটক: obstruction তো সব ছবিতেই আছে। without obstruction কোন ছবি কোনদিন হয় নি। তিতাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম আর এটাও editing-এর মাঝখানে অসুস্থ হওয়াতে এটা গেল পিছিয়ে। So both of them are suffering.

বসু: আমি বলছিলাম যে, যে ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে আপনার ছবি দুটো তৈরী হয়েছে তা কি satisfactory?

ঘটক: কলকাতার ছবি সম্পর্কে—মানে যেটুকু হয়েছে—পরিপূর্ণভাবে satisfactory. কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারছি না ঢাকার ছবি সম্পর্কে। ঢাকার ছবি শেষে কি দাঁড়িয়েছে সে দেখার মত অবস্থা আমার ছিল না। আমি তখন হাসপাতালে। কাজেই তারা কি করেছে শেষ অবধি সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। I am not sure. আমার নিজের ধারণা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু generally speaking এতই নিম্নস্তরের ঢাকার ছবি যে তার দ্বারা influenced হয়ে আমি যে মহৎ ছবি করার চেষ্টা করেছিলাম সেটা একটা cheap ছবিতে পরিণত হওয়া খুব সোজা। কাজেই ছবি আমি না দেখে কিছু বলতে পারব না।

বসু: আচ্ছা direction তো আপনি দিয়েছেন······

ঘটক: Last shot নেওয়া হল বালির মধ্যে বেলা দুটোর সময়, তপ্ত বালির মধ্যে আমার হিরোইন মারা গেল। সেই শটটা নিলাম। ছবির last shot; সঙ্গে সঙ্গে বালির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

বসু: তার মানে ছবির তখন shooting complete······

ঘটক: Shooting complete.

বসু: শুধু technical side টা ওদের ওপর আছে······

ঘটক: Technical sideটা কি মশায়। (বেশ উত্তেজিতভাবে, বোঝা যায়

ক্রুদ্ধ হয়েছেন) Film is not built, film is made. আমি চিত্রপরিচালক নই আমি চিত্রস্রষ্টা। চিত্র সৃষ্টি করে একজন,—সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন—চিত্র সৃষ্টি করেন, তাঁরা চিত্রপরিচালক নন। অত্যন্ত ভুল এবং বাজে কথা আপনারা লেখেন। একজন সৃষ্টি করেন। একজন প্রণয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শকুন্তলা প্রণয়ন করেছিলেন, তিনি (তার) লেখক নন।

বসু : তার মানে হচ্ছে editing ইত্যাদি···

ঘটক : সেটাই হচ্ছে আসল প্রাণ।

বসু : সেটা ওদের ওপরে করার ভার আছে ?

ঘটক : তবে আমি বলছি কি ? (অসুস্থ হয়ে) বিছানায় শুয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি এর পরে এই কর, এর পরে এই কর। Rush-ও আমি দেখিনি ছবির শেষের দিকের। কিন্তু কলকাতার ছবিটা সম্পর্কে এইজন্য আমি একমত যে এর দশ আনা অংশের বেশী হয়ে গেছে। যতখানি হয়েছে ততখানি আমার নিজের পরিষ্কার তত্ত্বাবধানে, নিজে হাতে আমি কেটেছি, নিজে হাতে আমি কাটছি কাটব। কাজেই এখানে সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের কব্জার মধ্যে। ওখানে জিনিসটা আমার কব্জার মধ্যেই নয়। এখানে যা অসুবিধে তা হচ্ছে যে ওখানকার ছবিটার জন্যে দেরী, তার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে দেরী, plus টাকাকড়ির গণ্ডগোল আছে কিছু। দেখুন মশায় একশটা মেয়ের বিয়ে দিতে যা খাটতে হয় একটা ছবি করতে সেই খাটনি পড়ে। বাধা আসবেই। বিপত্তি আসবেই গণ্ডগোল হবেই। আপনারা সব ইতিহাস জানেন যে মারধোর না খেলে ছবি শেষ হয় না।

বসু : বাংলা দেশের ছবিটা আপনি সুস্থ হওয়া অবধি বন্ধ রাখা যায় না ? editing বা অন্যান্য কাজ।

ঘটক : তারা আসেন নি। ওদের একটা অসুবিধে আছে যে ওদের Foreign Exchange-এর ব্যাপার আছে—এটা বিদেশী ব্যাপার তো। ঢাকাটা একটা বিদেশ। আমি তাদের বলে এসেছিলাম এবং তারা promise করেছিল যে edit করতে হবে আমাকে। টাকা আমার চাইনে। তবে সেটা কলকাতায় ছাড়া হবে না, print কলকাতায় করতে হবে, ঢাকার কাজের চেয়ে কলকাতার কাজ অনেক ভাল। ভাল মানে দুটোর মধ্যে তুলনা হয় না। তাতে তারা বলেছে তাই করব। চেষ্টা করব। এই অবধি হয়ে আছে। তারপর তারা কোন যোগাযোগ করে নি। তারা বোধহয় ভাবছে যে তাদের তো ওখানে

এখন season off, প্রতিদিন সন্ধেবেলা ঝড়বৃষ্টি হয়। কাজেই সেখানে হলে লোক যায় না। ওরাও পুজোর জন্যে wait করছে। আর আমারও হাসপাতাল থেকে না বেরিয়ে কোন কথা বলার উপায় নেই। কাজেই তিন চার মাসের আগে কিছু হচ্ছে না।

বসু: আপনার মতে FFC-র লোন দেওয়ার নীতিটা কি হওয়া উচিত? অর্থাৎ নতুন পরিচালকেরা পাবে, না পুরনো পরিচালকেরা যারা ভাল ছবি করার টাকা পাচ্ছেন না?

ঘটক: মণি কাউল ছবি করেছেন, ছবিটা ভাল হয়েছে এবং সম্মান পেয়েছে। তাঁকে FFC টাকা না দিলে তিনি ছবি করতে পারতেন না। মৃণাল সেন নতুন ছেলে নন, কিন্তু মৃণাল সেন যদি FFC-র টাকা না পেতেন তাঁর 'ভুবন সোম' হত না। দেবী পুরনো লোক, 'দস্তক' ছবি তিনি করতে পারতেন না যদি FFC টাকা না দিত। সুতরাং নতুন director পুরনো director এসব foolish কথাবার্তা।

বসু: সুতরাং বড় কথা হচ্ছে···

ঘটক: বড় কথা হচ্ছে ভাল ছবির জন্যে যাকে দেওয়া উচিত তাকেই দেওয়া উচিত।—পুরনো director যদি ভাল script নিয়ে হাজির হয় নতুন director যদি ভাল script নিয়ে হাজির হয়। এখানে পুরনো নতুনের কোন ব্যাপারই নয়—ব্যাপার হচ্ছে এদেশে ভাল ছবির একটা আন্দোলন, একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া।

বসু: আচ্ছা, যে ভাবে আমাদের বাংলা দেশে ছবি distribute করা হচ্ছে বা produce করা হচ্ছে তাতে কি উন্নতি করা যেতে পারে। এটা ঠিক কি?

ঘটক: এটা খুবই বেঠিক। কিন্তু সেই বেঠিকটাকে আস্তে আস্তে ঠিক করার চেষ্টা চলছে। নানা রকম হচ্ছে টচ্ছে জানি না তার ফল কি দাঁড়াবে। Distributor কেউ না, আসলে ছবি control করে exhibitor-রা। চার পাঁচ বছর আগেও এরাই ছিল কর্তা। এরা বলত যে বাব্বা ফিল্মে টাকা দেব? এরা প্রথম টাকা পেত। কাঁচা টাকা। টাকা না পেলে লোকে ঢুকতে পেত না। কিন্তু ফিল্ম ব্যবসায় টাকা দেব না। আমাদের industryটা ছিল একটা চৌবাচ্চা, তার তলে ছ্যাঁদা। যত টাকাই ঢালুন তলার ছ্যাঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যায়। সুইজারল্যাণ্ডে ছেলের জন্যে বাড়ী করবে—বাবু,—হলের মালিক, ফিল্মে টাকা দেব ওরে বাবা মরে যাব না? তো এই যদি attitude হয় তারা যদি কব্জা করে সব

রক্তটা চুষে নেয় ; ফিল্মের glamour-এ যত রাজ্যের মেয়েছেলের গায়ে গা ঘষব এই তাল করে মাড়োয়ারী আসে, এসে heavy টাকা গচ্চা দিয়ে পালায়—এই করে একটা ভাল industry একটা ভদ্র জায়গা হতে পারে না। হয়ও নি। (এ হল) আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত। এখন ব্যাটারা বুঝেছে যে এ যা তারা করছে এটা suicide. এতে আমরাই মরব। এখন State Govt. কি সব করছে টরছে···

বসু : Film Development Board

ঘটক : কি সব করছে টরছে। কি হতে কি হবে আমি কিছু জানি না। আমি back dated. ওসব খবর আমি ভাল রাখি না।

বসু : বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় ?

ঘটক : খুব ভাল।

বসু : Artistically ?

ঘটক : খুব ভাল। এটা হচ্ছে ধাক্কার ব্যাপার। আবার বলছি ধাক্কার ব্যাপার। এখন যা দেখছি তাতে হতাশার শেষ চূড়ান্ত। কিন্তু হতাশ হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। চার পাঁচটা ভাল ছবি যদি বাংলা দেশ থেকে বেরোয় তাহলে নতুন ছেলেদের মধ্যে অনেকেই আছে আমি যাদের জানি তারা সাহস করে এগোবে। FFC যদি তাদের সাহায্য করে এবং যদি তারা তার উপযুক্ত হয়—হবেই আমার হতাশার কোন কারণ নেই।

বসু : হিন্দী ছবি অনেকে বলছে তৈরী করার কথা। তার চেয়ে কি dub· করা better না ?

ঘটক : না।

বসু : হিন্দী ছবি করাটাই better ?

ঘটক : সবসময়। ভাষার একটা নিজস্ব ধ্বনিমূল্য, সুর (থাকে)। একটা গ্রামের মহিলা তার ছেলেকে ডাকল, এ দইয়া দইয়া রে—এই যে সুর এই সুরে বাঙালী মা ছেলেকে ডাকবে না। এ সুরটা হচ্ছে ছবির প্রাণ—জমির থেকে শব্দটা আসছে, এ শব্দটা আপনি প্রত্যেক গ্রামে শুনেছেন। ধ্বনিমূল্যের একটা বিরাট প্রয়োজন আছে। আপনি হিন্দী ছবি করছেন তা বলে যে হিন্দুস্তানী হতে হবে তার কোন কথা নেই ; সঙ্গে একজনকে থাকতে হবে······আমি যদি হিন্দী ছবি করি সঙ্গে নিশ্চয়ই শিক্ষিত এবং ছবির সঙ্গে অবহিত, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে ধ্বনিমূল্য সম্পর্কে অবহিত এমন কাউকে সঙ্গে নেব।

বসু : সাধারণভাবে বাংলা ছবির এখন যে artistic standard সেটা···

ঘটক : এখন খুব নীচু স্তরের।

বসু : সেটাকে improve করার জন্য কি করা উচিৎ ?

ঘটক : FFCই এখন রাস্তা আর এই Film Dev. Board

বসু : FFCর লোন তো সকলে পাচ্ছে না···

ঘটক : পাচ্ছে না তো যারা পাচ্ছে না তারা deserve করে না। Tom Dick and Harry পাবে এমন কোন কথা নেই। Film Dev Board যদি সেভাবে টাকা যাকে তাকে দেয় তাহলে দুদিনে তো লাটে উঠে যাবে। পাচ্ছে না মানে কি। পৃথিবীতে সব্বাই artist হয় না। একলক্ষের মধ্যে একজন artist.

বসু : আচ্ছা আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে—আপনি বলছেন বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ ভাল—কিন্তু আপনারা দুতিনজন ছাড়া--নতুন কেউ ত তা হচ্ছেই না।

ঘটক : হচ্ছে না কারণ তাদেরকে আপনারা চেনেন না। আমি জানি India Lab-এ ঘুরে বেড়ায় অন্ততঃ আট দশটি ছেলে যারা কাজ পায় না তাদের মধ্যে অন্ততঃ দু তিনজন brilliant—script নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথায় করতে হবে কিভাবে করতে হবে—এক ; দু নম্বর হচ্ছে যে সাহস নেই। আশাবাদী কোন দিক থেকে আমি ? আমরা যে দু তিন জন—আমরা যদি সাহস আনতে পারি। লড়াই করতে হয়, কিন্তু শেষ অবধি যদি জেতা যায় এবং সত্যি সত্যি ভাল ছবি হয়—পয়সাও পাওয়া যায়। ওদের আসল কথা আমার প্রথম ছবি, জীবনের সেই ছবির জন্য ভয়।

বসু : ভয় করলে কি হবে ?

ঘটক : ভয়টা ভাঙবে কে ? leader ? আরে মশায় ভয় আপনি করছেন না। করুন না ছবি ? এসব পত্রিকা-টত্রিকা করছেন কেন ? ভয় ওসব থাকে। Career-এর প্রথম ছবি করব তারপর এমন মার খাব যে শালা পথের ভিখিরি হয়ে মুখে ফেনা উঠে রাস্তায় পাগল হয়ে মারা যাব—বৌ বাচ্চা নিয়ে টিবি হয়ে—এতো কেউ চায় না। এইখানে FFC বা Film Dev. Board যদি বুদ্ধিমানের মত সৎভাবে ভালোবেসে—যেটা FFC করছে এটা কলকাতায় যদি করে কেন হবে না ? আশাবাদী না তো কি আমি ? আমি তো আশাবাদী। কথা হচ্ছে সততা থাকা চাই যারা দিচ্ছে তাদের ভেতর। পচিশ লাখ টাকা বলে খালাস হলে তো হবে না।

বসু : Talent আমাদের আছে……

ঘটক : আছে। ব্যাপার হচ্ছে leadership-এর অভাব।

বসু : সুস্থ হওয়ার পর আপনার plans কি? এই ছবি দুটো শেষ হলে নতুন ছবি?

ঘটক : ছবি তো নিশ্চয়ই করতে হবে, ছবি না করলে খাব কি? তিন চার মাসের অবস্থা হবে এ দুটো ছবি release করলে। তারপর পেটের দায়ে আবার আসব কাজের চেষ্টায়। Ultimately money matters, nothing else matters. আমরা কাগজকলমের ব্যাপারেতে নেই—বিদেশী পরিচালকের কথা যে কাগজ কলমের মত সস্তা (যখন হবে)—ওসব ফাজলামির কথাবার্তা বলে লাভ নেই। আমার বাংলা ছবি করতে গেলে আড়াই লাখ খরচ হয়—হিন্দী ছবি করতে গেলে পাঁচ লাখ টাকা minimum. আমার পাঁচটা পয়সা নেই পকেটে শালা একটা বিড়ি খাওয়ার পয়সা নেই তা আমি কোত্থেকে টাকা পাব। কাজেই পয়সা অর্থ এসব লাগে। এগুলো avoid করে ওসব পাকামি করে—(লাভ নেই)। কাগজ কলমের ব্যাপার নয় এবং টাকা দুটাকা দিয়ে invest করলেই হয়ে গেল।

বসু : এ তো গেল সিনেমা সম্পর্কে। এখন কেমন মনে হচ্ছে, এখন তো সুস্থ? মনের দিক থেকে কিরকম মনে হচ্ছে।

ঘটক : মনে আমি খুব সুস্থ।

বসু : Script লিখছেন?

ঘটক : 'যুক্তি তর্কে'র script-টা revise করলাম পুরো।

বসু : আরও পাঁচ ছ দিন বাকী আছে?

ঘটক : না। দিন দশেক।

বসু : এখানকার পরিবেশ ভাল। Personal care আছে।

ঘটক : Personal care আছে। Homely—এখানে মাত্র তিনজন আছেন, বন্ধুত্ব করে থাকা যায়। ওখানে যা অবস্থা দেখেছেন তো আপনি।

বসু : Dr. Banerjee বলেছিলেন যে করে হোক সুস্থ করে তুলবই। আর অনেক improve-ও করেছেন।

ঘটক : না আমি মনের দিক দিয়ে সুস্থ আছি, স্ফূর্তিতে আছি, দেহের দিক থেকেও মোটামুটিভাবে সুস্থ আছি।—এরা অনেকখানি আমাকে সারিয়ে তুলেছে।

ঋত্বিক ঘটক আশাবাদী। আমিও আশাবাদী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি অচিরে সুস্থ হবেন, শুরু করবেন কোন স্পর্ধিত ছবি। ডাক্তাররা বলেন রোগটা বড় কি না সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল জীবনীশক্তি বড় কি না। তাঁর জীবনীশক্তি আকাশ ছোঁয়া, তাঁর কথার ভঙ্গী, তাঁর বসার ভঙ্গীই সেই শক্তির স্বাক্ষর। ঘরে ঢোকার সময় তার মুখে রক্তের দাগ দেখেছিলাম। বেরোবার সময় নেই—কিন্তু থাকলেও ক্ষতি হত না। কারো কারো রক্তে রক্তজবা জন্মায়, ঋত্বিক ঘটকের সেই রক্ত।

১৯৭৩

উৎপল দত্ত-র সঙ্গে প্রশান্ত দাঁ-র সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ নাটকীয় সংঘাতের পরিবর্তে রাজনৈতিক বক্তব্যই কি নাটককে নিয়ন্ত্রিত করবে ?

উত্তর ॥ আমি বলে থাকি সব নাটকই কোন না কোন অর্থে রাজনৈতিক। নাটকীয় সংঘাত নাটকের আভ্যন্তরীণ যুক্তি পরম্পরায় গড়ে ওঠে না, ওঠে প্রধানত নাট্যকারের ইচ্ছায়, ঝোঁকে, পক্ষপাতিত্বে। এবং এই ইচ্ছা, এই ঝোঁক নাট্যকারের রাজনীতি ও সমাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য।

প্রশ্ন ॥ শিল্পের জন্যেই শিল্প—আপনি কি এই মতের স্বপক্ষে ?

উত্তর ॥ নিশ্চয়ই না।

প্রশ্ন ॥ সামাজিক সচেতনতার ছাপ নাটকে থাকবে কি ?

উত্তর ॥ রাজনৈতিক চেতনা হচ্ছে সমাজচেতনার সর্বাগ্রসর স্তর। সমাজচেতনা তো থাকবেই, নইলে রাজনৈতিক বক্তব্য কি করে আসবে ?

প্রশ্ন ॥ অর্থ, জনপ্রিয়তা এবং জনমনে সৃজনশীল অনুরণন—এই তিনটির মধ্যে শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে কাম্য কোনটি ?

উত্তর ॥ অর্থের ব্যাপারটিকে মন থেকে দূর করে দিলে দেখা যাবে জনপ্রিয়তা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রতিমুহূর্তে নতুন সৃষ্টির দিকে এগোতে হবে, কিন্তু জনতাকে বাদ দিয়ে নয়। ভবিষ্যৎ আমাকে বুঝবে, এখনকার মানুষ বড় বোকা—এ দম্ভোক্তি নাট্যকারের মুখ থেকে বেরুতে পারে না। সে একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও সৃষ্টিশীল।

প্রশ্ন ॥ আজকের দিনের নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক - এঁরা একসময়ে অনেকেই ছিলেন ভারতীয় গণনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। আজ তাঁরা প্রত্যেকেই জনগণের জন্য কাজ করে চলেছেন। এ দাবী সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ॥ অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। রাজনৈতিক নাটকে হয়তো দু-একজনকে ছাড়া কাউকে দেখি না। কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তা তাঁরা ছড়িয়ে দিচ্ছেন জনতার মধ্যে। তাঁরা শ্রেষ্ঠ বিদেশী নাট্যকারের চিন্তাকে এনে দিচ্ছেন আমাদের জনগণের কাছে। তাঁরা কুসংস্কার ও পশ্চাদপদ ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়ছেন। তাঁরা ক্যাবারে অধ্যুষিত নাট্যজগতে সংগ্রামী বীর।

প্রশ্ন ॥ বস্তুতঃপক্ষে আজকের দিনের প্রতিটি নাট্যগোষ্ঠীরই দাবী হল যে তারাই একমাত্র সঠিক উপায়ে সার্থক নাটক উপস্থাপিত করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর ॥ একমাত্র সঠিক উপায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রশ্ন ॥ নাটককে প্রভাবিত করবে কোনটি—রাজনৈতিক বিষয়, না নাট্য আঙ্গিক ?

উত্তর ॥ দুটিই জরুরী। তবে বিষয়বস্তুই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুই আঙ্গিকের জন্ম দেয়। তাই বলে আবার আঙ্গিকের অনুশীলন পরিত্যাগ করে স্টেজে খুব খানিকটা ঝাণ্ডা নাড়ালেই নাটক হয় না।

প্রশ্ন ॥ গণআন্দোলনে নাটকের ভূমিকা কতটা ?

উত্তর ॥ গণআন্দোলনে জনতার মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নাটক চিরদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ডাবলিনের এ বি থিয়েটার, জার্মেনির পিসকাটর, চীনের লালফৌজের নাট্য সংস্থাগুলি—এরা বিপ্লবের মশালস্বরূপ। আমাদের দেশেও বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের সময়ে নাট্যশালা ও যাত্রা সমানে জনতাকে জাগিয়েছে, সাহস দিয়েছে, ঘৃণায় কঠোর করে তুলেছে। নীলদর্পণ থেকে আজকের পথনাটিকা পর্যন্ত এই ধারা বিস্তৃত।

প্রশ্ন ॥ নাটকে দর্শকের ভূমিকা কতটা ?

উত্তর ॥ দর্শকের বিচার শেষ পর্যন্ত সঠিক হয়ই, এ অভিজ্ঞতা বিশ্ব নাট্যশালার হয়েছে। কিছুদিন নতুনত্বের মোহে সে যদি শস্তা বা বর্জনীয়কে আদর করেও, অচিরেই সে টমাস ডেকারকে ছেড়ে শেকস্‌পিয়ারকে বরণ করেছে, গ্যোয়টেকে বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছে, প্রোলেটকুল্টকে বর্জন করে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে সাধুবাদ দিয়েছে। এদেশে বর্তমানে দর্শক এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি মধ্যবিত্ত দর্শকের চেয়ে শ্রমিক কৃষক দর্শকের কথাই বেশি করে বলছি। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে এই দর্শক ক্রমশ নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, এর প্রমাণ হল--যাত্রার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। এ মুহূর্ত পূর্বে কখনও এসেছে বলে জানি না। দর্শকই এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের বিচারক।

প্রশ্ন ॥ আপনার জীবনে সেরা অভিনয় কোন চরিত্রে ?

উত্তর ॥ মানুষের অধিকারে নাটকে লাবোভিটস্।

প্রশ্ন ॥ শেক্সপীয়রের কোন নাটক আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে ?

উত্তর ॥ টিমন অফ এথেনস্।

প্রশ্ন ॥ আপনার প্রিয় নাট্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী কে ?

উত্তর ॥ প্রিয় মঞ্চাভিনেত্রী : ফেলিসিটি কেণ্ডাল (লণ্ডন)

প্রিয় মঞ্চাভিনেতা : একেহার্ড শাল (বার্লিন)।

প্রশ্ন ॥ নাটক আপনার নেশা না পেশা ?

উত্তর ॥ পেশা এবং নেশা দুইই। পেশা বাদ দিয়ে বাবুগিরির নেশায় আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন ॥ আপনার 'হবি' কি এবং অবসর অতিবাহিত করেন কি করে?

উত্তর ॥ অবসর কাটাই বই পড়ে।

প্রশ্ন ॥ কোন বিদেশী নাটক আপনার কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয় এবং কেন?

উত্তর ॥ আধুনিক বিদেশী নাটকের মধ্যে বলা যায় রলফ্‌ হখুথ এক প্রতিনিধি। আজকের মহাভারত বলতে আমি ঐ নাটকটিকে বুঝি। আজকের কুরুক্ষেত্রের এমন বিশাল, জটিল, ক্রুদ্ধ চিত্রণ আর নেই বললেই চলে।

প্রশ্ন ॥ ইদানীং আপনার ঘন ঘন ফিল্মে নামা নিয়ে নানা রকম কানাঘুষা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তর ॥ ক্ষতিটা কি হচ্ছে? এর চেয়ে সেই অবস্থাই কি কাম্য যখন আমি বছরে চার পাঁচ দিনের বেশী ছবির কাজ পেতাম না, এবং স্ত্রী কন্যা সহ অর্ধাহারে থাকতাম?

প্রশ্ন ॥ প্রথম জীবনে কার দ্বারা নাটকে অনুপ্রাণিত হন?

উত্তর ॥ আমার প্রথম নাট্য শিক্ষক জেফ্রি কেণ্ডাল। আমি তাঁর পেশাদার দলে যোগ দিই ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে, তাঁদের কলকাতা সফরের সময়।

প্রশ্ন ॥ ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কার দ্বারা সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছেন?

উত্তর ॥ আমার স্ত্রী শোভা সেন।

প্রশ্ন ॥ আপনার নাট্যাভিনয়ে কারোর কোন প্রভাব আছে কি?

উত্তর ॥ প্রভাব অবশ্য রয়েছে। কেণ্ডালের কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বাকভঙ্গী ও বচনের তীব্রতা (harshness is sweeter and more real to me than melodious

prestitution with your voice—কেণ্ডালের কথা) আমাকে প্রভাবিত করেছে। মায়াকভস্কি থিয়েটারের (মস্কো) ঋষি অখলপকভের কিছু প্রভাব অবশ্য আছে।

প্রশ্ন ॥ পি, এল, টি ছাড়া অন্য কোন্ নাট্যগোষ্ঠীর নাটক আপনার ভাল লাগে এবং কেন? এবং কার অভিনয় ভাল লাগে?

উত্তর ॥ সম্প্রতিকালে ভাল লেগেছে চাক ভাঙ্গা মধু এবং মারীচ সংবাদ। আমার খুব ভাল লাগে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। আগে নান্দীকারে ছিলেন। এখন শিলিগুড়িবাসী। ওখানেই নাট্যগোষ্ঠী তৈরী করেছেন। শম্ভু মিত্র অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কণ্ঠস্বরের ওপর তাঁর বিরাট দখল। কণ্ঠস্বরের ওঠানামার কারুকার্যে, ভাবপ্রকাশে ও পরিবেশ সৃষ্টিতে অসাধারণ। কিন্তু আমার ধারণা, আজকের অভিনয় কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর নির্ভর নয়। আরও পেছনে চলে গেলে বলতে হয় নরেশ মিত্র ও প্রভাদেবীর কথা। আমার মনে হয় এঁদের কাছাকাছি এখনও কেউ যেতে পারেন নি। মায়া ঘোষের অভিনয় এক সময়ে খুব ভাল লাগত। বর্তমানে অন্য একজনকে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। শোভা সেনের অভিনয় অবশ্যই ভাল লাগে। স্ত্রী বলে অধিক বলতে সঙ্কোচবোধ করছি। বিয়ের আগেও ওর অভিনয় ভাল লাগত। শোভার মধ্যে প্রভাদেবীর প্রভাব অনেকখানি। কিন্তু পুরোপুরি নয়। কারণ শোভা গণনাট্য সঙ্ঘে শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের কাছে অনেকদিন হাতেনাতে শিখেছে। ফলে তারও একটা প্রভাব আছে। এবং ঐ উভয় ধারার সঙ্গে স্বকীয়তার সংমিশ্রণে শোভার অভিনয় জোরালো প্রাণবন্ত। শোভাকে প্রভাদেবীর যোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যায়। কল্লোলে মহারাষ্ট্রের শ্রমিক মা নীলদর্পণ বা নবান্নতে চাষীর বৌ দরিদ্র ভারতীয় রমণী প্রভৃতি চরিত্রে শোভা অনন্যা। থিয়েটার ওয়ার্কসপের বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনা ভাল। আরও অনেকে রয়েছেন যাঁদের অভিনয়ের কোন একটা বিশেষ দিক প্রশংসনীয়। কিন্তু অন্তরালে মূলগত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার অভাব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সজাগ পরিচালকের অভাব।

প্রশ্ন ॥ আপনার অভিনয়ের সাফল্য ও জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি কি?

উত্তর ॥ আমি জনতার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম থেকে সরে যাইনি। রোজকার বেঁচে থাকার লড়াই নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ মানুষের

বিক্ষোভ ক্রোধ সংগ্রাম আমার লেখা নাটক ও কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয় বলে জনসাধারণের ভাল লাগে। একাত্মতা জন্মায়। তাঁরা তাঁদের অনেক গোপন প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান বলে আমার নাটক তাঁদের ভাল লাগে। আঙ্গিকের দিক থেকেও নতুনত্বের খোরাক পায়। শিল্পক্ষুধা ত প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত জটিল চিন্তার দুর্বোধ্য বুননি আমার নাটকে নেই। সেইসব সফিসটিকেটেড নাটককে খারাপ বলছি না। তবে ঐ সব চিন্তা ও বুদ্ধির মারপ্যাচের তপস্যা তপোবনেই করা ভাল। সাধারণ মানুষের মাঝে তার স্থান অল্প। কলকাতার বাইরে কলকাতার দামী লেখকদের দামী অভিনয়ের ব্যর্থতার বোধকরি ভুরি ভুরি নজীর আছে। নিজের সম্পর্কে বলা বড় মুস্কিল। ছোট্ট একটি দৃষ্টান্তে সহজ করে বলি। ব্যারিকেড বিদেশী পরিবেশ ও পটভূমিতে লেখা। সাজ পোষাক ঘটনা সবই বিদেশী। তবুও ব্যারিকেড মানুস সাংঘাতিক নিয়েছে। তার একমাত্র কারণ তাদের জীবন যন্ত্রণার কথা আছে এই নাটকে। আসলে মানুষের সংগ্রামের কথা বলি বলেই বোধহয় আমার নাটক সাধারণের কাছে প্রিয়।

প্রশ্ন ॥ আপনার প্রিয় শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

উত্তর । চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া (জাপান)। মার্কিন কবি ডিলান টমাস ও হিউ রলস্টন-এর কবিতা ভাল লাগে। জেমস বলডুইন ও লরেন্স ড্যুরেলের উপন্যাস আমার খুব প্রিয়। চিত্রকলা ভাল লাগলেও ভক্ত নই বলে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। মার্গ সঙ্গীতের আমি অনুরাগী শ্রোতা। বেটোফেন আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে। ফৈয়াজ খান ও বিলায়েৎ খান আমার কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়।

প্রশ্ন । শিশির যুগের কাছে বর্তমান যুগের নাটক কতখানি ঋণী ?

উত্তর ॥ বিষয়বস্তুর দিক থেকে গিরিশ ঘোষ প্রবর্তিত ধারা এখনও অবিচ্ছিন্ন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ কোনো ছিন্নমূল নাটক নয়। আরও অনেক নাটক রয়েছে যেগুলোকে অনায়াসে বিংশ শতাব্দীর সেরা সিরিয়াস অ্যাভাণ্ট প্লেজ বলে চিহ্নিত করা যায়। শিশিরবাবু নিঃসন্দেহে একটা যুগ। অভিনয়ের উৎকর্ষে তাঁর নাম দীর্ঘদিন বাংলা নাটকের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তবে সে যুগে কণ্ঠস্বরের

ওঠা-নামায় অভিনেতারা সব কিছুর ভাব প্রকাশ করতেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামাই নাটকের শেষ কথা নয়। কণ্ঠস্বরকে ভাঙতে হবে। সেই ভাঙনের চেষ্টা দেখেছি পরবর্তীকালে গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যপ্রয়াসে।

প্রশ্ন॥ স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ-তিরিশ বছরের নাটক সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন কি ?

উত্তর॥ কিছু পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠী শিশির গিরিশের ঐতিহ্যকে নষ্ট করছে বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটকের জোয়ার ১৯৪৭ সালের পরেও আমাদের দেশের নাটকে ছিল। গণনাট্য আন্দোলনের গোড়ার দিকের নাটকে প্রগতিশীল কথাবার্তা ছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সেসব নাটকে কান্না হাহাকার ছিল (জবানবন্দী নবান্ন)। কিন্তু জোরালো প্রতিরোধের কথা ছিল না। এই সব নাটক ছিল আলোকবর্তিকার মত নিঃসন্দেহে। পরবর্তীকালের কিছু কিছু নাটকে দেখা যায় প্রত্যক্ষ বিপ্লবের সোচ্চার ধ্বনি।···

আঙ্গিকের দিক থেকে আমূল পরিবর্তনও এসেছে। যদিও আঙ্গিকের কোন মূলনীতি নেই। আর সত্যিকারের মঞ্চসজ্জা সুরু হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত পঁচিশ বছরে। নাটকে টোটালিটি অর্থাৎ সবগুলোকে ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ঐ পঁচিশ বছরে। মাঝখানে নকশাল বিদ্রোহের ফলে নাটক অনেকটা পেছু হটেছে। খুন জখম আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ প্রভৃতির ফলে একটা বিরাট কাপুরুষতা সাময়িকভাবে বিরাজ করছিল। এখন পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ বদলেছে। প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে।···

১৯৭৬

বাদল সরকার-এর সঙ্গে কাজল চক্রবর্তী-র সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ আপনার জন্ম সাল ?

উত্তর ॥ ১৫ জুলাই ১৯২৫। কলকাতায়।

প্রশ্ন ॥ পড়াশুনো ?

উত্তর ॥ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ক্যালকাটা একাডেমি। তারপর ক্লাস সিক্স থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল। ১৯৪১ সালে সায়েন্সে ম্যাট্রিকুলেশন। স্কটিশচার্চ কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। তারপর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গেছি। ১৯৪৭ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপর চাকরিতে ঢুকেছি। চাকরি করতে করতে Town Planning পড়েছি। Calcutta University Diploma পাশ করেছি ১৯৫২ সালে। তারপর Britain-এ London University-তে Town Planning-এ Diploma পেয়েছি। ১৯৫৭য় Diploma পাই Britain-এ।

প্রশ্ন ॥ আপনি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার অথচ আপনি কাজ করছেন সাহিত্যের

একটি কঠিনতম শাখা নিয়ে, নাটক। একদিকে সাহিত্য অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং—এই দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ে আপনার মধ্যে আগ্রহ জন্মাল কি ভাবে?

উত্তর॥ এ প্রশ্নটি আমি প্রায়ই পেয়ে থাকি। আমাদের দেশে কিংবা সারা দুনিয়ায় এরকম গাদা গাদা লোক আছে। প্রথমত আমি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার বলা থেকে একজন টাউন প্ল্যানার বলতে ভালোবাসি। ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভালো লাগত না বলে Town Planningটা পড়েছিলাম কষ্ট করে। চাকরি করতে করতে, তা এখানে কোন সুযোগ পেলাম না। সে যাই হোক সেটা অন্য ব্যাপার। সাহিত্যে কিংবা mechanical লাইনে আছেন অথচ Art Form-এ interested এমন বহুলোক রয়েছেন। যেমন আমারই একজন সহপাঠী ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল। তাতে করে কেন এই ধরনের প্রশ্ন আমাব কাছে বার বার আসে জানি না। বিশেষ করে রাজনীতিতে তো সবরকম পেশার লোকই থাকেন তাদের ক্ষেত্রে তো এই প্রশ্নটা ওঠে না।

প্রশ্ন॥ হয়ত এই প্রশ্নটি উঠত না যদি আপনি একজন মাঝারি ধরনের নাট্যকার হতেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে আপনার নাটকই বাংলা দেশের পাঠক/দর্শককে সব থেকে বেশী নাড়া দিয়েছিল। আপনার নাটকে, যে, সাহিত্য গুণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কিংবা 'সারারাত্তির', তা তো একসময় সকলকেই চমকিত করেছিল। এ কারণে স্বভাবত প্রশ্ন জাগে…

উত্তর॥ আমি খুব একটা Contradiction বোধ করিনি কোনদিনই। ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা হিসেবে নিয়েছিলাম। তবে Town Planningটা আমি খুবই ভালোবাসতাম। জীবনের অনেকগুলো বছর এর পিছনে দিয়েছি। নাটক লেখা, থিয়েটারের থেকেও অনেক বেশী ভালোবাসতাম। কিন্তু তখনও কোন Contradiction বোধ করিনি।

প্রশ্ন॥ আপনি প্রথম নাটক লেখেন কবে?

উত্তর॥ প্রথম নাটক লিখি ১৯৫৬ সালে। 'সলিউশান'। যদি প্রথম দিকের কতগুলো বাল্যকালীন প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া যায়। এটি একটি adaptation.

একটি বিদেশী সিনেমা দেখে ভালো লেগেছিল। কথাবার্ত্তাগুলো বুঝিনি। সিনেমাটা ভালো লেগেছিল তাই লিখেছিলাম। কথাবার্ত্তাগুলো আমার নিজের। একাঙ্ক। আর যদি Original নাটক বলেন, প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক, সেটা 'বড় পিসিমা'। সেটা London-এ থাকবার সময়ে লিখেছিলাম।

প্রশ্ন ॥ তারপর ?

উত্তর ॥ একটা কথা ব'লেনি, আপনি আরম্ভ করলেন নাটক লেখা দিয়ে। তার মানে আপনি ধরে নিচ্ছেন আমি একজন নাট্যকার। আমি নিজেকে আদৌ নাট্যকার হিসেবে মনে করি না। অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে নিজেকে নাট্যকার হিসেবে মনে করি না। আমি থিয়েটারের লোক গোড়া থেকেই। এই গোড়াটা অবশ্য আমার জীবনে একটু Late—এই শুরু হয়েছে। যেমন কলেজ কিংবা স্কুল জীবনে আমি কখনোই থিয়েটার করিনি। তার ধারে কাছেও যাইনি। কখনোই মনে হয়নি আমি থিয়েটার করব। কিন্তু আমি থিয়েটার করতে আরম্ভ করি অভিনয় দিয়েই। তারপর পরিচালনা। তারপর আমার যে ধরনেব অভিনয় ভালো লাগবে কিংবা পরিচালনা করতে ভালো লাগবে সেই ধরনের নাটক লেখার চেষ্টা শুরু করি। এই ভাবেই আমার নাট্যরচনার সূত্রপাত। সুতরাং প্রাথমিক ভাবে আমি থিয়েটার ম্যান যাকে বলে আর কি। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমার থিয়েটার Practiceটাতে বিশেষ ছেদ পড়েনি। সুতরাং আজও আমার নাট্যরচনাটাকে আমার প্রাথমিক কাজ বলে মনে করি না।

প্রশ্ন ॥ আপনার থিয়েটারের শুরু কোন সময়টা থেকে ?

উত্তর ॥ ৫২/৫৩ সাল থেকে বলা যায়। তখন আমি মাইথনে চাকরি করি। তা সেখানকার জীবনযাত্রা খুবই ডাল। সন্ধ্যেবেলা কিছু করার থাকত না। এই অবস্থায় সময় কাটাবার জন্য আমরা কয়েকজন প্রবাসী মিলে একটি থিয়েটারের গোষ্ঠী করি এই ভাবেই আমার থিয়েটারের সূত্রপাত।

প্রশ্ন ॥ খুব সিরিয়াস ভাবে কবে থেকে থিয়েটার করতে শুরু করলেন ?

উত্তর ॥ এটা ঠিক এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না। যদিও আমি থিয়েটার করিনি এবং খুব কম থিয়েটার দেখেছি। বিশেষ করে Public থিয়েটার যাকে বলে তাও আমি ছোটবেলায় কিংবা কৈশোরেও দেখিনি। সেই সময়কার থিয়েটারের যারা রথীমহারথী ছিলেন, যেমন শিশির ভাদুড়ী, তাঁর অভিনয়ও দেখি অনেক পরে যখন আমি চাকরি করি। তবে সেই সময় আমি খুব রেডিও'র নাটক শুনতাম। তখন নাটক হত তিন ঘণ্টার। লাউড স্পিকার বেরোবার আগে কানে head-phone লাগিয়ে। কারণ, বাড়ী থেকে থিয়েটার দেখার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ পেতাম না। এটা খানিকটা পারিবারিক পরিবেশ। সেই interest-টা ছিল খুব। হাতের কাছে যে নাটকই পেয়েছি পড়েছি। যা এখনো বাঙালীরা পড়তে চায় না। নাটককে এখনো বাঙালীরা সাহিত্য বলে মনে করে না। এটা আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি। কারণ, দেশ পত্রিকায় দু'বছর নাটক লিখেছিলাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম যে দেশ পত্রিকায় সাহিত্য কর্ম হিসেবে একটি List করা হয় তাতে গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা সবই আছে কিন্তু নাটকের কোন উল্লেখ নেই। এটা আমার কাছে খুব অর্থবহ বলে মনে হয়। কারণ, দেশ-এর মত পত্রিকাও নাটককে সাহিত্য বলে মনে করে না। এবং তাই নিয়ে কোন প্রতিবাদ হয়েছে বলেও দেখিনি। কিন্তু আমার স্কুল জীবনে আমি নাটকের বই পেলেই পড়তাম। হয়ত সেই interest আমার ছিল। তারপরে কিন্তু দু/একটা লেখার চেষ্টাও করেছি। আমার সমস্ত রকম সাহিত্য কর্মের মধ্যে নাটকই বেশী ভালো লাগত। নিরিবিলিতে মাঝে মধ্যে চেঁচিয়েই পড়তাম। আমি থিয়েটার/নাটকের জগত থেকে অনেক দূরে ছিলাম। কারণ, B. E. কলেজে পড়ার সময় কলেজে খুবই থিয়েটার হত। কিন্তু আমি কখনোই ওর ধারে কাছে যাইনি। কখনো কাউকে বলিও নি যে আমাকে একটা পার্ট দাও। আমার মনেই হয় নি যে এটা আমি করতে পারি।

প্রশ্ন ॥ কিন্তু আপনি যে একজন থিয়েটারের লোক হয়ে উঠলেন ?

উত্তর ॥ সেই প্রশ্নতেই আসছি। তখন আমি একটি বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িত ছিলাম। সেটাই আমার প্রাথমিক কাজ ছিল, অন্য সব কিছুই ছিল secondary কাজেই অন্য কিছু করার সময়ও ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না।

প্রশ্ন ॥ এই বিষয়টি কি রাজনীতি ?

উত্তর ॥ হ্যাঁ। তখন আমার অনেকটা সময় চলে যেত রাজনীতিতে। তখন ঠিকই করে ফেলেছিলাম রাজনীতি করব।

প্রশ্ন ॥ নিশ্চয়ই বামপন্থী ?

উত্তর ॥ সে আপনি যা খুশি ভেবে নিতে পারেন। তারপর কোন কারণে আমার উৎসাহ নষ্ট হয়। আর সেই কারণে আমার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক সৃষ্টি হয়, আর তখন এই কারণেই আমার মধ্যে পুরনো Interestটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ থিয়েটারের Interestটা আবার ফিরে আসে। তার মানে বলতে পারেন আমার মাইথনে থাকার সময়েই। আমার Interest একটা serious shape পেতে শুরু করে। মাইথনে আমার থিয়েটার গোষ্ঠীটাও প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। সেই সময়ে আমাদের থিয়েটারে মেয়েরাই মেয়েদের পার্টে অভিনয় করতে শুরু করেছিল। এই সময় থেকেই নাটক লেখার চেষ্টাটাও শুরু হল। তখন আমার comedy খুব ভাল লাগত। Straight comedy, কোন Satire কিংবা Farce নয়। এই ভাবেই থিয়েটারের যোগাযোগটা হতে শুরু করে। তারপরেই 'সলিউশান' আর 'বড় পিসিমা'।

তারপরে বছর তিনেকের জন্য বিদেশে যাই। ফিরে এসে আবার একটি গোষ্ঠী তৈরি করি 'চক্র' নামে। সেটা কিন্তু থিয়েটার গোষ্ঠী নয়। তার অনেক রকম Activity ছিল। কেউ গল্প বলত, আমি হয়ত Town Planning-এর উপর বলতাম। সপ্তাহের শেষে সবাই meet করে যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলতাম। এই সময় যেহেতু আমি কিছুটা Direction দিতে পারি অভিনয়ও করি সর্বোপরি দু'টো নাটক লিখেছি তাই আমার চক্র থেকে আমারই একটি নাটক 'শনিবার' অভিনয় করি। তার মানে গোড়ার দিকে আমার নাটক কিংবা থিয়েটারের হাতে খড়ি হয় 'চক্র' থেকেই। এই ভাবেই কিছুটা উৎসাহিত হই। যেহেতু Direction দেওয়ার জায়গা আছে অভিনয় করারও ইচ্ছে আছে তাই দু/একটা নাটক লেখার চেষ্টা করি। তারপর একটা সময় আসে নিজের কতগুলো কথা বলতে ইচ্ছে করে। শুধু হাসির নাটক রচনা করা নয়। তা সেগুলো বলতে গিয়ে দেখলাম একটা ভাষাই শিখেছি। নাটকের ভাষা। এই ভাবেই তখন

সেই চিন্তাটা বেরিয়ে আসে। এই ভাবেই 'এবং ইন্দ্রজিৎ'টা রচনা হয় ১৯৬৩ সালে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ হয়ত নাটকের রূপ ছিল। তবে আমি এটাকে নাটক বলে মনে করিনি। তখন দু'চারজন বন্ধুকে পড়িয়েছি মাত্র। আমি তখন কলকাতার দু/চারজন লোক যোগাড় করে থিয়েটার করবার চেষ্টা করছি। তবে আমিও 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রযোজনার কথা ভাবিনি। এটা দু'বছর আমার কাছেই ছিল। যাকে বলে Private piece of writing বলে আমি preserve করেছিলাম। তারপর আমার এক বন্ধু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন এক আসরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নাটকটা শুনেছিলেন। তখন আমি Nigeria ছিলাম। ওখানে চিঠি লিখে জানালেন উনি ওটা একটি পত্রিকায় ছাপাতে চান। তারপরে নাটকটি বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপরেই কতগুলো কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। ওটা নাটক হিসেবে গৃহীত হয়। তারপর শৌভনিক নাটকটির অভিনয় করে।

প্রশ্ন। আপনি এতবার বিদেশে গিয়েছেন এবং থেকেছেনও। তা আপনার ওখানেই পাকাপাকিভাবে থাকবার ইচ্ছা জাগেনি কখনো? কারণ আপনি বলছিলেন বিদেশেই আপনি Town planning-এর কিছুটা সুযোগ পেয়েছিলেন?

উত্তর। না। বিদেশেই পাকাপাকিভাবে থাকব এরকম ইচ্ছে আমার কখনোই হয়নি। সব সময়েই আমার মনে হয়েছে আমাকে কলকাতাতেই কাজ করতে হবে এবং কলকাতাতেই থাকতে হবে।

প্রশ্ন। আবার একটু নাটকের কথাতেই ফিরে আসছি। আচ্ছা আপনার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' পরে 'সারারাত্তির' এ দুটি নাটক বাংলা নাটকের পাঠক এবং দর্শকদের যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তারা ভাবতে শুরু করল যে আপনিই হয়ত বাংলা মৌলিক নাটকে এক অন্য গভীরতার সন্ধান এনে দেবেন। কিন্তু তারপর অনেকদিন অপেক্ষা করেও আপনার কাছ থেকে আর তেমন কোন নাটক পাওয়া গেল না। তারপরেই হয়ত আপনি নাট্যকারের তুলনায় অনেক বেশী থিয়েটার কর্মী হয়ে পড়লেন। তা বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্বের কথা কি স্বীকার করেন?

উত্তর। দেখুন আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমি নিজেকে নাট্যকারের

তুলনায় অনেক বেশী একজন থিয়েটার ম্যান হিসেবে ধরে নিই। তার মানে এই নয় যে আমি একসময়ে লিখতাম এবং একসময় লেখা থামিয়ে দিয়ে থিয়েটার শুরু করি। লেখা আমার থামেনি। আসলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কিংবা 'সারারাত্তির' অন্যজাতের লেখা নিঃসন্দেহে। তবে পরবর্তীকালে লেখা অন্য নাটকগুলো যেমন 'ভোমা'-র জাত ও আলাদা। একটা তফাৎ হয়েছে হয়ত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' হয়ত নাট্যসাহিত্য হয়েছে। আর অন্য নাটকগুলো পড়ার চেয়ে দেখলেই অনেক বেশী রস পাওয়া যায়। আসলে 'ভোমা' ধরনের নাটকগুলো থিয়েটারের প্রয়োজনেই লেখা। সেটায় আমি পরে আসছি। তবে আমি যেহেতু অন্য থিয়েটার শুরু করি তার জন্যও আমাকে এক ধরনের নাটক লিখতে শুরু করতে হয়। হয়ত তার জাতও আলাদা। তা অন্য form-এ থিয়েটার করার জন্য এক ধরনের নাটক আমাকে লিখতে হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি না যে নাটক লেখা বন্ধ হয়েছে। সেটা অন্য খাতে গেছে। আর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লেখার ফলে নাট্য-সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে কতটা ক্ষতি হয়েছে এ ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আর কোন দায়িত্বের কথাও ভাবি না।

প্রশ্ন ॥ আপনার Theatre-এর শুরু যখন সেই সময়কার থিয়েটার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর ॥ মুশকিল হচ্ছে আমিও তো অজ্ঞ। কারণ সেই সময় দেবার যা সুযোগ ছিল সেটা আমিও miss করেছি। তখন শিশির বাবুর অভিনয়টাই একমাত্র দেখেছিলাম। তাও প্রায় লজ্জায় পড়ে। কারণ মনে হল এই সময় অভিনয়টা না দেখলে হয়ত আর দেখতে পাব না। কারণ ওনার বয়সও হয়েছে, হয়ত আর কয়েকদিন বাদে মারা যাবেন। তাই তখন হুড়োহুড়ি করে ওনার মাইকেলটা দেখি। সধবার একাদশীও। অবশ্য তেমন ভাল হয়নি থিয়েটারটা। তারপরেই উনি মারা গেলেন। সেই সময়ের অন্য রথীমহারথীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যা হয় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। রেডিওর নাটকের মধ্য দিয়ে। সত্যিকারের নাটক দেখতে আরম্ভ করি বহুরূপী দিয়ে। কারণ যাকে তখন Group Theatre-এর আন্দোলন বলি তাতো বহুরূপী একাই করে গেছে সেই সময়ে। তখন কিন্তু বহুরূপীর Theatre-এ ভীড় হত না। Show-এর আগে গিয়ে সবচেয়ে সস্তাদামের টিকিটই পেতাম। 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'ছেঁড়া

'তার' এসব থেকেই আমার থিয়েটার দেখার আরম্ভ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ॥ সেই সময়ে তো একটা গণনাট্যের ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ I. P. T. A এর প্রায় দু'একবছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা আপনি এই I. P. T. A.-এর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি কিংবা এদের কাজকর্মের দ্বারা Influenced হয়েছিলেন কি ?

উত্তর ॥ বলা হয় 'নবান্ন'টা Landmark কিন্তু আমার নবান্নটাই দেখা হয়নি। মিস করেছি। সত্যিকথা বলতে কি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সত্যিকারের যে রকমটি ছিল সেটা ছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বেই। '৪৬/'৪৭ সালে। এদের দুটি প্রযোজনা—'Spirit of India', 'India Immortal' দুটোই আমি দেখেছি। আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে দুটো কিন্তু থিয়েটার নয়, গান বাজনা নৃত্যনাট্য ধরনের। তারপরে মানে স্বাধীনতার কিছু পরে Central I. P. T. A.টা ভেঙ্গে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং তারপরে সেই দলে যারা ছিলেন তারাই আজকের Group Theatre-এর সূত্রপাত করেন। তাদের মধ্যে বহুরূপী অগ্রগণ্য। কাজেই ভারতীয় গণনাট্যের থিয়েটার একথাটা ঠিক নয়। কারণ, তারপর থেকে আমি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা একটাও শুনিনি। এখনো শোনা যায় না। কিন্তু Group Theatreগুলোর শোনা যায়। তবে Group Theatreগুলোর যারা পুরোধা ওরা এই সংঘের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু একথাটা বলা ভুল হবে ওদের নাটক। আমি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত ছিলাম না। দ্বিতীয়তঃ ওদের যে দুটো প্রযোজনা দেখেছি সেগুলো আমার নাট্যকর্মের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনেও হয় না।

প্রশ্ন ॥ তার মানে তখন আই. পি. টি. এ-র বাইরে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দল বহুরূপী। I. P. T. A. তো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই থিয়েটার করত। বহুরূপী কিংবা অন্যান্য নাট্যদলগুলোর নাটক দেখেও কি আপনার তাই মনে হয়েছে ?

উত্তর ॥ ভীষণ ভাবেই মনে হত। দু-একটি নাটক বাদ দিলে অন্যান্য সব কটির

মধ্য দিয়েই হয় কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নয়তো কোন সামাজিক দায়িত্বের কথাই বলা হত। এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক চেতনার কথাই বলার চেষ্টা করেছে বহুরূপী। যার জন্য কিছু কট্টর রবীন্দ্রপন্থীকে বলতেও শোনা গিয়েছিল 'রক্তকরবী'কে একেবারে রাজনৈতিক নাটক করে ছেড়েছে। তারপর Doll's House, আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট relevant. বহুরূপীর পরে Group Theatreয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপার আরো জোরদার ভাবে শুরু হল 'নান্দীকার'কে দিয়ে। সেটা হচ্ছে পঞ্চাশের শেষে এবং ষাট দশকের গোড়ার দিকে। Group Theatre-এর সত্যিকারের আন্দোলনটা শুরু হল এই সময়টা থেকেই, কারণ, এই সময় থেকেই অনেকগুলো দল একসঙ্গে নিজ নিজ দলের মাধ্যমে কাজ শুরু করল।

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, এই সময়ে কি আপনার নাটক করা শুরু হয়ে গেছে কলকাতায় ?

উত্তর ॥ মোটামুটি শুরু হয়েছে বলা যায়, তবে খুবই এ্যামেচারিশ ভাবে. যেটা বললাম। Adhoc পদ্ধতিতে। মানে কি রকম জানেন কিছু বন্ধু-বান্ধব মিলে একটি নাটক রেডি করলাম। সেটার হয়ত একটাই অভিনয় হল। তখন একটা Group-এর নাম দিলাম। সেই Group-টা হয়ত অভিনয়ের পরেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। তারপর আবার একটা Group-এর নাম দিয়ে একটা নাটক করলাম, এইরকম আর কি।

প্রশ্ন ॥ তো আপনার বর্তমান দল 'শতাব্দী' জন্মায় কোন সালে ?

উত্তর ॥ শতাব্দী জন্মায় ১৯৬৭ সালে। আসলে আমি যখন Nigeria-য় ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমি এখন যথেষ্ট থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে গেছি। এখন আমার নিয়মিত থিয়েটারের কাজ করবে এমন একটি গোষ্ঠীর প্রয়োজন। মাঝে মাঝে থিয়েটার আর নয়, নিয়মিত থিয়েটার করতে হবে। কিন্তু ঠিক তখনই এই নাট্যগোষ্ঠীর বিশেষ philosophy কি থাকবে ঠিক করিনি। আমি আগেই বলেছি আমার হাসির নাটক ভালো লাগে। তবে এক্ষেত্রে এটা ভেবে নিয়েছিলাম যে আমার যে নাটকগুলো অন্য দলগুলো করছে সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য নাটক করব। যেমন তখন বহুরূপী 'বাকী ইতিহাস' করছিল আমরা

তখন সেটা করার চেষ্টা করিনি। তখন যেহেতু 'সারারাত্তির' কোন দল করছিল না সেটা করার চেষ্টা করেছি, ক্ষমতার কথা ভাবিনি।

প্রশ্ন ॥ তখন কি আপনি Stage-এই theatre করতেন, মানে Proscenium Theatre-এর সব কটি components-এর help নিয়েই করতেন? set, light, music, make up.

উত্তর ॥ হ্যাঁ, এই সব কটির help নিয়েই করেছি তবে শতাব্দীর প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল যত কম খরচে theatre করা যায়। আর আমাদের proscenium যুগেও শতাব্দীতে একটি অলিখিত নিয়ম ছিল যে কোন নতুন প্রযোজনার ক্ষেত্রে set, make up, props সব মিলিয়ে ১০০ টাকার বেশী খরচ করব না। এবং পরপর চার-পাঁচটা production-এ আমরা গড় পড়তায় ১০০ টাকার বেশী খরচ করিনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল আমরা যখন এর থেকে set-এ বেশী খরচা করে প্রযোজনা করেছি তখন আমাদের theatre-এর সমালোচনায় set সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু যখন কম খরচে theatre করলাম, set-এর পরিবর্তে আমাদের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, তার ফলে দেখলাম set সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা হচ্ছে। তার মানে আমাদের নাটকে ওরা কিছু কিছু অভিনবত্বের আস্বাদ পেয়েছে। কারণ, 'বল্লভপুরের রূপকথা' নাটকে পুরনো আমলের জমিদারের বাড়ীর set সাজাতে আমাদের খরচা হয়েছিল সর্বমোট পঁচাত্তর টাকা।

প্রশ্ন ॥ কত বছর আপনি এইভাবে Proscenium থিয়েটারে নাটক করেন?

উত্তর ॥ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি বলতে পারেন। তবে '৭২ শেষ থেকে '৭৩ মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের Overlapping period চলে। '৭২ শেষ থেকেই যাকে আমরা অঙ্গনমঞ্চ বলি সেটা আরম্ভ হয়ে যায়। মাস ছয়েক এই দু'ধরনের থিয়েটারই চলে। তারপরেই resolution করে আমি Proscenium Theatre ছেড়েদি। তখন দলটাও ভেঙ্গে যায় কারণ অনেকেই Proscenium Theatre ছাড়তে রাজী হল না এবং দল ছেড়ে চলে গেল। আবার নতুন করেই শতাব্দীর কাজ শুরু হয় বলতে পারেন।

প্রশ্ন ॥ Proscenium Theatre-এ থাকাকালীন আপনি কি কি নাটক করেছেন ?

উত্তর ॥ বেশীর ভাগই comedy নাটক। যেমন 'রাম শ্যাম যদু', 'বড় পিসিমা', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'কবি কাহিনী,' 'শনিবার', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'বাঘ'-এগুলো তো আমারই লেখা। অন্যের লেখা নাটকও করেছি। Serious. 'থানা থেকে আসছি,' 'আবু হোসেন', 'সাগিনা মাহাতো'।

প্রশ্ন ॥ Proscenium Theatre-এর পরে যখন অন্য থিয়েটার শুরু করলেন তখন নাটক সিলেকশানও কি পাল্টাতে শুরু করল ?

উত্তর ॥ হ্যাঁ পাল্টেছে। তবে Proscenium Theatre-এর জন্য লেখা নাটকও আমি এই অঙ্গনমঞ্চের form-এ করেছি। যেমন 'সাগিনা মাহাতো', 'শেষ নেই'। তবে এই থিয়েটারের কথা মাথায় রেখে আমি প্রথম নাটক লিখি 'স্পার্টাকুস'। তবে এই form-এ প্রথম প্রযোজনা 'সাগিনা মাহাতো।' 'এবং ইন্দ্রজিৎ'ও আমরা অঙ্গনমঞ্চ form-এ করেছি।

প্রশ্ন ॥ তা হঠাৎ কেন মনে হল যে আপনি Proscenium Theatre ছেড়ে এই অঙ্গনমঞ্চ form-এ theatre করবেন ?

উত্তর ॥ প্রথম কথা কোন কিছুই হঠাৎ হয় না। অনেকদিন ধরেই মাথার পিছনে চিন্তাটা থাকে। এই ধরনের form অর্থাৎ theatre in the round প্রথমে আমাকে আকৃষ্ট করে ১৯৫৮ সালে। বিদেশে দেখা। তারপর আমার মাথা থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ বিদেশে কোথায় দেখেছিলেন ? নাটকটির নাম নির্দেশকের নাম যদি বলেন ?

উত্তর ॥ London-এ দেখেছিলাম। কোন্ দলের আমি জানি না। নির্দেশকের নাম অভিনেতাদের নাম কিছুই আমার মনে নেই। শুধু নাটকটির নাম মনে

আছে। Rucin-এর লেখা একটি ফরাসী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ। নাটকটির নাম—'ফিদ্রা'। ওটা দেখেই আমার ভেতরের সুপ্ত চিন্তাটার সঙ্গে কিরকম যে একটা যোগাযোগ অনুভব করি। এই আঙ্গিক আমাকে খুব effect করে কিন্তু তারপরেও চক্র এবং শতাব্দীতে theatre করেছি। কিন্তু আমার মাথায় কিছুই আসেনি। Back of the mind-এ থেকে গেছে আর কি। তারপরে মাঝে মধ্যে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারপর experimental way-তে 'সাগিনা মাহাতো' নাটকটি ঐভাবে করলাম। এবং দেখেই আমার মনে হল এইটাই আমি করতে চাই।

প্রশ্ন ॥ কেন করতে চান ?

উত্তর ॥ এই কেনটার দুটো কারণ দুদিক থেকে আসছে। প্রাথমিক ভাবে এসেছে communication-এর কারণে। এই যে Theatre আর Cinema এই দুটোর আবহাওয়াতে আমরা মানুষ এবং আমরা যারা Group Theatre করি তারা এই Cinema-কে একটু ঈর্ষার চোখেই দেখেছি। ঈর্ষার সঙ্গে consent'ও আছে যে ঐখানে সবলোক যাচ্ছে theatre-এ আসছে না। অথচ থিয়েটারে আমরা অনেক ভালো কথা বলছি। কাজের কথাও বলার চেষ্টা করছি অথচ লোক আসছে না। চলে যাচ্ছে। তখন একটা হীনমন্যতা আসে। তবে কি cinema-টা অনেক strong art medium, নাটকটা কি সেই তুলনায় অনেক দুর্বল। এই হীনমন্যতা ছাড়িয়ে যখন একটু ভিতরে ঢোকা যায় তখন খোঁজবার চেষ্টা করা হয় যে theatre-এ কি এমন বিশেষত্ব আছে যা cinema নকল করতে পারবে না। সেই বিশেষত্ব খুঁজতে গেলেই দেখা যায় যে theatre হচ্ছে লাইভ show। অর্থাৎ জীবন্ত অভিনেতা, জীবন্ত দর্শক একদিনে একসময়ে এক জায়গায় উপস্থিত না থাকলে theatre নামক ঘটনাটি ঘটে না, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এখানে সম্ভব। তা প্রত্যক্ষ যোগাযোগটাই হচ্ছে থিয়েটারের strength যা cinema নকল করতে পারবে না। তাদের ছবি দেখাতে হবে। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হবে না। তাহলে থিয়েটারে এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগটা করে দিতে হবে। দর্শকদের আর অভিনেতাদের আরো কাছাকাছি যাওয়া উচিৎ। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি Proscenium Theatre-টাকে দেখা যায় তাহলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে ওখানে দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে যোগাযোগে অনেকগুলো

বাধা। দুরত্বের বাধা আছে। সবাই একদিকে বসছে বলে যারা Last row-তে বসছে অনেকটা দূরে পড়ে যাচ্ছে। চারপাশে বসলে একই সংখ্যক দর্শককে Last row অনেক কাছে চলে আসত। Level-এর বাধা। Stage-টা উঁচুতে, ওরা নীচুতে। সব চাইতে বড় বাধা আলো আর অন্ধকারে। দর্শকদের অন্ধকারে রেখে যেন অভিনেতারা দর্শকদের উপস্থিতিটাকেই অগ্রাহ্য করছে। তার মানে থিয়েটার সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে পরিপন্থী হয়ে দেখা দিচ্ছে। কাজেই তখন প্রয়োজন হয় দর্শকদের আরো কাছাকাছি নেমে আসা। Sharing the same space, একই space দর্শক আর অভিনেতার ভাগাভাগি করে নেওয়া, দর্শকরা অভিনেতাদের দেখবে অভিনেতারাও দর্শকদের দেখবে দর্শকরা অন্য দর্শকদের দেখবে। এই ভাবেই একটা feed back পাওয়া যাবে। একটা অন্য ধরনের নাট্যচর্চা বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে আর একটা কথা আসে—এইভাবে থিয়েটারটা যখন অল্প অল্প করে করছি তখন আমার যে পুরনো Interest-টা ছিল যার সঙ্গে অনেকটাই আমি যুক্ত ছিলাম তা হয়ত অনেকটাই Frustration-এর জন্যেই ততদিন চাপা ছিল সেটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে—রাজনীতির কথাটা। থিয়েটার করা, সেখানেও প্রশ্ন আসে যে আমি যদি Proscenium Theatre-এ আটকে থাকি তবে তো এটা flexible কিংবা portable থিয়েটার হয় না। তাহলে তো free থিয়েটার—এটাকে করা যায় না। এই অবর্জনীয়তাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, খরচটাও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। Proscenium Theatre করার সময়েও ঝোঁকটা ছিল খরচ কমাবার যাতে সাধারণ লোক theatre দেখতে পারে। এখন একেবারে free theatre করার ঝোঁকটা এসেছে। এখনই ছুটো গিয়ে একজায়গায় meet করছে। যে form-টা আমরা নিলাম তাতে একদিকে আমরা কাঁধে একটা bag ঝুলিয়ে যে কোন জায়গায় চলে যাই। কোথাও পৌঁছে আমাদের মাল বওয়ার জন্য কুলির প্রয়োজন হয় না। থিয়েটারের কথা পরে হবে, জীবনেই এই দায়বদ্ধতাটা আছে। এটা আমি বিশ্বাস করি। থিয়েটারে যদি না প্রকাশ পেয়েও থাকে তার মানে এটা ধরে নেওয়া ঠিক না যে আমার জীবনেও এই দায়বদ্ধতা আমি অনুভব করিনি। অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যা প্রকাশ পায় তা দিয়ে পুরো মানুষটাকে বিচার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে এমন হয় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই বলে প্রকাশ পায় নি। পরে যখন ক্ষমতা অর্জন করেছে তখন হয়ত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে একমাত্র প্রকাশটাইতো জানা যাচ্ছে যা প্রকাশিত হল না তা তারা

জানতে পারছে না বা জানারও কথা নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে একটা সময় দায়বদ্ধতা আছে একটা সময়ে নেই। কিন্তু মানুষের জীবনতো এই রকম mechanically চলে না। কাজেই হঠাৎ কিছুই ঘটে না। ভিতরে থাকে তারপর আস্তে আস্তে ঘটতে থাকে। এখন যেটা দাঁড়িয়েছে "শতাব্দী" গোষ্ঠী কিন্তু খুব গভীরভাবে কমিটেড। আমাদের নাট্যগোষ্ঠীর বহিঃপ্রকাশ আর অন্য একটি নাট্যগোষ্ঠীর কমিটমেন্টের বহিঃপ্রকাশ এক নয়। সেটা যে যার মতো করবে। হয়ত কোন কোন গোষ্ঠী বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কমিটমেন্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে তাদের policy-র মত করেই কমিটমেণ্ট প্রকাশ করছে। আবার কেউ হয়ত তাদের সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা তাদের নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করছে।

প্রশ্ন ॥ এখন তো অনেকেই বলছে এই third theatre-এর সঙ্গে যাত্রার বেশ একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কিংবা যাত্রা অনেক আগে থেকেই third theatre-এর মতনই কথা বলতে শুরু করেছে। এ-বিষয়ে যদি একটু আলোচনা করেন ?

উত্তর ॥ এই প্রশ্নটা থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে। যেখানে সাধারণ ভাবে আমাদের গোষ্ঠী কিংবা third theatre-কে বুঝতে ভুল হয়। কারণ third theatre আমার কাছে কোন form-এর ব্যাপার নয়, আমার গোষ্ঠী 'শতাব্দী'র কাছেও নয়। আমার কাছে—third theatre একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি। যে কথাগুলো আমরা বলতে চাইছি সেটাই আমাদের প্রাথমিক, সেখান থেকেই সব কিছুই শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ content থেকেই সব কিছু শুরু হচ্ছে। আমরা কোন form-এর কাছে কমিটেড নই। কোন form-কে point 'A' থেকে point 'B'-তে নিয়ে যাবার কোন দায় আমাদের নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে আমরা কি কথা বলতে চাইছি কার কাছে বলতে চাইছি তা থেকেই আসছি কোন form-টা সব চাইতে বেশী কার্যকর হবে এবং তীব্র হবে। তার জন্যই আমরা এই form-টায় এসেছি যেটাকে থার্ড থিয়েটার বলছি। যাত্রার সঙ্গে আমাদের একমাত্র মিল ওদের মতো আমাদের দর্শকরাও চারদিকে বসে। মিল নেই আমরা মিল রাখতে চাইনি তফাৎ করতে চেয়েছি তা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু আমার আগের কথা থেকেই বোঝা যায়। নইলে বুঝতে হবে

আমি form-এ interested। যাত্রা থেকে একটা আলাদা form তৈরি করব তা কিন্তু নয়। আমি যদি মনে করতাম যাত্রা দিয়েই আমার কাজ হবে আমি যাত্রাই করতাম। কিন্তু যাত্রা দিয়ে আমার কথাগুলো বলা যাবে না বলেই যাত্রা করিনি। ঠিক যে কারণে প্রসিনিয়াম থিয়েটার ছেড়েছি। সেখানে যাত্রার সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের মিল আছে কি নেই তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের কাছে বক্তব্য প্রকাশটাই আসল সেখানে formটা secondary.

প্রশ্ন॥ আপনি যে অঙ্গনমঞ্চের কথা বলছেন, সেই formএ অভিনয়ের জন্য কি বিশেষ ধরনের নাটক দরকার নাকি সব ধরনের নাটকেরই অভিনয় এখানে সম্ভব?

উত্তর॥ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সব ধরনেরই নাটকের অভিনয় এতে করা যায়। যেমন শুরুরদিকে আমরা 'আবু হোসেন' নাটকটির অভিনয় এই অঙ্গনমঞ্চ formএ করি। এই নাটকটি দর্শকদের মতে ভীষণ ভাবে প্রসিনিয়াম থিয়েটারে মঞ্চসফল নাটক। কিন্তু এই নাটকটি যখন আমরা অঙ্গনমঞ্চে করি তখন আমাদের কখনোই মনে হয়নি form পাল্টাবার ফলে কিছু miss করছি কিংবা দর্শকরাও দেখলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের অভিনয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যখন এই formএ থিয়েটার করছি তখন এই form-এর যে শক্তিটা আছে সেটা তো আমি ব্যবহার করব। আর তাই তখন এই form-এর জন্য নাটক লেখা শুরু হয়ে যাবে। আর তখন এই অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা নাটকটি প্রসিনিয়াম থিয়েটারে অভিনয় করলে অনেকটা অঙ্গহানি ঘটবে। যেমন ধরুন, 'স্পার্টাকুস' নাটকটি যখন আমরা অঙ্গনমঞ্চে করি—নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অভিনেতারা দর্শকদের কানে কানে কথা বলে তারপর সেই কথাটা কোরাসে উঠে যায়। এই dimensionটা কিন্তু প্রসিনিয়াম থিয়েটারে করলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। 'মিছিল' নাটকটার শেষে একটি জায়গায় আমরা দর্শকদের দিকে হাত বাড়িয়ে ওদেরকে ডাকি তারপর একটি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে যাই। তা মিছিলের অন্তত ১৫০টি show হয়েছে এখন পর্যন্ত তো এমন একটি দিনও আমরা দেখিনি যেদিন দর্শকরা জায়গা থেকে উঠে আমাদের সঙ্গে আসেনি। এই dimensionটা কিন্তু প্রসিনিয়াম থিয়েটারে সম্ভব না। তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ'ও আমরা এই formএ অভিনয় করে দেখেছি—নাটকের শুরুটায়

লেখক যখন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ডাকতে থাকে এবং কয়েকজনকে বাদ দিয়ে একজনকে ডেকে নেয়, তার মানে আমাদের অভিনেতা তাদের মধ্যেই বসে থাকে —ঐরকম দেরী করে ঢোকা বা অন্য কোন stunt নয়—এবং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যখন প্রথমজনকে তুলে নেওয়া হল ও তারপরে যখন দর্শকদের চোখের দিকে তাকাচ্ছি, তারা জানেন যে তাদের ডাকা হচ্ছে না, তবু দেখেছি যে চোখে চোখ পড়লে অস্বস্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। তাতে এমন একটা personalised ব্যাপার আসে যেটা কিছুতেই প্রসিনিয়াম থিয়েটারে আসবে না, অথচ 'এবং ইন্দ্রজিৎ' কিন্তু প্রসিনিয়ামের জন্যই লেখা।

প্রশ্ন ॥ তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনি যখন অঙ্গনমঞ্চ শুরু করেননি তখন থেকেই আপনার মনের কোন গভীরতম জায়গায় এই form-এর কথাটা ছিল, নইলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের শুরুটা এই রকম হল কেন?

উত্তর ॥ আমি তো বহুদিন ধরেই বলছি থিয়েটার যারা seriously করছেন তাদের এই ভাবনাচিন্তাগুলো আসতে বাধ্য। যোগাযোগের ব্যাপারটা আসতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের যেটা হয় convention ব্যাপারটা ঘাড়ে চেপে থাকে তো। প্রসিনিয়াম থিয়েটারটাকে যদি একমাত্র থিয়েটার বলে ধরে নিই তবে আর বেরিয়ে আসা হয় না। তারপর অনেকগুলো factor-এর উপর depend করার ফলে বেরিয়ে আসাটা একটু কঠিন হয়েও দেখা দেয়। যেমন থিয়েটারের ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কথা কেউ ভাবে, তার পক্ষে বেরিয়ে আসা একটু মুশকিল। তারপর যদি কোন নাটকের মঞ্চসফলতা এসে যায়, তাহলেও মুশকিল। যেমন আমি যখন প্রসিনিয়াম ছাড়ি তখন কিন্তু 'বল্লভপুরের রূপকথা' আর বিশেষ করে 'আবু হোসেন' অন্তত গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্টের মাপকাঠিতে মঞ্চসফল। তাই যখন প্রসিনিয়াম ছাড়লাম আমাদের দলের অনেক অভিনেতাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাই বলছিলাম ছেড়ে আসা একটু কঠিন। তবে যারা খুব serious তাদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যাপারটা মাথায় আসবেই।

প্রশ্ন ॥ এবারে একটু production-এর ব্যাপারে আসছি। আচ্ছা আপনার এই অঙ্গনমঞ্চে থিয়েটার করার ক্ষেত্রে আপনি কি কি ব্যবহার করেন যেমন light, make up, music এবং কিভাবে ব্যবহার করেন?

উত্তর। এগুলো সবই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেয়েছি। প্রথম যখন আমরা try করি, প্রথম experiment করি তখনও আমরা এভাবে করব বলে স্থির করিনি। তখন আমরা Proscenium থিয়েটারের spot light ব্যবহার করি তাতে দেখলাম কাজের কাজ হল না তারপর flood light তাতেও কাজ হল না। এই রকম ভাবে কাজ করতে করতে আবিষ্কার করলাম অনেকগুলো source of light কিন্তু কম power-এর 40/60/100 wt. অর্থাৎ যাকে room lighting বলে সেটাই আমাদের থিয়েটারের পক্ষে ভালো।

make up'ও আমরা, প্রথম দিকে যেহেতু একজন তরুণ বৃদ্ধের অভিনয় করত, 'স্পার্টাকুস'-এ খুব খেটে ক্রেপ দিয়ে দাড়ি গোঁফ লাগালাম মাথায় পরালাম উইগ কারণ খুব কাছ থেকে দর্শক দেখবে কিন্তু কিছুদিন পর মনে হল কি লাভ এভাবে make up করে, কারণ এত কিছুর পরেও তো দর্শক বুঝতে পারছে ওটা make up। তাই make upটা ছেড়ে দিলাম। একটা কথা বলে রাখি আমি যখন প্রসিনিয়াম থিয়েটার করতাম তখন থেকেই make up ব্যাপারটা আমি আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে এসেছিলাম—আমার কেমন মনে হত make upটা একটা কুসংস্কার। যেমন আমরা একজন তরুণকে দিয়ে বৃদ্ধের ভূমিকায় make up না দিয়েই অভিনয় করিয়ে দেখেছি দর্শকদের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ ঐ যে দর্শকদের imaginationটাকে কাজে লাগানো আর কি। যেটা আমাদের Folk Theatreএ করা হয়। যেমন ধরুন যাত্রাতে একটা মর্চে ধরা চেয়ারকে কিন্তু যাত্রার দর্শকরা অনায়াসেই সিংহাসন বলে ভাবেন। বাদবাকী কিছুই থাকে না: কখনো ওটা রাজপথ কখনো সমুদ্রের ধার কখনো জনপথ এই imaginationটা এটাকেই আমরা extend করে নিয়ে গেছি। এগুলো আমরা সব ঠেকে ঠেকে শিখেছি, করে করে দেখেছি কোন অসুবিধা হচ্ছে না। যেমন আমরা একসময় মেয়েকে দিয়ে ছেলের অভিনয় করেছি, কোনরকম গলা নকল করে নয় ওর নিজস্ব গলাতেই করেছে, তখনো দেখেছি দর্শকদের accept করতে অসুবিধা হচ্ছে না। এতে তো অসুবিধা হয়ই না বরঞ্চ এটা আর একটা dimension। যেমন props ব্যবহার না করে miming করে বোঝানো এটা তো কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করেই, যেমন আমার হাতে ছুরি নেই কিন্তু ছুরি মারলাম। হাতটাকে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করলাম, ঠিক তেমন make up-এর অভাবটাও দর্শক কল্পনাশক্তি দিয়ে ভরিয়ে নেয়। তার মানে আলোর ব্যাপারটা simple হয়ে গেল, একই ভাবে make up'ও আর musicএর ক্ষেত্রে আমরা Tape machine ব্যবহার করি না, কিন্তু কোন

কোন ক্ষেত্রে যদি অভিনেতারা ঢোল বাজাতে পারে সেক্ষেত্রে ঢোল ব্যবহার করি কিংবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র। আসল কথা আমরা কোন কিছুকেই অপরিহার্য্য করে তুলি না, তবে ধরুন একটা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যদি একটা roomএ আমরা zonal light করার সুযোগ পাই করব। আবার একই নাটক যখন গ্রামে করব হয়ত light ছাড়া দিনের আলোতেই করব। তাই আমাদের theatreএ যেটা খুব সহজে সব জায়গায় পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলোই ব্যবহার করি। আমরা লক্ষ্য রাখি যাতে এমন কিছু ব্যবহার করব না যেটা গ্রামে গঞ্জে available না। আসলে আমরা প্রাথমিক ভাবে contentটার উপরই জোর দিই আর সেটা যাতে যে কোন জায়গায় যে কোন ভাবে করা যায় সেই দিকেই নজর রাখি। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য Free Theatre করা।

প্রশ্ন॥ আপনি কি অঙ্গনমঞ্চের ক্ষেত্রেও হাসির নাটকই পছন্দ করেন?

উত্তর॥ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে যে আমি যে কথাটা থিয়েটারে বলব সেটা হাসির মাধ্যমেই বলব। আমি Charlie Chaplin-এর অসম্ভব ভক্ত, তার এক একটা ছবি ৪/৫ বার করে দেখেছি, এখনো সুযোগ পেলেই দেখি। তিনি মনীষী লোক, তাঁর জায়গায় কোন দিনই পৌঁছতে পারব না। তবে ইচ্ছেটা আছে। একমাত্র 'খাট-মাট ক্রিং' নাটকের মাধ্যমে কিছুটা পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস এবং আমি খুসী। আপনি বলবেন আমি নাটক লিখিনা বলে নাটকের ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু আমি 'খাট-মাট ক্রিং'কে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে কম মূল্যবান মনে করি না। 'খাট-মাট ক্রিং'-এ যেটা পেরেছি সেটা আমি এতদিন ধরে পারিনি বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন॥ নাটকের বক্তব্য বাদে আপনি তো কোন form-এর থিয়েটারের কাছেই দায়বদ্ধ নয় বলছেন; ধরুন যদি আজ আমাদের দেশে হঠাৎই একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন খুব জরুরী হয়ে দেখা দিল এবং দেখা গেল আপামর জনসাধারণকে এই ব্যাপারে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন তখন কি আপনি সেই রাজনৈতিক বক্তব্যকে আপনার নাটকের উপজীব্য করে তুলবেন?

উত্তর॥ যদি সেই বক্তব্যটি আমার নিজের কাছে খুব জরুরী মনে হয়, নিশ্চয়ই

সেই বক্তব্যটিকে আমার নাটকের বিষয় করে তুলব। আর একটু এগিয়ে বলছি যদি মনে করি আমার কতকগুলো বক্তব্যকে থিয়েটার বাদে অন্য কোথাও প্রকাশ করা যাবে আমি থিয়েটার ছেড়ে দেব।

প্রশ্ন॥ আজকাল অন্যান্য গ্রুপগুলো প্রসিনিয়াম থিয়েটারে আর তেমন দর্শক পায় না। ধীরে ধীরে দর্শকসংখ্যা কমতে শুরু করেছে—এর কারণটা কি?

উত্তর॥ দর্শক কমে যাচ্ছে কথাটার মানে কি? আমার তো মনে হয় না। একটা কথা বলতে পারেন টিকিট কাটা দর্শক কমে যাচ্ছে। কিন্তু কারখানার গেটে, মাঠে, ময়দানে, গ্রামে গিয়ে Free থিয়েটার করলে কিন্তু দর্শকের অভাব হয় না। শহরের মানুষরা ভীষণ ভাবে এক ধরনের রাজনৈতিক Frustration এ ভোগে। তাই Group থিয়েটারের লোকেদের নাটক আর তাদের ভালো লাগে না। শহরের লোকেরা যেখানে সস্তা entertainment পাবে সেখানেই যাবে। কেন তারা এমন নাটক দেখবে যে নাটক তাদের ভাবাবে, আমাদের নাটকেও তো লোক হয় না। তবু আমরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছি। সোজা কথা Idealismগুলো সর্বক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে গেছে। এবারে আপনি ভাবলেন নাটকে কিছু সস্তা আমোদের ব্যবস্থা করবেন আর এই আমোদের মোড়কে আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করবেন—তা ওরা কেন যাবে আপনার নাটকে কারণ ওরা Professional Board-এর নাটক দেখবে যেখানে অনেক খোলাখুলি ভাবে আমোদের ব্যবস্থা আছে। তাই আস্তে আস্তে Group থিয়েটার movementটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সোজা কথা সময়টা বড় খারাপ, তাই এখন এক মাত্র উপায় একটা counter culture-এর। আর তাই কয়েকজনকে দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে যেতে হবে। যখন সময় ভালো হবে আবার দর্শক বাড়বে।

১৯৮৫

রবি ঘোষ-এর সঙ্গে প্রলয় শূর-এর সাক্ষাৎকার

—একসঙ্গে বেশ কটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

সিনেমায় অভিনয় করার আগে আপনি থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। আপনার ঐ থিয়েটারের অভিজ্ঞতা সিনেমায় কোনো কাজে লেগেছিল? কিভাবে লেগেছিল?

সিনেমায় প্রথম এলেন কি ক'রে?

সিনেমার অভিনয় সম্পর্কে কি ভাবছেন তখন?

সিনেমা আর থিয়েটারের অভিনয়ের তফাৎটা কি সুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন?

আমিও তাহোলে একসঙ্গে সবটার উত্তর দি কেমন?

আমার অভ্যেস থিয়েটার করা। গোড়া থেকে সেটাই practice করেছি। থিয়েটারের রকমসকম সবসময়ই ভালো লাগতো, এখনও লাগে। সিনেমা দেখতাম। বেশীর ভাগই বিদেশী ছবি। আর ঐ সিনেমার অভিনয়টাও তখন ভালো লাগতো। সিনেমা আর থিয়েটারের অভিনয়ের তফাৎটা কি আর কোথায় তখন বুঝতাম না। আসলে হাতে কলমে কাজ না করলে কোনো applied ব্যাপারই বোঝা যায় না। দেখে বা পড়ে বোঝা একরকম, হাতে কলমে কাজ করে বোঝা আর একরকম। শুধু এটা ধরতে পারতাম যে সিনেমায় কি একটা যেন হয়, যেটা থিয়েটারে কখনই হয় না। বোধহয় close-up কিম্বা expression কিম্বা reaction।

বহুদিন আগে শোভাদি ধরে নিয়ে গেলেন একটা পাট করার জন্যে। ছবিটার নাম 'কিছুক্ষণ'। পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জ্জী। বোধহয় ৫৮/৫৯ হবে। কাজ করলাম। কিছুই ধরতে পারলাম না সিনেমা আর থিয়েটারের তফাৎটা। একটাই জিনিষ মজার লাগল, সেটা হ'ল, টুকরো টুকরো করে shot নেয়া। সবসময় মনে হত, যেন অভিনয়টা unfinished রয়ে গেল। আশেপাশে যারা অভিনয় করছিলেন কাউকেই তেমন ভিন্নগোত্রীয় মনে হচ্ছিল না, একমাত্র অরুন্ধতী দেবী ছাড়া। তাঁকেই কেমন যেন একটু আলাদা লাগতো। মানে অরুন্ধতী দেবীর অভিনয়ে থিয়েটারের অভিনয় দেখতে পেলাম না। সেইসময় আমার অঙ্কে মনে হোলো যে বোধহয় ইনিই ঠিক করছেন। অর্থাৎ ভাবের প্রকাশগুলো খুব introvert nature-এর। ক্যামেরার সামনে বোধহয় এরকম অল্প ক'রে অভিনয় করলেই, এরকমভাবে প্রকাশ করলেই justice হয়।

সত্যিকারের ছবির কাজে গেলাম 'মেঘ' ছবির সময়। পরিচালক উৎপল দত্ত। ওটা আমাদের নিজেদের গণ্ডী, সুতরাং খুবই সহজ ছিলাম কাজের সময়। কিন্তু ঐ চিন্তাটা সবসময় রয়েছে যে কম ক'রে অভিনয় করতে হবে। ভীষণ strained লাগতো আবার মজাও লাগছে। কিরকম করেছিলাম জানি না কিন্তু এই 'মেঘ' ছবির অভিনয় দেখেই মানিকদা আমাকে 'অভিযানে' নিয়েছিলেন।

এখন বলতে পারি যে, থিয়েটার থেকেই অভিনয় সম্পর্কে যা কিছু শিক্ষা। অভিনয়ে ঐ দীর্ঘ অনুশীলন পরে খুব কাজে লেগেছিল। একটা ব্যাপারে খুবই confident ছিলাম। প্রথম যখন সিনেমায় অভিনয় করতে আসি, এটা জানতাম যে fundamentals of acting নিয়ে কেউ খুব জ্ঞান দিতে পারবে না।

regularly সিনেমায় অভিনয় সুরু করি প্রথম তপন সিংহের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য়। তারপর সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান'।

সুরু হল পরীক্ষার পালা।

কার কাছে যাব? film actingটা শিখব কার কাছে?

যারা regular film-এর লোক তারা film সম্পর্কে যেটা বোঝায় সেটা দেখতাম ভুল। ঠিক করলাম, অন্তত দুজন কি তিনজন পরিচালক তো আছেন যারা film করেন, হ্যাঁ তারাই film করেন, তাদের কাছেই surrender করি। প্রত্যেকটা bit of actingকে তখন comparative study করি। কিসের সঙ্গে? stage acting-এর সঙ্গে। দেখতে সুরু করলাম তফাৎটা কোথায়। মানিকদা এবং তপনদার সংস্পর্শে প্রথমেই না এলে কি হোতো বলা মুশকিল। filmএ

lensটা যে একটা অত্যন্ত important বস্তু সেটা অভিনেতা ভুলে গেলেই গোলমাল। ধরো খুব একটা big close up, এবং বেশ কয়েকটা কথা আছে। যা করবার, ক'রেও গেলাম। তারপর? সত্যিকারের পরিচালক যদি সেখানে থাকেন তাহোলে তিনি তোমাকে সতর্ক ক'রে দেবেন তোমার lip movement বা তোমার expression সম্পর্কে। আর যদি পরিচালক কিছু না জানেন, তো —তোমার বারোটা বাজল। তখনই তোমার অভিনয় দেখে দর্শক বলবে, 'বড্ড loud'। কিন্তু অভিনেতা যদি lensটা জানেন, তাহোলে পার পেয়ে যাবেন, পরিচালক যেই হোক না। প্রত্যেকটা shot-এর আগে অভিনেতার জেনে নেয়ার দরকার কোন্ lensএ সেই shotটা নেয়া হচ্ছে। দেখবে gesticulation ব্যাপারটা আমাদের এখানে খুব কম হয়। bodyর কতখানি রয়েছে frame-এর মধ্যে, সেই অনুযায়ী behaviourism হওয়া উচিত। খালি পাখির মতো কিচিরমিচির করাকে অভিনয় বলে না। Bombay-র typical commercial ছবিগুলোতে gesticulation দেখা যায় fighting-এর সময়, হয়ে লাভ কিছু নেই, সবটাই তো আজগুবি। একটা হলিউড fighting sequence ছাখো, একেবারে নিখুঁত। কেন? এটাই প্রশ্ন। বাংলা typical commercial ছবিতে সচরাচর gesticulation দেখা যায় না, একমাত্র কান্নার সময় ছাড়া, সেটাও খুব হৃদয়বিদারক।

কোন্টা কঠিন? film acting না stage acting। এটা অবশ্য আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। কারণ ছুটো দুধরণের medium। তবে অভিনেতার point of view থেকে বলতে পারি, actor is a king on the stage এবং film is essentially a Director's medium। সুতরাং film acting-এর সময় পরিচালক যদি আমায় guide না করেন, তাহোলে আমি গেছি। যদিও আমাদের বেশিরভাগ ছবিই star's point of view থেকে করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই!

তবে film acting, film acting ব'লে যে ধরণের theatrical acting চালু হয়েছে আজকাল, এটা আগে জানতে পারলে filmএ পাট করার কথা হয়তো ভাবতামই না। অভিনয়টাও একটা technical ব্যাপার, এবং film acting-এর যখন একটা technique আছেই তখন সেটাকে অবহেলা করলে চলবে না।

মানিকদার সঙ্গে প্রথম ছবিতেই যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল সেটা খুব মূল্যবান। থিয়েটারের অভিনয় আর সিনেমার অভিনয়ের clean differenceটা

এখানেই প্রথম বুঝতে পারলাম।

—অভিযান ছবিতে আপনি যে অভিনয় করেন, সে অভিনয়ই আপনাকে সিনেমার একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ ছবিতে সত্যজিৎ রায় কিভাবে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

সত্যি বলতে কি আমি একেবারে গোড়া থেকেই মানিকদার schoolingটা ধরতে পেরেছিলাম। মানিকদা যেটার ওপর জোর দেন, সেটা হোলো, spontaneous বা natural behaviourism. বিশেষ কোনো mannerism বা habits-এর ব্যাপারে মানিকদা খুব subtly বুঝিয়ে দেন। যেমন ধরো, অভিযানে থুথু ফেলার ব্যাপারটা মানিকদা হঠাৎই shotএর আগে ধরিয়ে দিলেন। আমি খুব ভালো হাতের আঙুল মুখে দিয়ে সিটি দিতে পারি। এই ব্যাপারটা মানিকদা একদিন লক্ষ্য করেন। ঠিক সুযোগ বুঝে সেটা 'অভিযানে' কাজেও লাগিয়ে দিলেন। খুব ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু সেগুলোতে মানিকদার observation কী অদ্ভুত। ওসবই তিনি কোথায় কখন কাজে লাগিয়ে দিচ্ছেন, টেরও পাবে না।

—বলা যায় বাংলা ছবির সব ডিরেকটারের সঙ্গেই (ঋত্বিক ছাড়া) আপনি কাজ করেছেন। তপন সিংহ, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, এঁদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পদ্ধতি রয়েছে। খুব detailএ বলার একটু অসুবিধে আছে আমার পক্ষে, কারণ তাতে তুলনামূলক ব্যাপারটা এসে যাবে। তবে, তপনদা এবং তরুণবাবু অভিনয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দেন, সেটা অভিনেতার অনেক সময় খুব কাজে লাগে। মৃণালদা এবং পূর্ণেন্দু এরা film-এর totalityর দিকে নজর দেন বেশি, সেখানে কোনো বিশেষ অভিনেতার বিশেষ অভিনয় নিয়ে বোধহয় মাথা ঘামান না।

—'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কিম্বা 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে পরিচালক আপনাদের দুজনকে (আপনি এবং তপেন) কিভাবে তাঁর কাজে লাগিয়েছিলেন? হীরকে, বাঘের সামনে দেয়ালে ঝুঁকে চাবিটা তুলে নেওয়ার কথা বলুন।

যে দুটো ছবির কথা বললে, সেখানে পরিচালক কাকে কখন কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন, সেটা সেই মুহূর্তে কি আর বুঝতে পেরেছি? বুঝতে পারা কি আদৌ সম্ভব ব'লে তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয়, সম্ভব নয়। মানিকদা অভিনেতার best of the quality বের করে নেন, অভিনেতার অজান্তে। 'গুপী গাইন' এবং 'হীরক রাজা'তে মানিকদা আমাদের দুজনকে তাঁর ছবির

প্রয়োজনে যেখানে যেভাবে দরকার, যতটুকু দরকার, কাজে লাগিয়েছেন।

ওই সীনটার কথা বলছি শোনো। ওটা একটা experience আমার অভিনয় জীবনে। যে বাঘটার সঙ্গে (বাঘ নয়, বাঘিনী) কাজ করেছিলাম সেই জীবটিকে সেদিনই প্রথম set-এ দেখলাম। মনের অবস্থাটা কি বুঝতে পারছো ? বাঘটাকে যখন floor-এ খাঁচা থেকে বার করা হোলো সে এক কাণ্ড। ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে বসে আছেন মানিকদা আর তাঁকে ঘিরে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে। set-এর দেয়ালের এককোণে বাঘটাকে প্রায় পনেরজন লোক সমেত trainer বশে আনার চেষ্টা করছে। যখন বাঘটা একটু controlএ, সেই সময় তার Trainer চেঁচিয়ে বলল, 'কোন্ কাম করেগা বাঘকো সাথ্ ?' নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, 'হাম্'। setটা তখন থমথম করছে। Trainer আমায় বাঘের কাছে যেতে বলল, সোজা চলে গেলাম একেবারে পাশে, প্রায় গা ঘেঁসে। কিসের জোরে গিয়েছিলাম সেটা আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। শুধু এইটুকু মাথায় ছিল যে মানিকদার ছবি—দূর শালা যা হবার হবে—এগিয়ে তো যাই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঘটা আমায় তার friend ক'রে ফেলল। সমস্ত set তখন আবার easy হয়ে গেছে এবং কাজটা পুরোই হয়ে গেল। এই একই বাঘের সঙ্গে অমিতাভ্ বচ্চন 'নটবরলাল' ছবিতে কাজ করেছিল। অমিতাভ্ আমায় বলেছিল, সে, সাত দিন আগের থেকে বাঘটার সঙ্গে নিজেকে trained up করেছিল। আমি তো মাত্র ঘণ্টাখানেক। অমিতাভ্ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি ক'রে করেছিলেন ?' আমি বললাম, 'কি ক'রে আর ! ভাতের গুণে।'

—'জনঅরণ্য' ছবিতে আপনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। চিত্রনাট্য শোনা থেকে অভিনয় করা পর্যন্ত আপনার এ ছবির অভিজ্ঞতা বলুন, ফ্লুরিজ-এ প্রদীপের সঙ্গে চিকেন ওমলেট খেতে খেতে কথা বলা ঐ দৃশ্যটা বিশেষ করে।

নিঃসন্দেহে সিনেমায় 'জনঅরণ্য'র নটবর মিত্রর মতো role প্রায় করিনি বললেই হয়। মানিকদা সচরাচর আমায় improvisation-এ বাধা দেন না। বরং পছন্দই করেন। কিন্তু নটবর মিত্রর ব্যাপারে প্রথমেই একটা সুন্দর এবং definite caution দিয়ে দিয়েছিলেন। আমার dialogue বলার styleটা pointed হবে এবং no improvisation on the definite dialogue, look steady and studying। অর্থাৎ নটবর মিত্র কোথাও কখনও faulter করে না। নটবর মিত্র is a pure professional। যদিও কাজটা তার Pimp-এর কিন্তু ব্যক্তিজীবনে লোকটা খুব honest। সময় তার কাছে খুব important,

ঘড়ির কাঁটার ওপর সে চলে। এইভাবে মানিকদা আমাকে চরিত্রটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝতেই পারছো এইভাবে চরিত্রটা মানিকদার মুখে জেনে ফেলার পর, আমাকে আর পায় কে? কিছু Pimp দেখেওছি আশেপাশে। এখন মোটামুটি একটা image মাথায় এসেই গেল। মানিকদা যে make-up designটা করেছিলেন সেটাও খুব সাহায্য করেছিল, চরিত্রের mannerism-টা ঐ make-up-য়েই বুঝে গিয়েছিলাম।

ফ্লুরিজ-এর sceneটা খুব vital scene ছিল। খুব alert ছিলাম। সেদিন সকাল থেকেই একেবারে তৈরী ছিলাম। কারণ প্রচুর সংলাপ ছিল। প্রত্যেকটা কথাকে একেবারে ওজন ক'রে কীভাবে মানে বের করতে হবে সেটা মানিকদা আগেই বলে দিয়েছিলেন। এবং কথাগুলো বলা ছাড়াও প্রচুর business ছিল—যেমন ওমলেটটা নিয়ে যা করেছিলাম। business থাকলে বা খাবার খেতে খেতে কথা বলা থাকলে অভিনয় করতে আমি খুব মজা পাই। সুতরাং খেতে খেতে ঐ ডায়ালগ বলতে আমার কোনো অসুবিধেই হয়নি। এই particular sceneএ ক্যামেরাটা লক্ষ্য করেছো, দারুণ না? প্রত্যেকটা shot-এর আগে মানিকদার কাছে ক্যামেরাটা জেনে নিতাম।

—অভিযান, গুপী গাইন কিম্বা হীরক ছাড়া বেশিরভাগ ছবিতেই আপনি ছোট রোল করেছেন। এই ছোট রোলগুলোর মধ্যে কোথায় আপনার অভিনয় খুব উল্লেখযোগ্য ব'লে আপনি মনে করেন?

ছোটবড় সবরকম role করতেই আমি ভালোবাসি। আমি ঐ theoryতে বিশ্বাস করি—There is no such thing as small role—everything is with the Bad Actor. তবে মনে রাখার মতো ছোট role করেছি অসিত সেনের 'আগুন' কিম্বা পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য'তে; কিছুদিন আগে তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এর role-টাও ধরতে পারো।

—আপনি মূলতঃ একজন কমেডিয়ান। ঐ বিশেষ রোলে দিনের পর দিন অভিনয় ক'রতে ক'রতে আপনার কোনো ক্লান্তি আসে কি? নাকি প্রতিটি চরিত্র থেকেই কোনো না কোনোভাবে নিজেকে আপনি নোতুন ক'রে রূপ দেয়ার একটা চেষ্টা করেন?

যেহেতু অভিনয়টা আমার পেশা মানে আমি একজন Professional man—সুতরাং কাজের মধ্যে আনন্দ জোগাড় ক'রে নেওয়াটাও আমার কাজ। থিয়েটার ক'রতে কখনই বিরক্তি আসে না, কারণ Theatre is in my vein. তাছাড়া

একটা কথা আছে your every afternoon audience is different. আর এই মজাটার জন্যেই থিয়েটারে ক্লান্তি আসে কম। কিন্তু দিনের পর দিন সিনেমায় একই ধরনের role যখন করতে হয় তখন খুবই বিরক্ত হই। কিন্তু উপায় কি? কি করবে তুমি? নানারকম চরিত্রের কথা ভেবে যদি কেউ ছবি করতে আসেন, তাহোলে আমরাও অভিনয়ে উৎসাহ পাই। কিন্তু কেউ কিছু ভাববে না, অথচ ছবি করার ইচ্ছেটা ষোলোআনা। সুতরাং বুঝতেই পারছো এখানে আমাদের অবস্থাটা কি? তখন একটাই পথ বেছে নি, সেটা হোলো খারাপ অভিনয় থেকে যেমন ক'রে হোক নিজেকে রক্ষা করা। ভালো অভিনয় করার কথা ভাবিই না। একটাই সুবিধে, মানে আমার সুবিধে, যে, ভাবনা চিন্তা করতে পারেন এরকম পরিচালকরাও আমায় প্রায়ই তাদের ছবিতে নেন—তখন ঐ ক্লান্তি ঐ বিরক্তি কিছু কেটে যায়।

—ভালো অভিনয়ের জন্যে অভিনেতাকে কি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হোয়ে যেতে হয়, নাকি অভিনেতা চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন?

এটা অনেকেই বলেন, কথাটা কি, না, অভিনেতাকে চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। হয়তো এটা একটা schooling. কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, ভুল schooling. আমি তো impersonate করছি, অথচ আমিই সজাগ থাকব না? মনে করো, আমি নিজেকে 'সিরাজদ্দৌল্লা' ভেবে ফেললাম। তাহোলেই কি সেই roleএ আমি ফাটিয়ে দেব? কক্ষনো না। যে চরিত্রে আমায় অভিনয় করতে হবে তার একটা comprehensive analysis ক'রে ফেলতে হবে, সেটা আগে থেকেই করতে হবে। যেমন ধরো, চরিত্রটার Social background, Political background, Psychological background, Historical background. তারপর আমার কণ্ঠ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেই চরিত্রের একটা behaviourism তৈরী করতে হবে, তারপর সেই behaviourism থেকে একটা চরিত্রের খাঁটি চেহারাটা বের করতে হবে এবং যদি successfully এটা করতে পারি, তাহোলেই audienceয়ের মধ্যে একটা ভাবের সৃষ্টি হবে। এককথায় অভিনয় ব্যাপারটাতো একটা অঙ্কের মতো। অঙ্কের প্রতিটি step সম্পর্কে যেমন সজাগ থাকতে হয় অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। নিজেকে যদি কেবল চরিত্রটার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখি, তাহোলে তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। মায়ের নামে ঝুলে পড়া এসব ক্ষেত্রে চলে না। যিনি নৃত্য করছেন তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের কোনো রূপ পরিবেশন করেন তখন তাকে সজাগ থাকতে হয়, তার নজর থাকে নাচের তাল লয়ের ওপর।

শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হ'য়ে গেলে, শেষ অব্দি তো সেটা পেতলের রাধিকা হয়ে যাবে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে যুক্তি বুদ্ধি বিচার কার্যকারণ ছাড়া যদি কেউ কিছু করে সেটা তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব—কোনো rule-এ পড়ে না সেটা।

—ক্যামেরার সামনে বাড়াবাড়ি জিনিষটা একেবারেই চলে না, কথাটা কি ঠিক?

সেটা তো ব'লে দেবেন স্বয়ং পরিচালক। film হচ্ছে Director's medium. সুতরাং বাড়বে কি কমবে সেটা ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব পরিচালকের। তবে আজকাল, বিশেষত সিনেমায় অভিনেতাকে সংযত থাকতে হবে। বাড়াবাড়ি বলতে কি বলছো? gesticulation-এর বাড়াবাড়ি, না expression-এর বাড়াবাড়ি না কণ্ঠের বাড়াবাড়ি? কোনোটাকেই বাড়াবাড়ি মনে হবে না যদি ঠিক ঠিক মতো সব কিছুকে ঠিক ঠিক জায়গায় place করা যায়। ধরো একটা চিৎকার করতে হবে, সেটা long-এ, না close-এ, এটা জেনে নিলে আর ক্যামেরার lens সম্পর্কে কিছু sense থাকলে বাড়াবাড়ি মনে হবে না।

—আপনি কি মনে করেন ভালো চিত্রনাট্য ভালো পরিচালক ছাড়া ভালো অভিনয় করা সম্ভব?

কখনই সম্ভব না। ভালো চিত্রনাট্য না হোলে ভালো ছবি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এরকমও দেখেছি যে ভালো চিত্রনাট্যের জোরে অনেক সময় average পরিচালকরাও উৎরে গেছেন। সুতরাং অভিনয়, বিশেষ করে film-এ, ভালো চিত্রনাট্যের ওপর খুব বেশি পরিমাণেই নির্ভর করে। ইডেন গার্ডেনে যে খেলা দেখানো যায় সেটা কি হাজরা পার্কে দেখানো সম্ভব?

—আপনার এমন একটা ইমেজ হয়ে গেছে যে পর্দায় আপনাকে দেখলেই দর্শকের হাসি পায়, আপনার জনপ্রিয়তার পক্ষে এটা ভালো নিশ্চয়ই কিন্তু ভালো অভিনয়ের পক্ষে কি এটা ক্ষতিকারক নয়?

আমার অবশ্য তা মনে হয় না। যে ইমেজের কথা বলছো, সেই ইমেজ যেমন হয়েছে তেমনি ঐ ইমেজ পালটাতেই বা কতক্ষণ? আসলে অভিনয়ের অঙ্কটা জানা থাকলে সেক্ষেত্রে সবকিছুই সম্ভব হয়। জনঅরণ্যে নটবর মিত্র কি আমি করিনি? আর সাধারণ দর্শক তো popular elementকেই সবসময় সহজে টেনে নেবে। তবে ইমেজ নিয়ে ব্যবসাদাররা যে নোংরা রাস্তায় ব্যবসা করেন সেটা তো চলতেই থাকে।

—অভিনয় খুব পরিশ্রমের কাজ। শারীরিক ও মানসিক, পরিশ্রমটা দুরকমই : এই শ্রম ছাড়া ভালো অভিনয় সম্ভব নয়, এ সম্পর্কে আপনার মত কি ?

যে কোনো creative কাজই তো পরিশ্রমের। শ্রম বা পরিশ্রম ছাড়া কি কোথাও পৌছোনো যায় ? অভিনেতার তো অনুশীলন কখনো শেষ হয় না। শারীরিক অনুশীলন বাদেও একটা মানসিক অনুশীলন করতে হয় তাকে। স্তানিস্লাভস্কির কথায়, অভিনয় সম্পর্কে—Practice, Practice and Practice. এখন কি আর আমায় voice, gesticulation etc. তেমন practice করতে হয়, সেরকম না করলেও চলে, কিন্তু reflex practice তো শেষদিন পর্যন্ত করতে হবে।

—ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা লোকরা আজকাল অনেকেই ভালো অভিনয় করছেন। কিন্তু ভালো অভিনয় করার জন্যে ইনস্টিটিউট যাবার কি কোনো দরকার আছে ? ওখানে টেকনিকাল কাজকম্ম শেখার জন্যে যাওয়া যায়, কিন্তু অভিনয়টা ওভাবে শেখা যায় ব'লে কি আপনি মনে করেন ?

জানিনা, এ সম্পর্কে নানা মত আছে। তবে R. D. A. অর্থাৎ Royal Dramatic Academyতে 20% হোলো Theoretical শিক্ষা বাকী সবটাই Practical lesson. আমার মনে হয় অভিনয়টা instinctive ব্যাপার। Instinct বা ভেতর থেকে একটা তাগিদ না থাকলে শুধু Institute-এর theoretical মালমশলা নিয়ে কখনই অভিনয় শেখা যায় না। আমি গুরুমুখী বিদ্যায় বিশ্বাস করি। প্রথমে গুরুর কাছে বসে শুধু দেখে যেতে হবে তাঁর কাজকর্ম। তারপর না বুঝেই সেগুলোকে Practice ক'রতে হবে। বেশ খানিকটা Practice-এর পর অনেক কিছু আমার আয়ত্তে চলে আসবে। এরপর গুরুই বলে দেবেন কখন আমার theoretical knowledge দরকার। Theory তো nourish করবে আমার practical knowledgeকে। Institute খুব প্রয়োজন Technicians তৈরী করার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "Academy প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র বের করছে Art College থেকে। কিন্তু কজন তার মধ্যে শিল্পী হ'তে পারছেন ? বত্রিশ পাটি দাঁত চিবোতে চিবোতে শক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু জিবের স্বাদ গেল মরে।" শুধুমাত্র theoretical জ্ঞানও শিল্পীর ক্ষেত্রে তাই। কেউ ভাবছেন, 'অভিনয় সংক্রান্ত থিয়োরী তো সব আমার নখের ডগায়'। আমি বলছি stage-এ নামো না একবার।

তাই বলে আমি একথা বলছি না যে Institute-এর দরকার নেই। তবে আমি এটা বলতে পারব না creditটা কার বেশি জয়া ভাদুড়ীর না Institute-এর।

—বাংলা সিনেমায় ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব আছে ব'লে কি আপনি মনে করেন?

খুবই অভাব। কি হ'চ্ছে বলোতো এখানে? পৃথিবীর ভালো ভালো ছবি-গুলোর অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা ভাবো, কোনো কূলকিনারা পাবে না। আসলে এখানে initial successটাই হ'চ্ছে সবকিছু গোলমালের মূল। খুব কম লোকই এখানে অনুশীলন করে। কি একটা ভাব নিয়ে যেন সবাই চলছে। এটা বোধহয় বাঙালী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। একটা ভালো অভিনয় করব, এরকম ইচ্ছে এরকম চেষ্টা কজনের আছে? এ যেন classical গানটাও আধুনিক ক'রে গাওয়ার মতো। মানুষ তো ওঠার চেষ্টা করে। আর এখানে? কোথায়, সেই চেষ্টাটা কোথায়? এরই মধ্যে আবার বোম্বাইকে copy করাও চলছে। সূর্য লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়লে তবে তো সেটা গিয়ে পড়বে হিমালয়ের মাথায়। আসল কথা এই লক্ষ্যটা। অভিনয়ের ক্ষেত্রে গেরস্তপনা চলে না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী গেরস্ত ছিলেন না, সত্যজিৎ রায়ও গেরস্ত নন।

১৯৮২

হীরাবাই বড়োদেকর-এর সঙ্গে বসন্ত পোতদার-এর সাক্ষাৎকার

[পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর বড় ছেলে জয়ন্ত সেদিন (১৯৮০-র এপ্রিল মাসে) হঠাৎ বলল, "বসন্ত, মে মাসের শেষের দিকে আসছ তো পুনায় ?"

"কেন ? তোমার বাবার বিশেষ মেহ্‌ফিল ?"

"সে তো আছেই, তাছাড়া হীরাবাই-এর জন্য বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে।"

"হীরাবাই-এর জন্য ? কেন ?"

"তুমি জানো না ? তিনি ৭৫ বছর বয়েস পুরো করছেন। ২৯শে মে তাঁর ৭৬তম জন্মদিন।

হীরাবাই ৭৫ ? কত বছর দেখতে এসেছি তাঁকে ! আমার জন্মের আগে থেকে গান করছেন।

হীরাবাই। সঙ্গীতপ্রাঙ্গণের তুলসী। যুবা বয়স থেকে যাট বছর পার করেও হীরাবাই-এর চেহারায় প্রায় কোনো বদল ঘটেনি।

তুলসীর মতনই শ্যামল বর্ণ, কানে মুক্তোর দুল ও হাতে চুড়ি, গলায় মুক্তোর মালা, সেই মুক্তোর দ্যুতি নেওয়া ভাবপূর্ণ চোখ, সাদাসিধে যে কোনো রং-এর শাড়ি। মঞ্চে প্রবেশ করার সময় কোনো অহংকারী অভিনিবেশ নেই। তানপুরা নিয়ে কুলীন বৈঠকভঙ্গী। শ্রোতাদের প্রণাম, তাতে না অতি নম্রতা না দাম্ভিকতা। গায়নের সময় বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা জুড়ে সুর দেখানোর আদত। কারুকে মাত করার জেদ নেই, না তানপালটার ফালতু সার্কাস না তানের বাজি ফাটানো। সঙ্গতিয়াদের দিকে কখনও চোখ রাঙিয়ে দেখবেন না। স্ত্রী স্বভাবের অসঙ্গত

কোনো হাবভাব নেই। থাকত শুধু একটি মোহময়ী, স্নেহার্দ্র শীতল স্বর এবং আদুরে আদুরে লয়।

পরদিন তাঁর বাড়িতে যেতেই আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম "অভিনন্দন চম্পুতাই, (হীরাবাই-এর ডাক নাম) শতবার সহস্রবার অভিনন্দন। আমার একারই নয়, সমস্ত বাঙালী পাঠকদের তরফ থেকে আপনার ৭৬তম জন্মদিনের জন্য হার্দিক অভিনন্দন!"

শান্তভাবে বললেন, "জন্মদিনের তারিখ ২৯শে মে, তুমি মাসখানেক আগেই অভিনন্দন জানাতে এসেছো?"

আমি বললুম, "মৌখিক শুভেচ্ছা আজ জানাচ্ছি তবু সেটা প্রকাশিত হবে মে মাসের শেষ সপ্তাহেই। কাজেই…"

"ও মা, তুমি আমার জীবনী লিখতে এসেছ কী?"

"না না," আমি এবার প্রথমেই চম্পুতাইকে ভালো করে দেখি। শরীর একটু দুর্বল, গলার স্বর ক্ষীণ। তবু চেহারায় শান্তির ভাব আগের মতনই।

"আপনার ইন্টারভিউ নিতে আসিনি। আজ আপনার ৭৫ বছরের বৈভবশালী জীবন। সেই অতীতের কোন্ কোন্ ঘটনা আজও আপনার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে আছে? সেগুলো শুধু বলুন। কানপুরে ডাঃ মিত্তিরদের বাড়িতে সমানে আট দিন নিজের সংগীত জীবনের অনেক বাহারদার কিস্‌সাগুলি আপনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। সেরকম নয়। শুধু অই ঘটনাগুলি যা আপনি কখনও ভুলতে পারেননি, পারবেন না। ২৯শে মে পুনায় আপনার জন্য বড় অনুষ্ঠান হবে। বালগন্ধর্ব রঙ্গমঞ্চে ফুলমালায় শরীর প্রায় আচ্ছাদিত অবস্থায় আপনি সংগীত গুণিজনদের মধ্যে বসে থাকবেন তখন জীবনের কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ আপনার চোখের সামনে ছবির মতন আসবে? আস্তে আস্তে বলুন। আমি কোনো প্রশ্ন করব না।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ষাকাল নিয়ে যেমন বর্ণনা আছে অবিকল সেই রকম সুরের বর্ষায় কথা শুরু করলেন হীরাবাই।]

হীরাবাই: বসন্ত, বাল্যকালের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি সবার আগে মনে পড়ে আমার বাবার মধুর মতন মিষ্টি গলা। সেই স্বরলহরী আজও কানে গুঞ্জন করছে। বাবা রাতদিন রেয়াজ করতেন। আমাকে অথবা আমার দুজন বোনকে কখনও শেখান নি তিনি। তাঁর ধারণা, গান-বিদ্যা মেয়েদের জন্য নয়।

যদিও হয়, নিজের মেয়েদের জন্য একদম বারণ। বাড়িতে আমার মুখ থেকে তিনি সকৌতুকে গোহরজান ও মলকাজানের গানের নকল শুনতেন, হাততালি ও শাবাসকী দিতেন কিন্তু শেখানোর নাম নেই। আমরা তিনজন বোন গানের টানে ব্যাকুল আর বাবা ভর্তি করে দিলেন হুজুরপাৎরা কন্যাশালায়।

[স্বগত]

মরহুম উস্তাদ আবদুল করীম খাঁ সাহেবের পাঁচজন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে সুরেশবাবু মানে (জন্ম ১৯০২), তারপর হীরাবাইর জন্ম (১৯০৫)। স্বভাবের অসীম শান্তি এবং মর্যাদা জন্ম থেকেই নিয়ে এসেছেন হীরাবাই। কান্নাকাটি না করে তিনি এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হলেন। মৃতজাত মনে করে নার্স তাঁকে কাপড়ে বেঁধে একদিকে রেখে দেয়। হঠাৎ একজন ডাক্তারবাবু 'দেখি দেখি' বলে সেই পুঁটলিটা খুলে দেখেন। তারপর তাড়াহুড়ো। নবজাত মেয়ে বেঁচে আছে শুনে খাঁ সাহেব খুব খুশী। চুপচাপ জন্মেছিলেন তিনি এবং সংগীত মহল থেকে রসজ্ঞ শ্রোতাদের বুক পর্যন্ত চুপচাপ পৌছেছিলেন।

খাঁ সাহেব মেয়েদের গান শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন বটে হীরাবাই-এর গান ও কীর্তি শুনে পরে নিজের ভুল শুধরে নেন।

হীরাবাই : বাবার পর মনে পড়ে দাদার গান। তিনিই আমার প্রথম গুরু। ১২ বছর বয়েস থেকে ওঁর কাছে শিখতে শুরু করেছি। ১৫ বছর বয়সে আলাদিয়া খাঁর শিষ্যা লক্ষ্মীবাই জাধও-এর গান শুনে অবাক অভিভূত হয়ে গেছি। লক্ষ্মীবাই-ই তখন আমার আদর্শ। তাঁর মতন গায়ন শেখার জ্বালা প্রজলিত হয়। তারপর রাতদিন নিয়মিত রেয়াজ। দাদা শেখাতেন, মা উৎসাহ দিতেন। মা নিজে বাবার শিষ্যা, খুব ভালো গায়িকা। আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ছেলেমেয়েদের শিল্পী করার জন্য কত খেটেছেন। আজ সবার কথা মনে পড়ে। দাদা যে অকালে মারা যান।

[স্বগত]

হীরাবাই-এর মায়ের নাম তারাবাই। দাদা সুরেশবাবু 'মানে' পদবী লাগাতেন। অসাধারণ গায়ক। ঠুংরীর বাদশা। হুবহু বাবার মতন গায়ন কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন, বড় মেহেফিলে জমাতে পারতেন না। হীরাবাই ছাড়া মাণিক ভর্মা ও প্রভা অত্রে এ দুজন গায়িকা সুরেশবাবুরই প্রধান শিষ্যা। পণ্ডিত ভীমসেন এবং বসন্তরাও দেশপাণ্ডেও সুরেশবাবুর কাছ থেকে কিছু শিখেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর গায়কীর নজাকত তাঁর সঙ্গেই গেল। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৫৩ সালে।

হীরাবাই: তারপর ১৯২২ না ২৩ সাল, ঠিক মনে নেই। তোমার ইন্দোর শহরের দোল দেখতে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। বড় অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে উস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ এসেছিলেন। তিনি আমার বাবার ভাগ্নে, আমার পিসতুতো ভাই। নামকরা গায়ক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গান-শিক্ষক। মা জিগ্যেস করলেন, "আমার মেয়েকে শেখাবেন কি?" তিনি বললেন, "আগে গান শুনি, পরে ঠিক করবো।" আমি খুব রোগা, লাজুক মেয়ে। তানপুরার আকারের মধ্যেও হারিয়ে যাবার মতন দেহযষ্টি। মা ও বোনেরা উৎসাহ দিলেন, দাদা হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গত করতে বসলেন। কি গেয়েছি আজ মনে নেই আমার। কিন্তু গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাকে বললেন, "মামী, আমিই শেখাবো মেয়েটিকে। আর কারুর কাছে পাঠাবেন না।" বম্বে ফিরে এসে নাড়া বন্ধনের অনুষ্ঠান হয়।
[স্বগত]

ওয়াহিদ খাঁ সমানে পাঁচ বছর শেখালেন। মুক্ত হস্তে, মুক্ত কর্ণে বিদ্যা দিলেন। আবার বাড়িতে রেয়াজ করিয়ে নিতেন মা ও দাদা। হীরাবাই-এর দাদা স্বতঃস্ফূর্ত এক খামখেয়ালী প্রতিভাধর শিল্পী। আজ এক গাইবেন, আগামী-কাল আর কিছু। পরে হীরাবাই গোহরজানের কাছে ঠুংরী, বালগন্ধর্বের কাছে নাট্য সংগীত এবং ওয়াঝেবুয়ার কাছেও কিছুটা শিখলেন। কিন্তু তাঁর গায়নে ওয়াহিদ খাঁরই ছাপ। ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের জ্ঞান খুব গভীর তবু আসর জমানোর জন্য গলাটা খুব একটা অনুকূল ছিল না। তাঁর তিনজন শিষ্যা তিনটি নগরে। বম্বেতে হীরাবাই, দিল্লিতে মুন্নিবাই এবং লখনউ শহরে আখ্‌তরীবাই। ঘুরে বেড়াতেন তিনটি জায়গায়। আমীর খাঁ সাহেব নাড়া বাঁধেননি তাঁর, তবু আমীর খাঁর বিলম্বত গায়কীর গুরু ওয়াহিদ খাঁই।

পণ্ডিত ভীমসেন ওয়াহিদ খাঁ সম্পর্কে একটি কথা জানালেন। ভেবেছিলাম, যখন বড়ে গুলাম আলির জীবনী লিখব তখন সে কথাটি দেব কিন্তু এখন সেই লোভ আর সম্বরণ করতে পারছি না।

পণ্ডিতজী জানালেন, বড়ে গোলাম আলি একবার ওয়াহিদ খাঁর কাছে শেখার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি 'না' করে দিলেন। একজন শিষ্য জিগ্যেস করল, "উস্তাদজী বড়ে গোলাম এমন মহান গায়ক শিষ্য হতে চাইছেন তাতে আপনারও তো গৌরব। আপনি কেন প্রত্যাখ্যান করলেন?" তখন ওয়াহিদ খাঁ সাহেব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, "বড়ে গোলামের গলায় পাহাড়ি মউমাছিরা মধু সংগ্রহ করে রেখেছেন। খুব মিষ্টি এবং তৈরী গায়ক। তাঁর গায়নে শুধু এক

আধটা দোষ আছে। আমার কাছে শিখলে সেটাও সরে যাবে। কিন্তু তারপর আর সমস্ত গায়ক ভুখা রয়ে যাবে, তার কি ? শ্রোতারা আর কাউকে শুনবেই না।

হীরাবাই : ১৯২৩ সালের আর একটি ঘটনা, যেটা, জানো, চাইলেও ভুলতে পারব না। উস্তাদজীর কাছে সবে শিখতে শুরু করেছিলাম তবুও তিনি ইজাজত দেন। কিসের ইজাজত জানো ? থিয়েটারে গান করার, আর মা পুনার আর্যভূষণ থিয়েটারে আমার প্রথম জলসা করান। কি সব মজা ! তখন কেশরবাই মোগুবাইরা বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও কখনও আসর করেননি। মেয়েদের গান শুনতে যাওয়াও যখন বারণ গান গাইবে কে ? তখন শুধু তমাশার তবায়েফরা থিয়েটারে নাচ করতেন। নাচের সঙ্গে হাল্কাফুল্কা গান। সেই সময়ে আমি তিন ঘণ্টার উচ্চাঙ্গ সংগীতের মেহেফিল করলুম। যারা এসেছিলেন, ভয়ে ভয়ে, ঘেমে গিয়ে গান শুনছিলেন। গানের চেয়ে দরজার দিকে তাঁদের কান। মারপিট হবার আশঙ্কা ছিল। আমি ভয়ে থরথর কাঁপছিলুম। হারমোনিয়ামে দাদা এবং তবলায় ছিলেন বলবন্তরাও রুকড়ীকর। টিকিট ছিল আট আনা থেকে তিন টাকা। ভাগ্যিস, কোনো হাঙ্গামা হয়নি। কিন্তু পুনা বম্বের নামকরা গায়করা খুব রেগে গেলেন। 'এই বদজাত মেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত আট আনায় বিলি বিক্রি করে দিল'—তাদের ক্ষোভ। ঠিকই জমল জলসা। গায়নের জন্য ডাক আসতে শুরু হল। বেশি করে বিয়ের বাড়িতে ঘরোয়া আসর। ৩৫ টাকা পেতুম। ১০ টাকা সঙ্গতীয়াদের। ২৫ আমার। মনে পড়ছে তার আগেকার কথা: বাড়িতে কেউ বড় লোক এলে গাইতুম। তারা খুশি হয়ে রুপোর মেডেল দিতেন— তখন সেই মেডেলের দাম থাকত মাত্র এক টাকা। সেই ক্ষুদ্র মেডেলের জন্য আমরা বোনেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেয়ে থাকতুম। মেডেল পেলে যেন স্বর্গের ছাতাকে স্পর্শ করেছি এমন আনন্দ। আর হঠাৎ মাত্র আঠারো বছর বয়সে আমি একটা আসরে ২৫ টাকা পেতে লাগলুম। অঘটনও ঘটে !

[স্বগত]

আর্যভূষণ থিয়েটারের জলসা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে রীতিমতন বিপ্লব ঘটিয়ে এনেছে। কুলীন বাড়ির মেয়ে মঞ্চে বসে গান করছে ?—অব্রহ্মণ্যম ; লাহোল বিলা কুওয়াত, নিষিদ্ধ। এটা হীরাবাই-এর সবচেয়ে বড় অবদান ! এজন্য তাঁর কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং সমস্ত মহিলা শিল্পীরা চিরকাল উপকৃত। কয়েক বছর হীরাবাইকে খুব অপমানিত অবস্থায় আসর করতে হল। বিশেষত ছোট শহরে। তিনি একটি চিজ গাইছেন, হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে থেকে

শিস্ আসছে, সস্তা গানের ফারমাইশ হচ্ছে, 'দাঁড়িয়ে গান না' এরকম চিৎকার। তাঁর চরিত্র নিয়ে কানাঘুষা। তবু হীরাবাই নির্ভয়ে বসে বৈঠক জমাতেন। অতুলনীয় তাঁর মনের জোর। হীরাবাই-এর আগের হাজার পাঁচশ বছরের ভারতীয় দেবসঙ্গীতের ইতিহাসে কোনো মহিলা গায়কের নাম পর্যন্ত নেই। আজ সেই ইতিহাসে হীরাবাই-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে।

আর যখনই মহিলা গায়কদের আসর শুনি, মেয়েদের রেয়াজ করতে দেখি, ওদের জানাতে ব্যাকুল হয়ে উঠি, "জানো তোমাদের গুরু যে কেউ হোক্ গায়নের স্বাধীনতা দিয়েছেন হীরাবাই। তাঁর অদৃশ্য আঙ্গুল ধরেই তোমরা মঞ্চে উঠেছো।

হীরাবাই : পরের বছরই, মানে ১৯২৪-এ নাগপুরে অনুষ্ঠান হয়। আজও সেই মেহেফিলের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মনে পড়ে। একটি মেয়ে হিন্দুস্থানী সংগীত গাইবে? নাগপুরবাসীদের জন্য যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ব্যঙ্কটেশ থিয়েটার একেবারে ফুল। পরদা উপরে যায়। আমার দুর্বল গঠন দেখে লোকেরা চিৎকার করে, 'এ গাত্রচর্মযুক্ত মেয়ে গাইতে পারবে কি?' আমি ভয়ে ব্যাকুল। গান শুরু করি এবং অস্তাই অন্তরা ভরে সমে আসতেই গোটা থিয়েটার উঠে দাঁড়িয়ে সম ধরে। আসর শেষ হতেই পর পর ১৩টি অনুষ্ঠান ঠিক হয়। নাগপুর আজও আমাকে সেইরকম ভালোবাসে।

[স্বগত]

হীরাবাই সমে আসার যে কথা বললেন সেটা শুনেই তাঁর গায়কীর হীরের টুকরোগুলি আমার স্মৃতিতে চমকে উঠল। সুরেলা টেনে তোলা স্বরকাকু এবং অস্তাই অন্তরার পর সর্পিলগতিতে বিলম্বতে বিহার করা তাঁর বিশেষত্ব। তবু তাঁর স্বরজালের মোহিনী থাকত শুধু একটা সুরে—উপরের ষড়জ। তাঁর অভিন্ন ষড়জ লাগলেই সমস্ত কোলাহল, কথাবার্তা, গুনগুন শেষ! কত কি ঘটে গেছে গত ৫০ বছরের মধ্যে। মহাযুদ্ধ, আণবিক বোমা, সংশোধন, পপসঙ্গীত, ফ্যাশানে নানান বদল, হরেক রকমের রুচি পালট। তবু হীরাবাইর অসংমিশ্র তার ষড়জের স্বাভাবিকতা সেই রকম টাটকা, রুচিকর। হীরাবাইর সমস্ত গায়কীর গঠন দোলনার মতন। শ্রোতারা প্রায় ৫৫ বছর পর্যন্ত সেই দোলনায় বসে ঝুলেছে, ঝুমেছে। কখনও দোলনার দড়ি ছিঁড়ে যায়নি, থামেনি। ৫৫ বছর! এত দীর্ঘকাল কোনো গায়ক বা গায়িকা গেয়েছে মনে হয় না। যদি গেয়েছে, হীরাবাই যত আসর করেছেন তত নিশ্চয়ই করেনি। সভা-সম্মিলনী, আকাশবাণী এবং

ঘরোয়া, আবার ৫ বছর নাটকের নায়িকা হিসেবে হীরাবাই হাজার হাজার অনুষ্ঠান করেছেন। গানের সময় হীরাবাইর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হত তিনি প্রত্যেকটি সুর চোখে পরিষ্কার দেখছেন। সত্যিই দেখেন তিনি। সেই বরদান তিনি দাদা ও বাবা থেকে পেয়েছেন। আর হীরাবাই যে স্বরপুঞ্জ দেখেন সেগুলো মধ্যযুগীয় সন্ত কবিদের পদ্যের মতন প্রাসাদিক পবিত্র! তিনি সাধুসুলভ গায়কীর প্রবক্তা। কাজেই যদিও তিনি নূতন রাগ রচনা করেন নি, চিজ্‌বন্দিশ বাঁধেন নি, তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে লোকপ্রিয় গায়িকা। অভিজাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রস জাগাবার অভিলাষী শ্রোতাদের জন্য প্রথম পাঠ হচ্ছে হীরাবাইর গায়কী। প্রকৃতির শীতল জলের মতনই প্রবাহিত গানশৈলী।

হীরাবাই ঃ তোমাদের কলকাতায় কতবার যে গেছি কিন্তু মনে পড়ে ১৯৪০-এর আসর। কোনো নাহারবাবু ডেকে ছিলেন। কে এল সহগল সেক্রেটারী। আমার আগে রোশনআরা বেগম গাইতে বসে। গানের শেষে সে 'জমুনাকে তীর' গায়। সেটা ভৈরবী যেন তার গায়নের সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ। আয়োজকরা চিন্তিত, এবার আমার কি হবে? আমি বসে মারুবিহাগ এবং 'হোরী খেলো মোসে নন্দলালা' গাই। শ্রোতাদের প্রচণ্ড হাততালি। ১২ টি স্বর্ণপদক পেলুম। সহগল মঞ্চে উঠে যাঁরা পদক দিয়েছিলেন তাঁদের নাম পড়ে শোনান।

[স্বগত]

কলকাতায় হীরাবাই প্রথম গান ভূপেনবাবুর অল বেঙ্গল কনফারান্স-এ ১৯৩৭ সালে। সেই লাজুক কৃষ্ণকলিকে হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে এলেন সুরশ্রী কেশরবাই। তিনি শ্রোতাদের জানান, 'হীরাবাইর পলকাভঙ্গুর শরীর সুরের গুরুত্ব বহন করতে কত সমর্থ সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি নিজে ওকে নিয়ে এসেছি। শুনুন।' আর শ্রোতারা হীরাবাইর স্বরস্রোতে ভাসতে লাগলেন।

হীরাবাই ঃ আর শুধু একটি ঘটনা। অবিস্মরণীয়। ১৯৪৪ সালের। বম্বেতে বার্ষিক নাট্য সম্মেলনে 'সৌভদ্র' নাটক করা ঠিক হল। নাট্য সম্মেলনের সভাপতি বালগন্ধর্ব ছিলেন এজন্যই। কিন্তু তিনি সুভদ্রার ভূমিকা করতে কিছুতেই রাজী হননি। বললেন, বয়েস হয়ে গেছে, স্ত্রী-ভূমিকা আমাকে আর মানায় না। তোমরা যদি চাও অর্জুনের ভূমিকা করতে পারি। তখন সমিতির সদস্যরা সুভদ্রার ভূমিকার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। বসন্ত, মারাঠি নাটকের ইতিহাসে সে একটি অপূর্ব ঘটনা। ব্ল্যাক-এ টিকিট বিক্রি হয়, এক লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী টিকিট সেল। আমাদের দুজনের প্রত্যেকটি গানকে এনকোর

দিচ্ছে শ্রোতারা। রাত দশটায় শুরু হয় নাটক এবং শেষ হয় সকাল ৬টা।
[স্বগত]

বালগন্ধর্ব পরম প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। মহারাষ্ট্রের মানুষদের তিন ব্যক্তির প্রতি প্রধান দুর্বলতা—যোদ্ধা শিবাজী, সন্ত কবি জ্ঞানেশ্বর এবং গায়ক বালগন্ধর্ব। তাঁর নাম শ্রীনারায়ণরাও রাজহাঁস।

ছোট নারায়ণের নাম শুনে লোকমান্য টিলক নাম দিলেন বালগন্ধর্ব। তিনি মারাঠি সঙ্গীত নাটকে স্ত্রী-ভূমিকা করতেন। তাঁর রূপ, কাপড় পরা ও খোঁপার ধরন তখনকার মহিলাদের ফ্যাশান হত। মেয়েরা বালগন্ধর্বের পোশাকের অনুকরণ করতেন, পুরুষরা বাড়ির রান্নাঘরের বাসন বিক্রি করে তাঁর নাটক দেখতেন। আলাদিয়া খাঁ, আবদুল করীম, ফৈয়াজ খাঁ, ওয়াঝেবুয়া যে কোন নাম নিন, বালগন্ধর্বের গায়নের চাহিদা। মরহুম তবলা-নওয়াজ উস্তাদ অহমেদজান থিরাকুয়া যেই বালগন্ধর্বের গান শুনলেন তাঁর সঙ্গত করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। অনেক বছর থিরাকুয়াসাহেব গন্ধর্ব নাটক কোম্পানির সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। শুধু বালগন্ধর্বের সঙ্গে সঙ্গত অন্য গায়ক-অভিনেতাদের জন্য অন্য তবলিয়া।

বালগন্ধর্ব গানের আসর করেন নি কিন্তু নাট্যসংগীতে সমস্ত রাগগুলি পরিপূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। হীরাবাইর আসর এবং কোম্পানির নাটক একই শহরে যখন হতো, নাটক শেষ হতেই বালগন্ধর্ব হীরাবাইর মেহেফিলে পৌঁছে যেতেন। তিনি বলতেন, "আমার গানগুলি সহী সহী গায় শুধু হীরাবাই।"

এমন আমাদের হীরাবাই বড়োদেকর। যত মিষ্টি গায়ন তত মিষ্টি স্বভাব। সঙ্গীতমহলের সব চেয়ে নিরহংকারী অজাতশত্রু। ভারতের একমাত্র শিল্পী যার বিষয়ে অন্য সমস্ত শিল্পীরা ভালো বলেন।

"শুধু শিল্পীরাই কেন, জনসাধারণও যারা চম্পুতাইর সংস্পর্শে একবারও এসেছেন খুব ভালো মত প্রকাশ করেন" জানালেন সুরেশবাবুর শিষ্যা এবং পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর স্ত্রী বৎসলাবাই। "একবার প্রভা অত্রে ও আমি চম্পুতাইর সঙ্গে আবদুল করীম খাঁ সাহেবের পুণ্যতিথির জন্য মীরজ গিয়েছিলাম। কত যে খেয়াল রাখলেন আমাদের। আমি গান করতে মঞ্চে ওঠার আগে জোর করে আমার হাতে নিজের সোনার চুড়ি পরিয়ে দিলেন। আমারই কেন, সবার খেয়াল রাখেন। সুরেশবাবু অকালে মারা যান। তাঁর ৪-৫ মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, বিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। বুড়ো গরিব গায়কদের জন্য সরকারী অনুদান যোগাড় করেন, নবশিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন। আজ ৭৫ বছর বয়সেও সেই

উৎসাহ, লোককল্যাণে যেন প্রদত্ত।”

ওঠার সময় আমি প্রথমবারই জিগ্যেস করলুম, ‘চম্পুভাই এখন ভারতীয় সঙ্গীতের অবস্থা কী ?’

তিনি বললেন, “আঁধার ভাই, আমি তো সব আঁধারই আঁধার দেখছি। আজকের যুবাবয়সী আসলে বেশী সতেজ ও বুদ্ধিমান। কিন্তু খুব চঞ্চল। আমি কি বলি এদের জানো ? আমি অবশ্য মনে মনে বলি, ‘দেখো, গানবাজনার জন্য হয়তো সময় না দিতে পারো তোমরা। জীবনটা ফাস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে। ভদ্রভাবে ভালো ব্যবহার তো করো কমসে কম। এদের গলায় যত ধন নেই তার চেয়ে বেশি দম্ভ এদের নাকের ডগায় চমকে ওঠে। কি করা যায়, বলো ?”

১৯৮০

বেণু সেন-এর সঙ্গে অদিত আগরওয়াল-এর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ॥ আপনি কিভাবে ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হলেন ?

উত্তর ॥ আমার ফটোগ্রাফিতে আসাটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ! হঠাৎ এবং খানিকটা জেদের বশবর্তী হয়ে ফটোগ্রাফিতে আসি। একটা বিশেষ ঘটনায় আমার জেদ চেপে যায় যে আমি ফটোগ্রাফি শিখবো। ঘটনাটি একটি অদ্ভুত ধরণের, ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। দিনটা আজও মনে আছে। সব সময় মনের মধ্যে জাগে। আমার এক বন্ধু ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিল। আমি ক্যামেরা কি জিনিস তখন জানতাম না। আমি ওটা কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলল "ওটা একটা ক্যামেরা"। আমি ওটা দেখতে চেয়েছিলাম—সে দেখতে দেয়নি। সে বলল ওটা ভেঙে ফেলবো। স্বভাবতই আমার মনে ক্ষোভ হয় যে আমি ওটা ভেঙে ফেলবো ? সেই সময় আমার মনে প্রচণ্ড জেদ চাপে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এটা দিয়েই কাজ করবো। আমাকে ফটোগ্রাফি শিখতেই হবে। সাথে সাথে আর একটা জেদ চাপল যে শুধু শিখবো না, শেখাবোও। এ ভাবেই আমার ফটোগ্রাফি জীবন শুরু।

প্রশ্ন ॥ যখন আপনি ফটোগ্রাফি জগতে প্রবেশ করলেন তখন আপনাকে একাজে কে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন বা কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ?

উত্তর ॥ গোড়ার দিকে গাইড হিসাবে কাউকে পাইনি। প্রথমদিকে 'Ilford Manual' থেকে শুরু করি। ডার্করুমের কাজের ব্যাপারে আমি বাবার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। তারপর ফটোগ্রাফি যখন আমি সিরিয়াসলী শুরু করি এবং যার জন্য আমি ফটোগ্রাফি জগতে এই জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছি সে হল আমার সেজ ভাই, যে এখন জীবিত নেই। সে PAD-র (Photographic Association of Dum Dum) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিল। পরবর্তীকালে যে এখনও পর্যন্ত আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেয় সে আর এক ভাই বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত, যে এখন PAD-র বর্তমান সম্পাদক। এ ছাড়াও আমার বন্ধু বান্ধবদের থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পাই, যেটা আমার বিরাট প্রেরণা।

প্রশ্ন ॥ আমরা শুনেছি আপনার বেশীর ভাগ সেরা ছবির প্রিণ্টই আপনারই হাতে তৈরী এনলার্জারে করা, এটা কি সত্যি ?

উত্তর ॥ হ্যাঁ, শুধু এনলার্জার নয়, ক্যামেরারও বেশ কিছু যন্ত্রাংশও আমার নিজের হাতে তৈরী। ফটোগ্রাফি শুরু করেছিলাম খুব কম পয়সা নিয়ে। সে সময় শুনতাম ফটোগ্রাফি খুব ব্যয়সাপেক্ষ আমি এটা মেনে নিতে রাজি ছিলাম না। কেন যে দাম বাড়ে তা বুঝতে পেরেছিলাম। যে সব জিনিসের জন্য দাম বাড়ে দেখলাম সেগুলি এমন একটা কিছু নয় যা নিজেরা তৈরী করে নেওয়া যায় না। যার জন্য আমি প্রত্যেকটা যন্ত্রাংশ নিজের হাতে তৈরী করে তা দিয়ে আজও কাজ করে চলেছি। প্রথম আমি ফটোগ্রাফি শুরু করেছিলাম নিজের তৈরী ক্যামেরা দিয়েই।

প্রশ্ন ॥ আপনি কোন সালে প্রথম এনলার্জার তৈরী করেন এবং কিভাবে ?

উত্তর ॥ আমি ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে প্রথম এনলার্জার তৈরী করি। কাঠের বাক্সে কনডেনসার এবং বাইরে একটা ক্যামেরা লাগিয়ে ভিতরে আলো দিয়ে দেওয়ালে ছবি ফেলে। ক্রমে আধুনিক এনলার্জারের মত যেটাতে রড দিয়ে ওঠানামা করে ছবি ছোট বড় করা হয়, সে ভাবে এনলার্জার তৈরী করি এক বছর বাদে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে লরির হেড লাইট নিয়ে এসে 'লাইট হাউস' তৈরী করে তার সামনে ক্যামেরা লাগিয়ে ওটাকে এনলার্জার হিসাবে ব্যবহার করি। এরপর ওটার আরো সংস্কার করে আধুনিক এনলার্জার যে ধরণের হয় তা

বানাই। কিছু কিছু জিনিস ঢালাই করে ও কিছু কিছু লেদে কেটে তার চেয়েও আধুনিক এনলার্জার বানাই তারও অনেক বছর বাদে। এখন আমরা যে এনলার্জার দিয়ে কাজ করি এই এনলার্জারেই এক সময় বর্তমানের বহু নামী ফটোগ্রাফার কাজ করেছিলেন। ওটা তৈরী হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ সালে।

প্রশ্ন॥ আপনার সময়ে বাজারে বহু ফাইন গ্রেন ডেভলাপার পাওয়া যেত যেমন ধরুন D 23, D 76, ID 11, মাইক্রোডল ইত্যাদি। তা সত্বেও আপনি কেন নিজে BS4 আবিষ্কার করেছিলেন ?

উত্তর॥ ডেভলাপার সম্বন্ধে একটা জিনিস আমরা অনেকেই জানি যে কতগুলি কোম্পানির নামী দামী ডেভলাপার পাওয়া যায়। তার প্রত্যেকটি ফরমূলা আমাদের জন্য সব সময় উপযুক্ত নয়।

এইগুলি তৈরী হয়েছে তাদের দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত করে। সেগুলির সাথে আমাদের জলবায়ুর অনেক তফাৎ। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বেশীর ভাগ নামী ভালো ভালো ডেভলাপারে সঠিক এক্সপোজার দিয়ে তৈরী ফিল্মেও একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে যখন আমরা আরো বড় ছবি চাই তাতে দেখা যায় ছবির মান অনেক নেমে যায়। আর একটা জিনিস প্রত্যেকটি নামী ফরমূলাতে এক্সপোজার বাড়াতে হয়। আরও একটা জিনিস খুব ফাইন গ্রেন ডেভলাপ করতে গেলে যে কেমিক্যালগুলি দরকার সেগুলি অনেক সময় পাওয়া যায় না। সাধারণ কেমিক্যাল সব সময় সহজে পাওয়া যায়। অথচ আমাদের দেশের জলবায়ুতে খাপ খায়। এরকম ভাবে যত রকম ভালো সম্ভব সেটা নিয়ে আমি পরীক্ষা করতে শুরু করি। এবং বছর দুয়েক ধরে কেমিক্যালের পরিমাণ পরিবর্তন করে পরীক্ষা করি এবং এই পরিবর্তনের উপরে ডেভলাপ করে তার ঘনত্ব পরীক্ষা করে ফটো মাইক্রোগ্রাফি নিরীক্ষা করে শেষে দেখলাম যে সব চেয়ে কম দামে সব চেয়ে সহজ এবং কম কেমিক্যালে সব চাইতে ভালো নেগেটিভ আমরা পেতে পারি যে কেমিক্যালে সেটাই আজ 'BS-4' নামে পরিচিত। এখন এই ফরমূলা ব্যাপকভাবে ভারতের অনেক নামী আলোকচিত্র শিল্পীরা ব্যবহার করছেন।

প্রশ্ন॥ আমি শুনেছি আপনার শুধু ম্যাগনিফাইং গ্লাসে তোলা একটা ছবি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছে। এটা কি সত্যি ?

উত্তর ॥ হ্যাঁ, এটা শুধু মাত্র একটাই পুরস্কার পায়নি। পৃথিবীর বহু নামী স্যালনে পুরস্কৃত হয়েছে। এটা আজ পর্যন্ত কোন নামী স্যালনে বাতিল হয়নি। এই ছবিটা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তোলা। তাও সেটা ফুটপাত থেকে কেনা। যেটাকে আমি ব্যবহার করে ছিলাম লেন্সের তাত্বিক দিক চিন্তা করে। কেননা আমার ছবিতে যে ধরণের এফেক্ট আমি চাই সেটা নর্মাল বা অন্য কোন লেন্সে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ম্যাগনিফাইং লেন্সে ফোকাললেন্থ ঠিক করে ক্যামেরার নর্মাল লেন্স খুলে একটা বোর্ডের টিউব করে এবং কাগজ কেটে খুবই ছোট একটা ডায়াফ্রাম বানিয়ে আমি এই ছবিটা তুলি।

প্রশ্ন ॥ ছবিটার বিষয়বস্তু কি ছিল ?

উত্তর ॥ ছবিতে একটা তরুণীর যৌবন দীপ্ত রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল।

প্রশ্ন ॥ আপনার চিন্তায় কিভাবে বিনা পারিশ্রমিকে "সান্ধ্যকালীন ফটোগ্রাফি শিক্ষা" প্রথম আসে ?

উত্তর ॥ এ ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক পুরোপুরি আমার নয়। এটার জন্য কৃতিত্ব হচ্ছে বিশ্বতোষ সেনগুপ্তের। PAD গঠন হবার পরেই কোর্সটা চালু হয়েছে। তবে তখন এখনকার মত একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কিছু হত না। এবং ফটোগ্রাফি শেখানো হত একমাত্র যারা একটু বেশী আগ্রহী তাদের। পরে যখন বিশ্বতোষ সেনগুপ্তের হাতে সংস্থার দায়িত্ব আসে তখন কোর্সটা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চালু হয় এবং আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি।

প্রশ্ন ॥ আমরা জানি আপনি পৃথিবীর অনেক নামী এবং ধনী ফটোগ্রাফারদের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন শক্তিশালী নন। তা সত্ত্বেও আপনি বিনা পারিশ্রমিকে 'অবৈতনিক সান্ধ্যকালীন ফটোগ্রাফি শিক্ষা' কোর্স চালু করেছেন ? ফটোগ্রাফিতে আপনার যা প্রতিষ্ঠা, সেই ক্ষেত্রে এভাবে সময় না দিয়ে বাণিজ্যিক ভাবে চেষ্টা করলে অনেক টাকাই উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু এই পথে এলেন কেন ?

উত্তর ॥ এ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায় ! তবে অল্প কথায় আমি উত্তর দিতে

চেষ্টা করছি। যাঁরা শিল্পমনস্ক তাঁরা সাধারণত টাকাকড়ি নিয়ে বেশী চিন্তা করেন না। আমরা যদি পৃথিবীর শিল্প ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখবো অনেক মহান শিল্পীরা চিরকাল দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন। আর আমি যেটুকু উপার্জন করি তাতে মোটামুটি আমার চলে যায়। সেই কারণে টাকাকড়ির উপর আমার লোভ নেই। এটাই হয়তো আমার শিল্পসত্বার উপর ভগবানের আশীর্বাদ।

গোড়া থেকে আমি ফটোগ্রাফি জেদের উপর করাতে নানান ঝামেলাতে পড়তে হয়েছে। এদেশে সাধারণত কেউ কিছু শেখাতে চায় না। সেইজন্য যারা ফটোগ্রাফি, বিশেষত যারা ফটোগ্রাফিক আর্ট নিয়ে সীরিয়াস কাজ করতে চায় আমি তাদের কথা ভেবেই টাকাকড়ির দিকটা অত বড় করে ভাবি না। আমার উদ্দেশ্য ফটোগ্রাফি থেকে টাকা কামানো নয়। আমার উদ্দেশ্য আলোকচিত্র-শিল্পী তৈরী করা। এইজন্য অর্থ নৈতিক দিক থেকে কষ্ট স্বীকার করতে রাজি।

প্রশ্ন ॥ পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কোন্ বিভাগ আপনার পছন্দ—পোর্ট্রেট, ল্যাণ্ডস্কেপ, না অন্য কিছু ?

উত্তর ॥ প্রশ্নটা একটা ভেগ। কারণ, আলোকচিত্র যখনই সৃজনশীল হবে তখনি সেটা পিকটোরিয়াল। আলাদাভাবে কোন বিভাগের প্রতি আমার দুর্বলতা নেই। তবে একটা জিনিস আমি পোর্ট্রেট নিয়ে বেশী কাজ করেছি। এই কারণে যে শুনে এসেছি পোর্ট্রেট নিয়ে কাজ করা সব চেয়ে কঠিন। কাজ করতে গিয়েও দেখেছি কথাটা সত্য। কারণ, পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে মূলত মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়। আর মানুষকে নিয়ে নাড়াচড়া করার মত কঠিন কাজ আর কিছু নেই। এবং সেই কারণে কঠিন শুনলেই সেটা কেন কঠিন তা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে। এই কারণেই আমার বেশীর ভাগ কাজ পোর্ট্রেট নিয়ে। আমি ফটোগ্রাফির বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছি, কিন্তু আমার বেশীর ভাগ পরীক্ষামূলক কাজ পোর্ট্রেট-এর উপরে। আমার পোর্ট্রেটগুলোর অন্যান্য পোর্ট্রেট থেকে তফাৎ হচ্ছে—মূলত যেটা আমার পছন্দের সেটা হচ্ছে নারী মনস্তত্ব। কিছু পড়াশুনা করেছিলাম এই নিয়ে সেই কারণে এই বিষয়টা আমার এত ভালো লাগে, যার জন্য ফটোগ্রাফিতে ক্যারেকটারিষ্টিকটাকে তুলে ধরার জন্য মূলত পোর্ট্রেট নিয়ে কাজ করেছি।

প্রশ্ন ॥ ফটোগ্রাফিতে আপনার কয়েকটা পায়োনিয়ার কাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর । না, মানে ঠিক কি বলতে চাইছেন? পায়োনিয়ার বলতে বোঝায় এখন একটা শাখা যাতে অন্য কোন শিল্পী কোন বিশেষ কিছু কাজ করতে পারেনি অথচ আপনি কিছুটা অন্ততঃ করেছেন।

আমি যে ধরণের কাজ করেছি অর্থাৎ আমার কাজের যেটা বৈশিষ্ট্য আমি সব সময় কাজের মধ্যে চেষ্টা করি ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় ভাবধারাকে ধরার কিন্তু ফটো টেকনোলজিটা আমি পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতেই চেষ্টা করি। কারণ ফটোগ্রাফি বিজ্ঞানের একটা বিষয়। সেটার সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি হয়েছে পাশ্চাত্ত্য জগতে, সেই কারণে আমি ওদের টেকনোলজিটাই অনুসরণ করি কিন্তু ছবির শিল্পগত দিকটাতে ভারতীয় ভাবধারা অনুসরণ করি, দুটো একেবারে বিপরীত মেরু কিন্তু যখন দুটো মেলে তখন একটা অদ্ভুত বৈচিত্র্য আসে সেটা আগের সাথে একেবারে মেলানো মুশকিল।

প্রশ্ন ॥ আমি শুনেছি যে আপনি 'লাইন টোন সেপারেশন'-এর মত একটা নতুন পদ্ধতি বার করেছেন তাকে 'tonorama' বলা হয় বা যেটা tonorama বলে প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি?

উত্তর ॥ এটা হচ্ছে টেকনিকাল ফটোগ্রাফির একটা বিষয়, এটার পিছনে আমার এই মনোভাব কাজ করেছে যে টোন সেপারেশন পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফির একটা অন্যতম টেকনিকাল দিক যেখানে কনটিনিউয়াস টোনটাকে ধারাবাহিক ভাবে ভেঙে ফেলে সলিড টোনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পারস্পেকটিভ ফর্মটাকে তুলে ধরা হয়, সেটা করতে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর সময়, প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কখনো কখনো কিছু কিছু উপকরণ সহজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এর আউটপুট অর্থাৎ এর চূড়ান্ত ফলাফল খুব আকর্ষণীয়। আমার তাই খুব চিন্তা এসেছিল, এটাকে, অন্য কোন ভাবে এই ফর্মটাকে, দাঁড় করানো যায় কিনা। আর তাতে আস্তে আস্তে চেষ্টা করে এই ফর্মটাতে শেষপর্যন্ত আমি আসতে পেরেছি। যেটাকে আমরা পরবর্তী কালে tonorama বলে উল্লেখ করি।

প্রশ্ন ॥ Tonoramaতে করেছেন এমন যে ছবিটি বিখ্যাত হিসাবে পৃথিবীর সব জায়গাতে সম্মান পেয়েছে সেরকম একটা ছবির নাম অন্তত বলুন।

উত্তর ॥ Tonoramaতে আমার সব চাইতে যেটা বেশী নামী দামী স্যালনে নির্বাচিত হয়েছে তা হল 'Forbidden Flower'। এই ছবিটি আমার বইতে ছাপা আছে—এছাড়া আমার দুটো 'Figure Study'ও বহু স্যালনে প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ আপনি পৃথিবীর অল্প কয়েকজন ফটোগ্রাফারের একজন এবং পূর্ব ভারতের একমাত্র ফটোগ্রাফার যিনি ফটোগ্রাফির সর্বোচ্চ পুরস্কার MFIAP দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। এই পুরস্কার পেয়ে আপনার কেমন লেগেছিল ?

উত্তর ॥ আসলে এর ফলে আমার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ পুরস্কার পাওয়ার জন্যই আমি কাজ করিনি। তবে বিশেষত PAD-র সাথে যারা জড়িত তাদের উৎসাহ, বিশেষ করে আমার ভাই যে এখন সম্পাদক এদের উৎসাহের জন্য আমি MFIAP-র কাজ করেছিলাম। কাজ করে আমি যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলাম যে সম্মানটা পেতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। এর পিছনে আর একজনের নাম করবো তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি যথেষ্ট। তিনি Federation of Indian Photography-র Secretary Dr. G. Thomas, কারণ ওনার অনুরোধেই আমি এই পুরস্কারটার জন্য তৈরী হয়েছিলাম। তা না হলে আমি চেষ্টা করতাম না। উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে আমি বোধ হয় একমাত্র লোক যে এই পুরস্কারটা পেতে পারি। এবং তাহলে দেশের সম্মান অনেক বেশী উঁচুতে উঠে যাবে। ওনার সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমার এখানকার সমস্ত বন্ধু, ছাত্র, এদের সবাইয়ের উৎসাহতে এর জন্য প্রস্তুত হই। এবং শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হই।

প্রশ্ন ॥ ফটোগ্রাফির সমস্ত শাখার মধ্য থেকে আপনি পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফিকে বেছে নিলেন কেন, বিশেষ করে ফটোজার্নালিজমের মাধ্যমেও একজন ফটোগ্রাফার যখন নিজেকে খুব ভালোভাবেই প্রকাশ করতে পারেন ?

উত্তর। ফটোজার্নালিজম এবং পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফি একদিক দিয়ে অনেক তফাৎ আছে। আবার যদি অন্য দিক দিয়ে আমরা দেখি তাহলে খুব একটা তফাৎ নেই। প্রথমত আমরা যদি স্পষ্টভাবে একটা ভাগ করি তাহলে Photo Journalism is a kind of documentation, আবার আর একদিক দিয়ে এই

ডকুমেনটেশনটাকে পিকটোরিয়ালিজম-এর মধ্যে আনা যায়। যেমন ফটো-জার্নালিজম-এর মধ্যে আমরা বেশীর ভাগ দেখতে অভ্যস্ত কোন্ ছবি সংবাদ বহন করছে, যে কোন বিশেষ ছবি যদি সংবাদকে Cover করতে পারে সেগুলোকে আমরা ফটোজার্নালিজম বলি। পিকটোরিয়ালিজম কিন্তু তা নয়, এটা একটা নতুন মাত্রা যোগ করে। সেই ফটোগ্রাফি: যেটার মধ্যে বহু জিনিস আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। এটা নির্ভর করছে শিল্পীর অনুভূতির উপরে, শিল্পীর প্রকাশ-ময়তার উপরে।

এটা কোন পুনরাবৃত্তি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ডকুমেনটেশন নয়। কিন্তু ফটোজার্নালিজম ৭৫%ই ডকুমেনটেশন, মাত্র ২৫%তা নয়, যদি কেউ সেই রকম ভাবে ব্যবহার করতে চান এবং সেই দক্ষতা যদি থাকে তা হলে, যেমন আমি ভারতবর্ষের একজনের নাম বলতে পারি—S. Pauls.

Just documentation এই কারণে ডকুমেনটেশনের উপর আমার কোন আগ্রহ নেই। কারণ সেটা আমায় ডে-টু-ডে-লাইফ-এর মধ্যে করতে হয়। পিকটোরিয়ালিজমটার মধ্যে ফটোগ্রাফির নতুন নতুন দিক, নতুন নতুন ভাব, নতুন নতুন রূপ ধরা যায়। সেই কারণে এটাকে পছন্দ করি বেশী।

প্রশ্ন ॥ ভারতবর্ষে পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ কী বলে আপনার ধারণা ?

উত্তর ॥ এটাতো এক কথায় বলা মুশকিল। তবে পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ—একথাটা বোধ হয় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখনো আসে না, কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফি আজপ্রতিষ্ঠিত, বরঞ্চ এটা অনেক দেরীতেই ভারতবর্ষে এসেছে এবং এর স্বীকৃতি সরকারী ভাবে এখনও নেই, যেটা সারা পৃথিবীতে আছে। পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফিকে শিল্প বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে ফটোগ্রাফিকে এখনও শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি যেটা সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। আমরা যদি খোঁজ করি দেখবো Australian Museum পর্যন্ত তাদের আর্ট গ্যালারীতে ফটোগ্রাফিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তারা Permanent Collection এবং Physical Collection, Historical Collection পর্যন্ত রাখছেন। এছাড়া পৃথিবীর আরও অনেক মিউজিয়ম অথবা শিল্প সংস্থায় ফটোগ্রাফির শিল্পসম্মত ব্যবহার হয়।

প্রশ্ন ॥ ভারতবর্ষে অন্যান্য পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফার কারা ? আমাদের দেশে পিকটোরিয়ালিজমের প্রসার ও অগ্রগতিতে আর কারা সাহায্য করতে পারেন ?

উত্তর ॥ পিকটোরিয়াল ফটোগ্রাফির প্রসার ও অগ্রগতির জন্য আমাদের এখানে খুব কম লোকই কাজ করে। কারণ আমাদের এখানে বেশীর ভাগ লোকই স্বার্থপর, তার মধ্যেও কিছু কিছু লোক অগ্রগতি করার জন্য এগিয়ে গেছেন।

অগ্রগতি করতে হলে তাঁর যে দক্ষতা সেটা পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, সেটা আমাদের এখানে খুবই কম। সেই দিক দিয়ে আমি মোটামুটি দিল্লীর O. P. Sharmaর নাম করতে পারি। বিশেষত O. P. Sharma অন্তত: চেষ্টা করেন যাতে লোকেরা জিনিসটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে। সেই রকম মনোভাব নিয়ে কাজ করেন এ রকম নাম তো ভারতবর্ষে আর মনে পড়ছে না, যাঁরা অন্তত: সারা দেশে ফটোগ্রাফির প্রসার ও উন্নতি করার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে গেছেন।

১৯৮৫

পি. সি. সরকার-এর সঙ্গে ঈশ্বর চক্রবর্তী-র সাক্ষাৎকার

['দি ওয়র্ল্ড অব সরকার'—জাদুকর পি. সি. সরকার (পিতা ও পুত্র)কে নিয়ে নির্মীয়মান এই ছবির পরিচালক ঈশ্বর চক্রবর্তী। তিরিশ মিনিটের এই রঙীন ছবিটিতে পিতা ও পুত্রের জীবন ও কর্মের শুধু চিত্রণ নয়, মূল্যায়নেরও চেষ্টা করা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে পুত্র পি. সি. সরকার আলোচনা করেছেন ম্যাজিকের প্রকৃতি, ধর্ম ও গঠন-কৌশল, এককথায় জাদুবিদ্যার বিদ্যা নিয়ে। সাক্ষাৎকারের কিয়দংশ ছবির চিত্রনাট্য থেকে সরাসরি গৃহীত বাকি অংশ এই উপলক্ষে আলাদা ভাবে নেওয়া।]

—ম্যাজিককে বাংলায় কী বলব, জাদুবিজ্ঞান ?

—বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতিকে আমরা যতই বুঝতে শিখেছি, ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ নিজের থেকেই তৈরি করে নিয়েছি—তার নাম হলো 'অপ্রাকৃতিক ব্যাপার।' আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির যে কটা নিয়ম বা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা স্থান পেয়েছে, তার গতানুগতিক ছন্দের বাইরে যদি কোনও কিছু ঘটে তাহলে তাকে আমরা বলি 'অপ্রাকৃতিক'। পুরোন দিনে এই 'অপ্রাকৃতিক' ব্যাপারগুলোকেই বলতাম 'অলৌকিক'। কিন্তু যতোই আমরা প্রকৃতিকে বুঝতে পেরেছি ততোই ঐ অলৌকিকতার রহস্য ভেঙে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সেটা প্রাকৃতিক চেহারা নিয়েছে। কিন্তু সব রহস্যের সমাধান তো এখনও হয়নি। সুতরাং 'অপ্রাকৃতিক' চিন্তাধারা এখনও আমাদের মনে টিকে আছে। তাছাড়া মানুষ কল্পনাপ্রবণ প্রাণী, কঠিন নিয়মের বাইরের স্বপ্নমাখা

জীবনকে সে শুধু কল্পনা করেনি, তাকে কল্পনা থেকে বাস্তবে আনবার জন্য বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতিকে বুঝে প্রকৃতিকে দিয়েই তার বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাজ করাটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের কারসাজি। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ সফল করা সম্ভব হয়নি, অথবা আপাততঃ সম্ভব নয় বলে বুঝতে পেরেছে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে স্থান দিয়েছে ইচ্ছের জগতে। মনের মধ্যে এভাবে জন্ম নিয়েছে এক অবাস্তব জগত—যার বাস্তবীকরণ সম্ভব হচ্ছে না—কিন্তু বাস্তবে ঘটাবার ইচ্ছেটা প্রচণ্ড। এই কল্পনার জগতে মানুষ ঠিক পাখির মতো আকাশে উড়তে পারে, হাওয়ার মতো হয়ে যেতে পারে অদৃশ্য, অথবা বীজ বুনতে না বুনতেই তার থেকে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হয় গাছ ফুল ফল ইত্যাদি। এই কাব্যময়, কষ্টহীন, কল্পমায়ালোকের নাম দিয়েছি আমরা ইন্দ্রজাল জগত। প্রকৃতির নিয়মগুলোকে বুঝে তার নির্দিষ্ট আইনগুলোকে যেমন বলেছি বিজ্ঞান ঠিক তেমনিভাবে অবাস্তব জগতকে বাস্তবায়িত করবার পদ্ধতি হিসেবে উদ্ভাবন করে নিয়েছি এক বিশেষ বিদ্যা বা শিক্ষার—যার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রজালবিদ্যা। মানুষের আবেগ অনুভূতি দিয়ে রাঙানো চৌষট্টি কলায় এভাবে ইন্দ্রজালবিদ্যা এক বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। আধুনিক ইন্দ্রজাল বা জাদুবিদ্যা হচ্ছে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য। বিজ্ঞানের যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্ট হিসেবে মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য কল্পমায়ালোকের সৃষ্টি করাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আজকের দিনে জাদুকর হচ্ছেন একজন অভিনেতা, তিনি অপ্রাকৃতিক রসসৃষ্টির জন্য অভিনয় করেন মাত্র। তাঁর অভিনয় আবার শুধুমাত্র নাটকীয় অভিনয় নয়। তার অভিনয়ের সঙ্গে রয়েছে অবাস্তবকে বাস্তবীকরণের জন্য যুক্তিতর্ক সম্মত বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল।

—অসত্যকে সত্য করায় যে আর্ট রয়েছে সেটাই হচ্ছে ম্যাজিকের বৈশিষ্ট্য। এখন ম্যাজিকের বিভিন্ন উপাদান মিলে আর্টে পরিণত হয় কীভাবে ?

—সাহিত্য বা নাটকের মতো ইন্দ্রজাল সৃষ্টির পেছনেও কয়েকটি বিশেষ রীতি আছে। ইন্দ্রজালকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো মোট তিনটে জিনিষের ওপর সে নির্ভর করছে। সেগুলো হচ্ছে বিজ্ঞান, কলা এবং পরিবেশ। এরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কই ইন্দ্রজালের শিল্পরীতি ও রসসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

মানুষের রাজত্বে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হয় দুভাবে। একটা হচ্ছে অন্তর্মুখী বা মানসিক, আর অন্যটা হচ্ছে বহির্মুখী বা বাহ্যিক। আলংকারিকরা বলেন, বাহ্যিক

উপাদানের ক্রিয়ায় মনের ভাব রূপান্তরিত হলে রসে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' বইখানিতে এই বাহ্যিক উপাদানের আর্টে পরিণতির এক সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন: 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর এক জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে—তাহাদের সঙ্গে আমাদের ভাললাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত। তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষভাবে আপনার করিয়া লই।'

অনুভূতির প্রকাশ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি আর্টের প্রধান লক্ষ্য হলেও অনেক জায়গায় আমরা আমাদের প্রয়োজন মেটাতেও আর্টকে ব্যবহার করে থাকি। সেজন্য আর্টকে দুটো পরিষ্কার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটা হচ্ছে চারুকলা আর দ্বিতীয়টা কারুকলা। কবিতা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি হচ্ছে চারুকলার উদাহরণ। চারুকলার কাব্য অংশকে প্রাচীন সাহিত্য কর্ণধারেরা দুভাগে ভাগ করেছেন। শ্রব্য এবং দৃশ্য। তাঁদের মতে মৌলিকত্ব হচ্ছে শ্রব্যশিল্পের প্রধান বিশেষত্ব। 'রস নিষ্পত্তির জন্য তাকে শ্রবণাতিরিক্ত অপর কিছুর দিকে তাকাতে হয় না।' অন্যদিকে দৃশ্যশিল্পকে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলেছেন 'কাব্যত্ব আর দৃশ্যত্ব' এই দুই উপাদান নিয়ে সে তৈরি। দৃশ্যত্বের অর্থে যা অভিনয় করা সম্ভব তাই বোঝানো হয়েছে। যদিও 'দৃশ্যত্ব' বা 'অভিনয়ত্ব' হচ্ছে আর্টের এক জোরালো উপাঙ্গ, কিন্তু তবুও এই অভিনয়ত্বের জন্যই দৃশ্যশিল্প বিশুদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। সে হয়েছে পরনির্ভরশীল এবং সে জন্যই দৃশ্যশিল্পকে শ্রব্যশিল্পের তুলনায় একটু নীচু বলে ধরা হয়। নাটক, যাত্রা, সিনেমা, ইন্দ্রজাল এ সবই দৃশ্যশিল্পের আওতায় পড়ে। তাহলে দেখতেই পাচ্ছি ইন্দ্রজাল বা এই জাতীয় কোনো দৃশ্য-শিল্প মোটেই বিশুদ্ধ চারুকলা নয়। তা হচ্ছে মিশ্র চারুকলা এবং সেটাকে বিচার করতে বসলে শুধুমাত্র তার কাব্যগুণ নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না—দেখতে হবে তার উপস্থাপন বা দৃশ্যগুণ কতোটা সার্থক হয়েছে। এই দৃশ্য-গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রজালকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব তাতে রয়েছে নাটক, সংলাপ, দৃশ্যপট, সঙ্গীত, অভিনয়, অভিব্যক্তি এবং প্রযোজনা এবং এ-সবের সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে 'রহস্য' বা 'কৌশল'। যে রহস্য সত্য বা বাস্তব অথচ যার উপস্থাপন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অস্বীকার করে, সেই আনন্দদায়ক রহস্যকে ব্যবহার করে মঞ্চের ওপর অবাস্তবকে সত্যে পরিণত করা একমাত্র ইন্দ্রজালেই

সম্ভব। আর একটা ব্যাপার বলা দরকার ইন্দ্রজালের ক্ষেত্রে দর্শকের ভূমিকা খুব সজীব ও সক্রিয়। শুধু তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে দর্শকদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী সম্ভব নাও হতে পারে। ইন্দ্রজালের বিষয়বস্তুতে দর্শকের ভূমিকা মুখ্য ও সক্রিয় বলেই অবাস্তব আরও বাস্তবে পরিণত হয়, ইন্দ্রজালের নাট্যাংশ—শুধু কাব্যকেন্দ্রিক না হয়ে—বাস্তবরূপ ধারণ করে। এই অডিয়েন্স পার্টিসিপেশন এবং দর্শকদের সক্রিয়তার জন্যই (এই ব্যাপারটাকেই আমি বলছি—পরিবেশ) ইন্দ্রজালবিদ্যা মিশ্রচারুকলায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

—কৌশল, কলা, পরিবেশ—প্রথমে আলোচনা হোক গঠন-কৌশল নিয়ে।

—সেটা একটা বিরাট আলোচনা। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ইন্দ্রজালের প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ দুরকম কৌশল আছে। প্রথমটা হচ্ছে অপ্রাকৃতিকতা সম্পাদন করবার কৌশল, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেই কৌশলটাকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করবার কৌশল। প্রথম কৌশলটা অর্থাৎ যে কারসাজি দিয়ে ম্যাজিকের চমক তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবেই বিজ্ঞান-ভিত্তিক। আর দ্বিতীয় কৌশলটা অর্থাৎ প্রেজেন্টেশনের কায়দা—সেটা হচ্ছে আর্ট। এই 'কায়দা'টাকে নিয়ম বলা ভুল হবে। কারণ বিধিবদ্ধ নিয়ম বলে এক্ষেত্রে হয়তো কিছুই নেই।

যে কোনও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীকে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এতে তিনটে স্তর আছে—ভূমিকা, গতি আর চমৎকারিত্ব। এদের একটা জলস্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নদীর জলের সমুদ্রে সম্মেলন হচ্ছে ভূমিকা, সেই সমতলে জলের এগিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে গতি আর তারপর হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়ার কবলে পড়ে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হওয়াটা হচ্ছে চমৎকারিত্ব। ইন্দ্রজালের ভূমিকা অংশ দর্শকের মনকে এক বিশেষ পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। শিল্পীদের চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে অথবা জাদুকরের ভাষণে দর্শকেরা তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত জগত ছেড়ে বক্তব্যের জগতের বা অভিনীত জগতের ঘটনার টানে নতুন জগতে আসছেন। এই নতুন জগতে এবার এলো গতি। দর্শকেরা এবার নতুন দৃষ্টিতে সব কিছু দেখবার বা ভাববার সুযোগ পাচ্ছেন এবং অভ্যস্ত হচ্ছেন। এবং সেখান থেকেই হঠাৎ দর্শকের মনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মায়াজগতে—জাদুবিদ্যার চমৎকারিত্বের দৌলতে। এই চমৎকারিত্বের গভীরতা নির্ভর করছে অপ্রাকৃতিকতার পরিমাণের ওপর। তার অবস্থিতি আবার ভূমিকা এবং গতির সঙ্গে একই তলে নয়—অন্য এক বিশেষ স্তরে তার স্থান।

—ম্যাজিকের কলা প্রসঙ্গে, আপনি একবার বলেছিলেন—সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন

রকম 'রাগ' আছে, জাদুবিদ্যাতেও ঠিক একইভাবে নানারকম 'রস' আছে।

—হ্যাঁ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাদুকরের প্রদর্শনী দেখে এই রসের অস্তিত্বের সন্ধান আমি পেয়েছি। আমার মতে ম্যাজিকের মধ্যে নিম্নলিখিত রসগুলো রয়েছে : (১) অদৃশ্য (disappearance)—দর্শকের চোখের সামনে অবস্থিত কোন এক বস্তুর অন্তর্ধানে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অদৃশ্য রস। অদৃশ্য রস আবার দুরকম হয়—আবৃত এবং অনাবৃত। (২) আবির্ভাব (appearance)—দর্শকের চোখের সামনে শূন্য থেকে কোন কিছুর আকস্মিক আবির্ভাব হওয়াটা হচ্ছে এই আবির্ভাব রস। এটা অদৃশ্য রসের বিপরীত এবং একেও দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—আবৃত এবং অনাবৃত। (৩) স্থান পরিবর্তন (displacement)—মঞ্চে রাখা কোন এক নির্জীব অথবা সজীব বস্তুর এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় অস্বাভাবিক ভাবে চলে যাওয়াকে স্থান পরিবর্তন বলা হয়। এই স্থান পরিবর্তন দুভাবে ঘটতে পারে—দৃশ্যভাবে এবং অদৃশ্যভাবে। (৪) ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন (transformation)—কোন এক নির্জীব বা সজীব বস্তুর অস্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্ব বা আত্ম-প্রকাশের রূপের পরিবর্তন ঘটলে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন রস বলে। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন নিয়েও অনেক বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। (৫) ভেদ (penetration)—কোনও এক কঠিন পরীক্ষিত বস্তুর ভেতর দিয়ে অন্য কোন কঠিন বস্তু যদি ভেদ করে অনায়াসে যেতে পারে এবং তার ফলে ঐ দুই বস্তুর কোনটিরই যদি কোনও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন না হয়, তখন যে জাদুরসের সৃষ্টি হয় তাকে 'ভেদ' বলে। ভেদ চোখের সামনেও ঘটতে পারে, চোখের আড়ালেও হতে পারে। (৬) শূন্যে অবস্থান (flotation)—আপাতদৃষ্টিতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে এই রসের বিষয়। শূন্যে অবস্থানকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—শূন্যে স্বাবলম্ব অবস্থান ও শূন্যে নিরালম্ব অবস্থান। (৭) প্রাণ সঞ্চারিণী (animation)—জৈব বা অজৈব নিষ্প্রাণ বস্তুতে আপাতদৃষ্টিতে প্রাণের সঞ্চার করা হচ্ছে এই রসের পরিচায়ক। (৮) সংযোজন (restoration)—কোনও এক সজীব অথবা নির্জীব বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন করে, অথবা আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংস করে তারপর আবার সেটাকে সংযোজন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলে যে জাদু-রসের সৃষ্টি হয়, তার নাম দিয়েছি আমি সংযোজন রস। সংযোজনের প্রণালী অনুসারে এই রস চারভাগে বিভক্ত। (৯) দ্রুতি (acceleration)—প্রকৃতির সবকিছুই হচ্ছে নিয়মমাফিক। সবকিছু ঘটারই এক নির্দিষ্ট

সময়সীমা আছে। সেই নির্ধারিত সময়সীমাকে (নিম্ন অথবা উচ্চ) উপেক্ষা করলে যে জাদু-রস সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে 'দ্রুতি'-র উদাহরণ। (১০) মুক্তি (escape)—জাদুজগতের বিভিন্ন রসের মধ্যে মুক্তিরস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নির্জীব বা সজীব কোনও বস্তু আপাতদৃষ্টিতে কোনও বাহ্যিক সাহায্য ছাড়া নিজের ক্ষমতায় (জাদুক্ষমতায়) আবদ্ধ অবস্থা থেকে যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারে এবং মুক্ত হবার পর তখনও যদি আবদ্ধ করার উপকরণের কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে 'মুক্তি' বলে। (১১) স্বরক্ষেপণ (ventriloquism)—স্বরক্ষেপণের ফল জাদু-রসেরই সৃষ্টি করে। সেজন্য জাদু আলোচনায় রসের ক্ষেত্রে স্বরক্ষেপণকে বাদ দেওয়া চলবে না। এতে আবার দুটো ভাগ আছে—বস্তুকেন্দ্রিক স্বরক্ষেপণ ও উৎসকেন্দ্রিক স্বরক্ষেপণ। (১২) ভৌতিক রস—এই রসের ফলে ভৌতিক ধারণার ও ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। (১৩) অতীন্দ্রিয় রস—মানুষের শারীরিক বা মানসিক দুদিক দিয়েই ক্ষমতার একটা সীমা আছে। যদি কোনও জাদু প্রদর্শনীতে জাদুকর ঐ সীমা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয়শক্তি অথবা মনঃশক্তির অথবা শারীরিক অলৌকিকতার অবস্থিতির পরিচয় বা ইঙ্গিত দেন তখন যে রসের সৃষ্টি হয় তার নাম আমি দিয়েছি এককথায় অতীন্দ্রিয় রস। একে মুখ্য রস বলা চলে, কারণ জাদুক্রিয়ায় জাদুকর যখন অভিনয় করেন তখন এই অতীন্দ্রিয় শক্তির অবস্থিতির চিন্তাই দর্শকদের মনে একজন অভিনেতাকে ঐন্দ্রজালিকের পর্যায়ে এনে দেয়।

বলে রাখা ভাল, ওপরে যে তেরোটি রসের কথা বললাম তার কতকগুলি শুদ্ধ বা মৌলিক এবং কতকগুলি মিশ্র বা যৌগিক রসের উদাহরণ।

—এখন প্রশ্ন হল: এই এতসব কলাকৌশল, কারসাজি, এত সাজগোজ—এসবের উদ্দেশ্য কী? শুধুই দর্শকদের মনোরঞ্জন করা?

—কৌশল ও কলার নানান্ সম্মেলনে জাদুপ্রদর্শনী বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশকে নাম দিয়েছি আমি 'রূপ'। এখন জাদুজগতকে মোট তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা হচ্ছে মঞ্চজগত, দ্বিতীয়টা হচ্ছে দর্শকজগত, আর তৃতীয়টা হচ্ছে মায়াজগত। মঞ্চজগত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ওই রূপ-ই যে শেষ কথা তা নয়, এ ছাড়া আরও একটা জিনিষের ওপর তা ভর করে আছে, তার নাম হল 'প্রকৃতি'। রূপ নানা রকমের হতে পারে, যেমন শক্তিরূপ—এক্ষেত্রে 'জাদুকর একজন বিশেষ শক্তির অধিকারী' এই জাতীয় মনোবৃত্তির প্রকাশ অথবা ইঙ্গিত পাওয়া যায়; পরীক্ষারূপ—'শুনেছি

সাধারণতঃ এটা হয়ে থাকে' এই জাতীয় মনোবৃত্তি এতে প্রকাশ পায়, এখানে দর্শকদের সঙ্গে জাদুকরও যেন একজন দর্শক, তবে একেবারে সাধারণ দর্শক নন, বিশেষ কিছু অবাস্তবকে বাস্তবায়িত করার কৌশলের কথা যেন তিনি শুনেছেন এবং ঘটেছে বা ঘটতে পারে বলে সন্দেহ করেন, তাই দর্শকদের সামনে সেটাকে তিনি ঘটিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন ; বা নাট্যরূপ—এখানে উপস্থাপন হয় নাট্যরূপের মাধ্যমে। তেমনি প্রকৃতিকেও নানা ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন কৌতুক প্রকৃতি, হাস্য প্রকৃতি, উৎকণ্ঠা প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ প্রকৃতি, দুঃখ প্রকৃতি, ভয় প্রকৃতি ইত্যাদি।

মঞ্চজগত হচ্ছে এক অদ্ভুত জগত। এই জগত তৈরি করা হয় দর্শকদের জন্য, কিন্তু এই জগতে দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ। এখানে নকলকে আসল, দুর্বলকে সবল, বা মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাবার জন্য যতো রকম সম্ভব কৌশল ও চাতুরি অবলম্বন করা হয়। তবুও এর উদ্দেশ্য কিন্তু মোটেই লোক-ঠকানো নয়। আসল উদ্দেশ্য হল, আগেই বলেছি, সৌন্দর্যের ও উপভোগের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা। এর অন্যান্য সামাজিক অনুষঙ্গও রয়েছে—সে কথায় পরে আসছি।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে জাদুজগতের দুটো ভাগ মঞ্চ এবং দর্শক জগত হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু মায়া জগতের স্থান হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবেই মনের রাজ্যে। জাদুকরের চেষ্টা তাঁর শিল্পক্ষমতা দিয়ে জাদুরস সৃষ্টি করে দর্শককে ঐ মায়াজগতে টেনে আনা। দর্শকেরা এই মায়াজগতে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বা নাও থাকতে পারেন, কিন্তু যে জাদুকর যতো সাবলীল ভাবে দর্শকদের ঐ রাজ্যে আনন্দ দিয়ে টেনে আনতে পারেন তাঁকে ততো বেশি কৃতিত্ব দেওয়া হয়। শিল্প হিসেবে ঐ জাদুরচনাকে তখন বলা হয় উন্নত মানের। মঞ্চ জগতে যে শিল্পী তাঁর প্রতিভার যতো বিকাশ করতে পারবেন—মায়াজগতে পৌঁছুতে তাঁর ততোই সুবিধা হবে।

জাদুবিদ্যার উদ্দেশ্য যেহেতু দর্শকদের মায়াজগতে টেনে আনা -ম্যাজিক কখনও ষ্টেজের ওপর তৈরি হয় না, সেটা তৈরি হয় দর্শকদের মনের মধ্যে—সেই কারণে দর্শক জগতের ধরন-ধারণ সবার আগে জানা প্রয়োজন। কেননা জাদুর সাফল্য নির্ভর করছে সম্পূর্ণ ভাবেই দর্শকদের চিন্তাধারা এবং মনোবৃত্তির ওপর। এখন আমরা জানি, বিভিন্ন রকমের মানসিক উপাদান এবং চরিত্র নিয়ে মানুষ তৈরি এবং সেই কারণেই একজন দর্শকের সঙ্গে অন্য একজন দর্শকের চাহিদা ও

মনোবৃত্তি মোটেই এক হতে পারে না। কিন্তু অমিল যতোটাই হোক না কেন, আমি হিসেব করে দেখেছি দর্শকদের স্বভাব-চরিত্রকে মোটামুটি ভাবে একটা বিশেষ ছকে ফেলা যায়। দর্শকচরিত্রকে আমি চার ভাগে ভাগ করেছি: অনুষ্ঠান প্রেমী, কৌশল প্রেমী, শিল্প প্রেমী এবং নিরপেক্ষ। এই প্রতিটি চরিত্রকে আবার দু-রকম স্বভাবে ভাগ করা যায়: বুদ্ধিদীপ্ত ও সংস্কারবদ্ধ।

এখন যে শ্রেণীরই দর্শক হোন না কেন, জাদুরস দিয়ে দর্শকদের মন যতোই জয় করা হয়—দর্শকেরা ততোই অপ্রাকৃতিকতাটাকে 'বাস্তব' বলে মানতে, 'প্রকৃত' বলে ভাবতে শুরু করেন। চমক তখন আর চমক থাকে না। হাজার বছর আগে যে জিনিষ ম্যাজিক বলে মনে হতো তা আজকের দিনে আর হচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার গভীরতা এবং ব্যাপ্তি দুই-ই পাল্টাচ্ছে। আজকের দিনে যে ম্যাজিক সবাইকে চমকে দিচ্ছে আগামী দিনে সে চমক নাও থাকতে পারে। মিশরীয় জাদুকর 'কেমিয়া'দের আলকেমি থেকেই তো জন্ম নিয়েছে কেমিস্ট্রি। জাদুবিদ্যার সাফল্যের চরম পরিণতি হচ্ছে ঐ বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা দূর বাস্তবকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা।

শুধু জাদুর খাতিরে নয়, আমাদের জীবনেও বাস্তব আর অবাস্তবকে আমরা মিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। দৈনন্দিন কাজকর্মের অনেক উঁচু পর্যায়ের দক্ষতা বা প্রতিভা বিকাশেও অলৌকিকতার ছোঁয়া আমরা পাই। আর সেজন্যই আমাদের সমাজে আমরা সঙ্গীতের জাদুকর, খেলার জাদুকর, রাজনীতির জাদুকর ইত্যাদি বহু 'জাদুকরের' স্থান করে দিয়েছি। একজন খুব ভাল তবলচী তবলা বাজাবার সময় যখন তাঁর প্রতিভা এবং দক্ষতা প্রকাশ করেন তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি এবং প্রায়ই বলি—'এত সুন্দর বাজাচ্ছেন যে বিশ্বাসই হয় না, ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো···' ইত্যাদি।

—যেমন আপনি লিখেছিলেন: আমার বাবা স্বর্গগত সি. সি. সরকারকে শুধু একজন জাদুকর বললে ভুল বলা হবে, আসলে তিনি নিজেই একটা ম্যাজিক।

—হ্যাঁ। বাবা বলতেন, 'আমার রক্তে ম্যাজিক, পরিবেশও ম্যাজিকের। আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ম্যাজিক, ম্যাজিক আমার স্বপ্ন, কর্ম।' আমি হচ্ছি তাঁরই সন্তান। সেজন্যই বোধ হয় ছোটবেলার থেকেই আমার স্বপ্ন আমিও একজন সত্যিকারের জাদুকর হবো।

—ম্যাজিকের জগতে ওনার সবচেয়ে বড় অবদান কী বলে আপনার মনে হয়?

—ইন্দ্রজাল প্রেজেন্টেশনের কায়দা ও ইন্দ্রজালে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা সংযোজন

করা। বাবা বলতেন, পাশ্চাত্ত্যের ম্যাজিক যান্ত্রিক কলাকৌশলের ওপর বেশি জোর দেয় আর প্রাচ্যদেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, ম্যাজিক জোর দেয় মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক উপাদানের ওপর। বাবার ম্যাজিকের মধ্যে এই দুই গুণের মিলন ঘটেছিল।

—মনোরঞ্জনের জন্য বিভ্রম-সৃষ্টি-কারী হিসেবে ম্যাজিশিয়ানের কী কোন সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব থাকা উচিত ?

—নিশ্চয়ই! জাদুকর মঞ্চের ওপরে বিভ্রম-সৃষ্টিকারী কিন্তু মঞ্চের বাইরে, জীবনে, তিনি বাস্তবের মানুষ। যে কোন সৎ জাদুকরের মতো বাবাও সবসময় ম্যাজিকের পেছনের বৈজ্ঞানিক কারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর সমস্ত লেখায় তিনি ম্যাজিককে বিশ্লেষণ করেছেন শুধু বিনোদন ও শিল্প হিসেবে নয়, শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবেও। জ্ঞান-বিজ্ঞানই তো গতকালের ম্যাজিককে আজকের বাস্তব করে তুলেছে।

—কিন্তু কুসংস্কার বা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে যখন ম্যাজিক…

—সেটা তো জাদুকরের মনোবৃত্তির ব্যাপার। বোধহয় জানেন, কোন কোন তথাকথিত অবতার স্রেফ হাতসাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে সেগুলোকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে দাবী করেন। আমি নিজে এরকম অনেককে ভণ্ড বলে প্রমাণ করেছি। কুসংস্কার ও ভাঁওতা হিসেবে ম্যাজিক পরাজিত হতে বাধ্য কিন্তু শিল্প হিসেবে ম্যাজিকের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। কেননা রহস্য সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষার পেছনে জাদুকরের কোন লুকোছাপা নেই। শিল্পী হিসেবে তিনি পুরোপুরি সৎ ও বাস্তবের মানুষ।

১৯৮৪